দাম : পঞ্চাশ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা- ১৪২৮
৪ অক্টোবর, ২০২১

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৬ সংখ্যা,
১৭ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৪ অক্টোবর - ২০২১
যুগাব্দ - ৫১২৩

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ৫০ টাকা

Postal Registration No.-
KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

দেবী প্রসঙ্গ

উপনিষদের আলোকে মহাশক্তি ■ স্বামী ত্যাগিবরানন্দ ■ ১৯

উপন্যাস

বোধন ■ প্রবাল ■ ১০৯

গল্প

ন্যায় অন্যায় ■ শেখর সেনগুপ্ত ■ ৪৩

বন্ধু বিজন ■ রমানাথ রায় ■ ৭১

স্বর্ণমণি ■ সিদ্ধার্থ সিংহ ■ ৮৯

নন্দনা ■ মালিনী চট্টোপাধ্যায় ■ ১০৩

ছদ্মবেশ ■ পার্থসারথি গুহ ■ ১৫৭

প্রবন্ধ

হিন্দুত্বই ভারতের অন্তরাত্মা ■ ডা: মোহনরাও ভাগবত ■ ২১

পটভূমি পশ্চিমবঙ্গ : কেন্দ্র -রাজ্য সংঘর্ষ ও সংঘাত ■ সুজিত রায় ■ ২৯

সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে বাঙ্গালিয়ানার উদ্ভাস ■ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ৬৩

ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক মহর্ষি বেদব্যাস ■ গোপাল চক্রবর্তী ■ ৯৫

ভ্রমণ

দারুচিনি দ্বীপের ভিতর ■ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ■ ৭৯

With Best Compliments
From-

Eastern Cement Distributor

With Best Compliments
From-

Indegeneous Enterprises

Deals In : Pipes & Fittings, Valves, Tools & Hardwares

40, Strand Road, 4th Floor,
Room No- 17, Kolkata - 700001
E-mail : sandiprun310@gmail.com
Indegeneous@gmail.com
Phone : 4071-9122, 9331039399

With Best Compliments
From-

Shree Krishna Trading Co.

Deals In : Pipes & Fittings, Valves, Tools & Hardwares

158, Ramdulal Sarkar Street
1st Floor, Kolkata- 700006
Telefax : 4068 1050
Mobile : 98302 75776

With Best Compliments
From-

SK Plastocrats & Engineers Pvt. Ltd.

A House of Engineering Plastics

40, Strand Road, 3rd. Floor,
Room No- 14/1, Kolkata - 700001
Phone : +91 33 22622734
Telefax : +91 33 22431374

উপনিষদের আলোকে মহাশক্তি

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

'উপ'-'নি' পূর্বক সদ্ ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয় করলে হয় উপনিষদ্। 'উপ' মানে সমীপে, অর্থাৎ ব্রহ্মসমীপে অবিদ্যারূপী জীবাত্মার অবস্থান। এই অবস্থানের ফলে অবিদ্যার কার্যক্ষমতা নষ্ট হয় বলেই তার নাম উপনিষদ্। অন্যার্থে, যা নিশ্চয়রূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান তার নাম উপনিষদ। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত যাহা অর্থাৎ সারবস্তু যেখানে আছে তার নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্'— (বেদান্তসার)। শিবাবতার শঙ্করাচার্য উপনিষদকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলেছেন— 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ-শব্দ-বাচ্যা'। — এই ব্রহ্মবিদ্যাকেই প্রাচীন ঋষিগণ সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা বলেছেন। তাই, উপনিষদের নয়নেই মহাশক্তিরূপী দুর্গার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা।

শ্বেতশ্বতর উপনিষদের (১।৩) ঋষিরা জীবাত্মাকে জগৎকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন না, তার কারণ জীবাত্মা নিজেই কর্মাধীন। সুতরাং, তিনি জগতের কর্তা হতে পারেন না। সেই সকল ঋষিরা ধ্যানযোগে অনুভব করে মূল সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন যে, জগতের মূলকারণ হলো মহাশক্তি। ওই উপনিষদে তার নাম দেবাত্মশক্তি। 'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগূঢ়ম্।' কিন্তু ওই দেবাত্মশক্তিকে আমরা দেখতে পাই না কেন? তার কারণ, ঋষিরা বলেছেন যে, ওই শক্তি নিজ নিজ গুণ (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) দ্বারা আবৃত। ঋষিরা সেই মায়াকে কারণরূপে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁদের কাছে 'মায়া' 'প্রকৃতি' এবং 'মায়ী' 'মহেশ্বর', — 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। (৪।১০)। শঙ্করাচার্যের মতে, মায়াযুক্ত ব্রহ্মই সৃষ্টিকার্য করেন,— 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতন' (৪।৯)। মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম এক হয়েও স্বীয় পরাশক্তি দ্বারা শাসন করেন অর্থাৎ নিয়মিতভাবে জগৎ চালান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৪।১) আরও বলা হয়েছে— 'যে একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বামাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'— যিনি অদ্বিতীয় পরমাত্মা, জাত্যাদিহীন বিবিধ মায়াশক্তির সম্বন্ধবশতঃ কোনো প্রয়োজনের অপেক্ষা না করে এই বিশ্ব ধারণ করেন, পালন করেন এবং প্রলয়ের সময় সংহার করেন, সেই পরমাত্মা আমাদিগকে ব্রহ্মবিষয়িনী মতি প্রদান করেন। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' (ঐ, ৪।৩)। অর্থাৎ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হয়ে দণ্ডের সাহায্যে গমন করে থাক এবং তুমিই জাত হয়েও নানারূপ ধারণ কর।

কেনোপনিষদ ও দেবী-ভাগবতে মহাশক্তি মহামায়া 'হৈমবতী-উমা' উপখ্যানের কথা আমরা জানি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে উপনিষদেই একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানের (একাত্মজ্ঞানের) সঙ্গে সঙ্গে নানা দেবদেবীর পূর্ণ ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। পুরাণের ওই সকল নির্দেশ তত পরিস্ফুট না হওয়ার জন্যই সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি। উপাসককে নিজ উপাস্য দেবতা বা দেবীতে দৃঢ়নিষ্ঠ করাই মূল লক্ষ্য। উপনিষদে সেই কথাই বলা হয়,— যেমন নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— 'যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যা চ সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।'— যিনি নৃসিংহদেব, তিনিই দেবী সরস্বতী। শ্রীরামতাপনীয় উপনিষদে বলেছেন— 'যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্। যা সরস্বতী যা গৌরী ইত্যাদি।' আবার রুদ্রহৃদয়োপনিষদেও বলা হয়েছে— 'রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মীঃ'— রুদ্রই বিষ্ণু, উমাই লক্ষ্মী ইত্যাদি। দেবী উপনিষদে (অথর্বদেবীয়) বলা হয়েছে— 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ।'— অর্থাৎ, যিনি বহ্নিরূপা, তপস্যা দ্বারা দীপ্তিমতী, বিরোচন প্রবর্ত্তিনী সর্বপ্রকার কর্মফলবিধানকর্ত্রী, সুখতারণকারিণী অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী, সেই দুর্গাদেবীকে আমরা শরণপ্রাপ্ত হইতেছি। যে ব্রহ্মশক্তি ঋষিরা কারণ রূপে দর্শন করেছিলেন, সেই ব্রহ্মশক্তিই ওই তিনের (ভোক্তা— পুরুষ, ভোগ্যং— প্রকৃতি, প্রেরিতা— ঈশ্বর) প্রকৃত স্বরূপ। 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা। সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।' এই ত্রিবিধই ব্রহ্মশক্তি নামে পরিচিত।

দেবী উপনিষদে ভগবতী দুর্গার স্বরূপ বলা হয়েছে— 'সৈষাহষ্টৌ বসবঃ... কলাকাষ্ঠাদি কালরূপিণী।'— অর্থাৎ, এই দেবীই অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেবগণ, সোমপায়ী ও অসোমপায়ী দেবতাস্বরূপা। ইনিই স্বত্তঃ, রজঃ ও তমঃ গুণস্বরূপিণী। ইনিই প্রজাপতি, ইন্দ্র ও মনুস্বরূপা। ইনিই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃস্বরূপা এবং কলাকাষ্ঠাদি কালস্বরূপিণী। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে— 'মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি। সর্বমিদং রক্ষতি, সর্বমিদং সংহরতি।'— অর্থাৎ, এই নারসিংহী মায়াই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করিতেছেন। যে সাধক এই মহাশক্তির উপাসনা উপনিষদে ও ত্রিপুরাতাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে— 'একা সা (...সা) আসীৎ প্রমথা'— একমাত্র ত্রিপুরাদেবীই সৃষ্টির প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি। এই দেবীই (ত্রিপুরাসুন্দরী) সকলের আদিভূতা এবং কামাখ্যা নামে খ্যাতা, ইনি তুরীয়া, চৈতন্যস্বরূপিণী এবং তুরীয়েরও অতীতা। শ্রীরামতাপনীয় উপনিষদে রাম ও সীতাকে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে বর্ণিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রামের সান্নিধ্যবশতঃ সীতাকে প্রকৃতি বলে জানবে। সীতাদেবীই সকল প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। তিনি যখন প্রণবের সঙ্গে অভেদপ্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁকে প্রকৃতি বলেন। 'প্রণব প্রকৃতিরূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিরুচ্যতে'— তিনি মূল প্রকৃতিস্বরূপা এবং প্রণবপ্রকৃতিস্বরূপা।

সুতরাং উপনিষদের দৃষ্টিতে আমরা অবগত হলাম যে জগৎসৃষ্টির মূল কারণ মহাশক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেই শক্তিকেই 'দেবাত্মশক্তি' ও 'মায়ী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৈবল্যোপনিষদে তাকে 'উমাসহায়ং পরমেশ্বরম্' বলা হয়েছে। কেনোপনিষদে 'ব্রহ্মশক্তি' ও বেদে তাকেই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেই মহাশক্তির চরণতলেই শিশুর মতো নিজেকে মা-মা বলে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বামাখ্যাপা ও তৈলঙ্গস্বামী থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত সকল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ।

(সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)

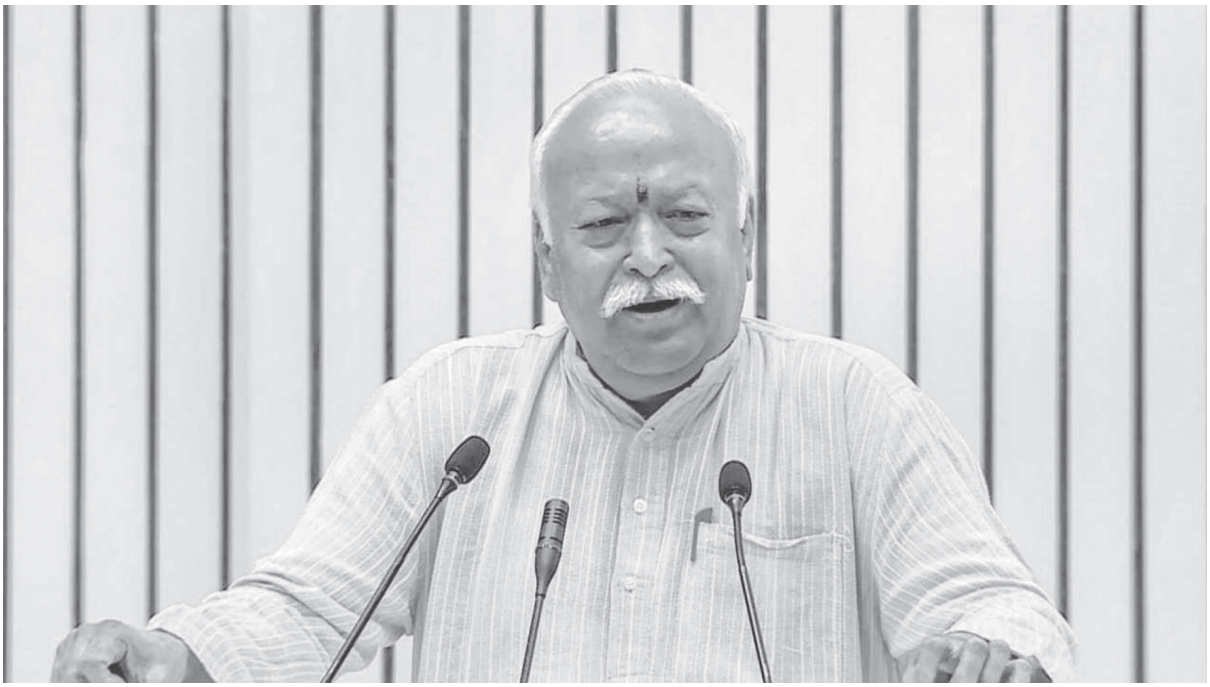

হিন্দুত্বই ভারতের অন্তরাত্মা

ডা: মোহনরাও ভাগবত

হিন্দুত্ব বিষয়টির নিজস্ব কতগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলো না বুঝলে হিন্দুত্ব বোঝা মুশকিল। বিদর্ভ থেকে আগত আমাদের এক সরসঙ্ঘচালক শ্রী দিদোলকরজী আমেরিকা গেলেন, সেখানে বসবাসরত তাঁর ছেলের কাছে। ছেলে নামি আইনজীবী। সে ভাবলো, বন্ধু-বান্ধব, পড়শীদের সঙ্গে বাবা-মা-র আলাপ করিয়ে দিই। সেইমতো সবাই মিলিত হলো। পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো। ছেলের বন্ধুরা জানতে চাইল, কতদিন হলো তাঁদের বিয়ে হয়েছে। দিদোলকরজী বললেন, ৫০ বছর।

একটিমাত্র স্ত্রীর সঙ্গে ৫০ বছর ধরে থাকছেন?

হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বছর তিনি প্রার্থনা করেন, যেন পরবর্তী সাত জন্মে আমিই তাঁর স্বামী হই।

শুনে ওরা স্তম্ভিত। আমাদের পরম্পরা ও মূলবোধ না বুঝে ওদের পক্ষে এইরকম চিন্তা করা অসম্ভব।

ইংরেজরা দুশো বছর আমাদের ওপর রাজত্ব করেছে। বিশেষত, ১৮৫৭ সালের পর তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল আমাদের নিজস্ব জীবনশৈলী ভুলিয়ে দিয়ে সবকিছু তাদের চশমা দিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা। বছরের পর বছর এই প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এই যে, হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তিই হিন্দু শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা বুঝতে বা মনে রাখতে পারবেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইংরেজদের এই প্রকল্পের ভেতর দিয়ে চলার ফলে ওই পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রাস করেছে। ব্রিটিশদের লেখা ভারতীয় ইতিহাসে পণ্ডিত আমেরিকান সাংবাদিক জোনা ব্ল্যাঙ্ক ১৯৯১-৯২ সালে শ্রীরামচন্দ্রের যাত্রাপথ অনুসরণ করে অযোধ্যা থেকে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করার পর তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতা 'অ্যারো অব দা ব্লু স্কিনড গড' বইতে লিপিবদ্ধ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ব্রিটিশরা তাদের 'লেখা' ইতিহাসে যাই বলুক বা করুক না কেন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ যে একটি সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে, তা হচ্ছে হিন্দুত্ব। কিন্তু তবুও, 'নীল চামড়ার দেবতা' কথাটা কেমন শোনায়? কিংবা 'কালো ভগবান' এই কথাগুলো কিন্তু কিছুতেই ওই নামের আসল ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে না।

ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না, পরীক্ষাগারে যা প্রমাণসাপেক্ষ নয়, কার্টেসীয় মতবাদে তা গ্রহণযোগ্যও নয়। আমরা কিন্তু এইরকম ভাবে ভাবি না। শেক্সপিয়র তাঁর এক নাটকে লিখেছেন, 'এমন অনেক জিনিসই আছে, যা তোমার মতাদর্শে নেই।' এই রকম জিনিসের সংখ্যা নগণ্য। আমরা তা বহুদিন ধরেই জানি। ভাষায় অপ্রকাশ্য, পরীক্ষাগারে অপ্রমাণ্য, কিন্তু জিনিসগুলো একেবারেই বাস্তবিক সত্য।

এগুলোর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়নি। 'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ' এবং 'যথেচ্ছসি তথা কুরু' অর্থাৎ যা বললাম তা ভালো করে ভেবে দেখো এবং তারপর যা ভালো বোঝো তাই কর। যত মত তত পথ— তাই যদি হয়, তবে আর কষ্ট করে সংজ্ঞা নিরূপণ করার কী দরকার? সেই চেষ্টায় বিভ্রান্তি শুধু বাড়েই।

অবশ্য হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চাইতে আরও শক্ত কাজ হচ্ছে হিন্দু কে, তা নিরূপণ করা। তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী একটা সংজ্ঞা তৈরি করা গেলেও তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বেশ নমনীয় ও কার্যকরী একটা সংজ্ঞা বীর সাভারকর দিয়ে গিয়েছেন—

আসিন্ধু সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।।

— হিন্দু সে-ই, যে সিন্ধু নদ ও মহাসাগরের মধ্যবর্তী ভূমির ভূমিপুত্র, যে ভূমি তার পিতৃভূমি, যে ভূমি পবিত্র ভূমি।

আমার মতে, সরলতম সংজ্ঞাটি দিয়ে গিয়েছেন ডা: হেডগেওয়ার। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— হিন্দু আসলে কে? ডা: হেডগেওয়ার সর্বদাই তর্কাতর্কি এড়াতে চাইতেন। তিনি বলতেন, 'সংজ্ঞা বানানো তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের কাজ, আমরা শুধু সেই সংজ্ঞা ব্যবহার করবো।' শোনা যায়, খুব করে চেপে ধরার পর তিনি বলেছিলেন, 'সে-ই হিন্দু, যে নিজেকে হিন্দু বলে, হিন্দু সে-ই যার পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন এবং আমরা যাকে হিন্দু বলি সে-ই হিন্দু।' ডা: হেডগেওয়ারের এই উক্তিটি কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। আসলে ডাক্তারজীর বহু কথাই অলিখিত থেকে গেছে। তাই অনেক কথাই তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁর 'হিন্দু' শব্দের এই সংজ্ঞাটির ওপর কেউ কখনও আপত্তি তোলেননি। সংজ্ঞাটি পুরোপুরি ব্যবহারিক, এটি নিয়ে কোনও রকম কোনও সমস্যা নেই। তিনি বলেছিলেন, সংজ্ঞার কোনও দরকার নেই, হিন্দু বলে ডাকলে যে সাগ্রহে সাড়া দেবে, সেই হিন্দু। আমাদের কাছে এই সংজ্ঞাটা বেশ ভালো লাগে, অন্যান্য সংজ্ঞা আবার অন্যদের ভালো লাগবে। কার্যকারণ বা পারিপার্শ্বিক ভেদে সংজ্ঞা তো বদলাতেই পারে এবং নিশ্চয়ই তাই হওয়া উচিত।

আমরা সর্বদাই বলি 'হিন্দু' কোনও ধর্ম নয়, ওটা একটা জীবনদর্শন। কথাটা সত্যি। কিন্তু ইংল্যান্ডে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (যেমন— মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এমনকী বৈষ্ণব ও শৈব)-এদের জন্য অনুদান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে, যা হিন্দুরা কখনও পায়নি। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠন এই নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়েছিল। কোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'তোমরা তো কোনও ধর্ম নও, একটা জীবনদর্শন মাত্র। এই তথ্যটা তোমাদের কাছ থেকেই এসেছে।' আমরা কোর্টে সওয়াল করলাম, জীবনদর্শন তো বটেই, তা ছাড়াও এটা একটা ধর্ম। আমরাই বললাম এই কথাটা এবং আরও সওয়াল করলাম যে, বিষয়বস্তুটা যেহেতু ধর্ম বিষয়ক, তার বিচার কোর্টের বিচারকরা বা সরকার করতে পারেন না। সে বিচার করবেন ধর্মযাজকরা। এই কথা আমরা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ ওদেশে এই ধরনের ধর্ম সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা বিশপরাই করে থাকেন। কোর্ট নয়। আমাদের সওয়াল মেনে নেওয়া হলো। তদানুসারে ইংল্যান্ডে আমাদের সঙ্ঘচালক শ্রী সত্যনারায়ণজী ওদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। বৈঠক চলল তিনদিন। বৈঠকে সত্যনারায়ণজী ব্যাখ্যা করলেন, কেমন ভাবে জীবনদর্শন হওয়া ছাড়াও হিন্দু একটা ধর্মও বটে। শেষ পর্যন্ত জয় হলো আমাদের। হিন্দু সংস্থাগুলো পেল সরকারি নিয়মে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

হিন্দুত্ব এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা ওখানে ওই পরিস্থিতিতে দরকারি ছিল। এতে আদৌ কোনও ভুল হয়নি। হিন্দু শব্দটা এখন কতরকম ভাবে, কত বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এত রকম সংযোগ বা ব্যবহার আগে ছিল না। দরকারও হতো না। আমাদের মূল ভাবনা হচ্ছে পৃথিবীকে এক ধরে সম্মিলিত এক মানব জাতির ভাবনা। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আসলে মানবধর্মেরই লিখিত আখ্যান ও উপদেশাবলী। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত— এদের কোনওটিতেই 'হিন্দু' শব্দ নেই। আমাদের তা কখনও দরকারও হয়নি। তবে কোথা থেকে এল শব্দটা? কথিত আছে যে খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জারাথুস্ট্র নিজস্ব মত প্রবর্তন করেন। একটু উগ্রতা ছিল তাঁর ব্যবহারে, তিনি বললেন যে, তাঁর মতবাদই সঠিক, আর সব ভুল। আর এদিকে দেখুন, আমাদের মতবাদ সর্বজনীন— সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযোজ্য, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মতবাদ সঠিক, ঠিক যেমনটা সঠিক তোমাদের মতবাদ তোমাদের কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে, তোমার কাছে তোমার ধর্ম। আমরা সর্বদাই এই বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেছি যে, ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা এক সঙ্গে হাঁটব এবং বিবাদের কোনও প্রশ্নই এখানে কখনও উঠবে না। তুমি আমার ধর্মবিশ্বাসের সম্মান রাখো, আর আমি শুধু সম্মানই নয়, বিশ্বাসও রাখব যে, পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা শেষপর্যন্ত একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব।

উপনিষদে এইরকম বিষয়বস্তুর ওপর একটা গল্প আছে। জিজ্ঞাসা করা হলো 'আত্মা কী? চরম সত্য (ব্রহ্ম) কী? আমরা উপাসনার মাধ্যমে সেই সত্যে উপনীত হতে চাই। তুমি তো জ্ঞানী, তুমি বলে দাও আমরা সঠিক পথেই যাচ্ছি কী না।' তো জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন সত্যের উপাসনা করছ তোমরা?' একজন বলল, 'বায়ুরূপী সত্যের (বায়ুব্রহ্ম) উপাসনা করি আমি।' উত্তর এল, 'বেশ, বেশ। সেই কারণেই তুমি এত স্বাস্থ্যবান ও উন্নতিশীল। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে চরম সত্য লাভ করবে।' আর একজন বলল, 'অগ্নিরূপী সত্যের (অগ্নিব্রহ্ম) উপাসনা করি আমি।' উত্তর এলো একই। নিজ নিজ প্রশ্ন করে সবাই ওই একই উত্তর পেল। শুনে তারা হতভম্ব হয়ে বসে রইল। তখন তাদের বোঝানো হলো যে, তারা প্রত্যেকে সেই চরম সত্যের এক একটা অংশের আরাধনা করছে। সেই সত্য সর্বব্যাপী এবং কারুর একার প্রণিধানের বাইরে। সত্যের অন্বেষণ সবাই নিজ নিজ পথে করুক। এই কথাই আমরা বিশ্বাস করি এবং বলি।

সবাই অবশ্য এই রকমের মতবাদ মেনে নিতে পারল না। তারা বলল, 'তোমরা ভুল বলছ, আমরাই সঠিক।' ভিন্ন মতবাদের গোষ্ঠী সৃষ্টি হতেই চিহ্নিত করার তাগিদে প্রয়োজন দেখা দিল নামকরণের।

ওই ভিন্ন গোষ্ঠী সিন্ধু নদ অতিক্রম করে ইরানে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। স্থানীয় অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কারা? আমরা জোরোয়াসট্রিয়, আর সিন্ধুর ওপারে যারা থাকে তারা তো হিন্দু।' বলা হয় যে, এই ভাবেই 'হিন্দু' শব্দটা এসেছে।

আমার সঙ্গে একবার আচার্য মহাপ্রজ্ঞার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের ধর্ম আলাদা, কিন্তু আমাদের সামাজিক গঠন হিন্দু, কৃষ্টি হিন্দু, আর এই জাতিও হিন্দু। 'হিন্দু' শব্দটা অতি প্রাচীন।' জৈন সাহিত্য এই শব্দটিকে 'জিপসি' বা ভবঘুরে অর্থে ব্যবহার করে। এই দেশের জনগণ সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াত। প্রথম যে আদিম মানব, তার এখানেই উৎপত্তি হয়েছিল, তারপর সে পৃথিবী ঘুরে এসে বেদে লিখল, 'আমাদের এই ভূমি চরম উৎকর্ষমণ্ডিত।' আমরা সবাই দেখেছি। এমনকী আজও, মারাঠি শব্দ 'হিন্দণে' ব্যবহার করা হয় ওই ভবঘুরে স্বভাব বোঝাতে। আমাদের ব্যবসায়ীরা বিদেশের মাটিতে নোঙর ফেললে মানুষ জিজ্ঞাসা করত, 'কারা এসেছে? কারা এসেছে?' আর উত্তর হতো, 'হিন্দুরা এসেছে।' আচার্য হরিপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, 'শব্দটা যেখানে উৎপত্তি সেখানেই থাকত এবং ব্যবহৃত হতো। আমরা সবাই মানুষ পরিচয়েই ছিলাম, আর কোনো পরিচয়ে নয়। পৃথিবীর কাছ থেকে আলাদা কোনো পরিচয় আমাদের দরকার ছিল না। যখন বিদেশি ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিত, তারা বলত, 'হিন্দুস্তান যাচ্ছি'। অর্থাৎ হিন্দুদের দেশে যাচ্ছি।

আমাদের প্রভূত সুবিধে হবে যদি আমরা হিন্দুত্বের সূক্ষ্ম, যথাযথ ও নির্ভুল সংজ্ঞা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে প্রতিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কী রূপ হবে সেটা বুঝে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করতে থাকি। এটাই পৃথিবীর এখন প্রয়োজন ও প্রান্তিক নিয়তি।

পৃথিবীতে যা ঘটছে, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ সে সবের খবর রাখেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনে বিষয়ের প্রসার ঘটে। আজ ড: সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তাঁর বক্তৃতায় ওই 'অ্যারো অব দি ব্লু স্কিনড গড' বইটির কথা উল্লেখ করেছেন, না হলে আমাদের অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা জানতে পারতাম না। তখনকার দিনেও ব্যাপারটা এইরকমই ছিল। 'হিন্দু' শব্দটি শিক্ষিত চিন্তাশীল সুধী সমাজে আলোচিত হতো, আর তারপর আস্তে আস্তে আমাদের সাহিত্যে এর ব্যবহার শুরু হয়।

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরং।
তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে।।

(ওই দেশ, যা হিমালয়ে শুরু হয়ে ইন্দু সরোবর অবধি বিস্তৃত, তার নাম হিন্দুস্থান। দেশটি নির্মাণ করেছেন দেবতারা)। কিন্তু তখনও শব্দটা খুব একটা জনপ্রিয় শব্দ ছিল না। ইসলামিক আক্রমণ শুরু হলো। সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে শুরু করল তারা। আমাদের দেশের ব্যাপারটা একটু আলাদা ছিল। তিন দিকে জলবেষ্টিত, বাকি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তরে হিমালয় আর হিন্দুকুশ পর্বতমালা। প্রচুর জল, উর্বর চাষের জমি, চমৎকার জলবায়ু। এর বর্ণনা বেদেও আছে। আমরা যেমন সমৃদ্ধিশালী ছিলাম, তেমনই ছিলাম সুরক্ষিত। তাই আমরা সব আগন্তুককেই স্বাগত জানাতাম, আপন করে নিতাম। শান্তি, অহিংসা, বিত্ত, সবই ছিল এখানে। কিন্তু মরু অঞ্চলে ওই সব কিছুই ছিল না। সেখানকার মানুষদের জীবন ধারণের দুটো রাস্তা খোলা ছিল। ওই অঞ্চলে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের কাছে ভিক্ষা অথবা চুরি। আবার চুরি করার মুশকিল হচ্ছে অধিকৃত দ্রব্যের সুরক্ষা। যাদের থেকে চুরি করা হচ্ছে তারা ছেড়ে দেবে কেন? ক্রমশ তৈরি হলো এক যোদ্ধা শ্রেণী। এতদিন তো অনেকরকম শ্রেণীই ছিল, জাতপাত, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদির ভিত্তিতে, আর তাদের মধ্যে অন্তর্কলহ তো লেগেই থাকত। কিন্তু এবার শুধু দুটো শ্রেণীই রইল। যারা মারছে আর যারা মার খাচ্ছে। যারা মারছে, তারা নিজেদের মুসলমান বলে অভিহিত করল। আর যারা মার খাচ্ছে তাদের সমবেত পরিচয় হলো তারা হিন্দু। বিষয়টা প্রথম উল্লেখ করেন গুরুনানক, বাবরের সম্পর্কে বলতে গিয়ে—

'হিন্দুস্তান খসমানা কিয়া, খুরাসান ডরায়া।'

(হিন্দুস্তানকে ধ্বংস করেছে সে, আর খুরাসনকে করেছে আতঙ্কগ্রস্ত)। সেই থেকে বিষয়টা দৈনন্দিন ব্যবহারে চলে এসেছে এবং রয়ে গেছে।

সেদিন আমার কাছে ৮৫ বছর বয়স্ক একজন লোক এসেছিলেন। সবাই বলাবলি করছিল, 'মান্য' দেশপাণ্ডে এসেছেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল মনোহর। তাঁকে ডাকনাম 'মান্য' বলে ডাকা হতো। সেই থেকে ওটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পরিচয়। এখন অনেক বয়স তাঁর। খুব নাম করা অ্যাডভোকেট। কিন্তু মনোহর রাও এসেছেন বললে সুরক্ষা বলয়ে তাঁর পরিচয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে, অনেকরকম কাগজপত্র দেখাতে হবে। কিন্তু 'মান্য' দেশপাণ্ডে বললেই নিমেষে সমাধান। হিন্দু পরিচয় এই রকমেরই একটা ব্যাপার। এক শব্দেই পরিচয় সম্পন্ন। এর অর্থ এই দেশে বসবাসকারী মানুষরা হিন্দু।

ভারতীয় সবারই পূর্বপুরুষ হিন্দু আর তাই এখানে বসবাসকারী সবাই হিন্দু। এটাই সত্য এবং সবাইকে তা বুঝতে এবং মেনে নিতে হবে। সঙ্ঘ যখন হিন্দু সংহতির কথা বলে, তখন সমস্ত ভারতীয়র সম্পর্কেই বলে। সঙ্ঘ কাউকে বাদ দিয়ে বলে না। সাংবাদিকরা কেবলই জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'সঙ্ঘ কেন মুসলমানদের সভ্য হতে দেয় না? কেন শুধুমাত্র হিন্দুরাই সঙ্ঘের সভ্য হতে পারে?' হ্যাঁ, আমরা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই গ্রহণ করি। আমরা সব ভারতীয়কেই হিন্দু মনে করি। আলাদা ভাবে আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ, হরিজন, শৈব, বৈষ্ণব,

জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান— এইসবের কোনো স্থান বা অস্তিত্ব নেই। যে এসে গৈরিক ধ্বজের কাছে মাথা নোয়াবে, সেই আমাদের কাছে হিন্দু। আমরা যেমন এই কথা বিশ্বাস করি, তেমনই আরও অনেকেই তা করেন। তাঁরা শাখায় আসুন বা না-ই আসুন সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা সঙ্ঘের সঙ্গেই রয়েছেন। তাঁরা গর্ব বোধ করেন সঙ্ঘের গৈরিক ধ্বজের আনুগত্যে। আর কেউ কেউ আছেন যাঁদের বিশ্বাস অতটা দৃঢ় নয়, তাঁরা আমাদের গর্বের ভাগীদার নন। আবার এমন মানুষও আছেন, যাঁরা হিন্দু পরিচয়ের জন্য প্রায় ক্ষমাপ্রার্থী। কেউ কেউ আবার মনে করেন তাঁরা দুর্ঘটনাবশত হিন্দু এবং এই কথা তাঁরা প্রকাশ্যে বলেওছেন। এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আনুগত্য বোধ করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তা বলতে নারাজ। কেননা প্রকাশ্যে এই কথা বললে তাঁরা কোথাও কিছু একটা হারানোর ভয় করেন। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে একজন বললেন, 'আমরা হিন্দু বলে নিজেদের বিশ্বাস করি, কিন্তু জনসমক্ষে এই অবস্থান নিলে আমরা আয়করে ছাড় পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবো। আমাদের সংগঠনের এতে ক্ষতি হবে, তাই দরখাস্তে আমরা লিখেছি আমরা হিন্দু নই। এতে আমাদের ভুল বুঝবেন না।' তাঁদের আমি বললাম, 'ভুল বুঝবো না, তবে অবশ্যই বিরোধিতা করবো।' সত্যিই তো, আপনি যদি হিন্দু বলে পরিচিত হতে না চান, তবে আপনি আপনার মৌলিক পরিচয় সত্ত্বাকেই হারিয়ে বসবেন।

তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে গণ-ধর্মান্তরকরণের পর একজন সাংবাদিক সেখানে গিয়ে এক পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আলোচনা শেষ হতে তিনি যখন চলে আসছেন তখন পরিবারের একটা ছোট্ট বাচ্চা বলে উঠল, 'ভানাক্কম' (অর্থাৎ তামিল ভাষায় নমস্কার)। বাবা শিশুটিকে শাস্তি দিলেন। বললেন, 'কী হচ্ছে এটা? আমরা এখন মুসলমান, আমরা ভানাক্কম বলব না, বলব 'আস্সালাম আলাইকম।' সাংবাদিক শুনে চমকে উঠলেন। উপাসনার পদ্ধতি পরিবর্তন করলে কি মাতৃভাষার পরিবর্তন হতে হবে? কেন? মাতৃভূমি হতে আজন্ম অর্জিত মৌলিক জীবনশৈলীর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন তো অতীব চিন্তার বিষয়! কোনো কোনো হিন্দু না জেনেবুঝেই বিষয়টার বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিষটা দেশ বা জাতির স্বার্থে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। এই পরিবর্তন দেশমাতৃকার পক্ষে আদৌ উপকারী হতে পারে না। আমাদের আন্দোলনের বৃহত্তম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত ভারতবাসীই হিন্দু এই বোধ জাগ্রত করা এবং এমন এক সম্মিলিত শক্তির উন্মেষ ঘটানো, যা যে কোনো আগ্রাসী শক্তিকে দুবার চিন্তা করতে বাধ্য করবে হিন্দুকে আঘাত করার আগে। আপনি যা বলছেন, তা কতটা ঠিক বা যুক্তিসঙ্গত তাতে কিছু যায় আসে না, আপনার পিছনে কী শক্তি রয়েছে তার উপরই নির্ভর করবে পৃথিবীতে আপনার কথায় কেউ কান দেবে কী না। সেই জন্যই আমাদের জাতিগতভাবে শক্তিধর হতে হবে।

আমরা বলছি যে, সেই শক্তি সহজেই অর্জন করা যায়, যদি যাঁরা নিজেদের হিন্দু মনে করেন শুধু তাঁরাই একত্রে সংগঠিত হন। আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই হিন্দু ছিলেন। আমরা যা করছি তা কোনো কিছুর বিরোধিতা করার জন্য কিংবা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আদৌ করছি না। আমরা যা করছি, তা দেশ ও জাতির স্বার্থে। দেশ শক্তিশালী হলে আমাদের সবার ভালো হবে, সবাই সসম্মানে বেঁচে থাকবে। সঙ্ঘের হিন্দুত্ব সর্বসমাবেশক, কাউকেই আমরা পর বলে ভাবি না।

তাহলে ঠিক কীভাবে আমরা হিন্দুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবো? হিন্দুত্ব মানে মুসলমান বা খ্রিস্টানদের বিরোধিতা নয়। যে কোনো হিংসা, তা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, তা হিন্দুত্ব হতে পারে না। কেউ কেউ বলে, 'অহিংস'। আমরা বলি 'চরম অহিংস।' যেমনটি জৈনরা বলে থাকেন। সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের প্রকাশ কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী হবে। এই প্রকাশ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পত্নী দেবী রুক্মিণী, আর দ্বীপবাসী স্থূলকায় এক ঋষি সম্পর্কিত একটা বিশেষ আখ্যান আছে। কৃষ্ণ (যাঁর অনেক পত্নী রয়েছে) যমুনা নদীকে বললেন, 'দেবি, আমি যদি সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকি, তবে আমার স্ত্রী রুক্মিণীকে যাবার জন্য পথ ছেড়ে দিন।' যমুনা তাই করলেন। ফেরার পথে ঋষিবর, যিনি দিনে চারবার ভূরিভোজ করেন, নদীকে বলেন, 'হে দেবি, যদি আমি সারা জীবন উপবাস করে থাকি, তবে আমার যাবার রাস্তা করে দিন।' আবারও যমুনা তাই করলেন। তো দেবি রুক্মিণী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, এটা কেমন হলো?' কৃষ্ণ বললেন, 'আমি আর ওই ঋষি দুজনেই জগতের হিতার্থে যা যা করণীয় সবই যথাযথ করেছি এবং সেই কাজ থেকে সময় নিয়ে ব্যক্তিগত সুখ ভোগ করিনি। সেই কারণেই আমাকে ব্রহ্মচারী এবং ঋষিবর উপবাসী বলে গণ্য করা হয়েছে।' যা ঘটেছে তা পারিপার্শ্বিক কার্যকারণের ফলশ্রুতি হিসেবেই ঘটেছে। তাহলে কি ব্রহ্মচর্য বা উপবাস এদের সংজ্ঞা পাল্টে গেল? আদৌ তা নয়। সেই সংজ্ঞা অপরিবর্তিতই রয়েছে। শুধু ওই পরিস্থিতিতে ওই দুই মহামানবের প্রতি ওই সংজ্ঞা প্রযোজ্য ছিল না।

অনুরূপ ভাবে, হিন্দুত্বকেও বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। শিবাজী মহারাজ কি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না? তিনি ন্যায় ও শান্তি এই দুটিই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতেন। তাহলে তিনি কেন আফজল খাঁকে ধোঁকা দিয়েছিলেন? এই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ধোঁকা তো দিয়েই ছিলাম। প্রয়োজন পড়লে আবারও দেব। আফজল এসেছিল আমাকে জীবিত বা মৃত যে কোনো অবস্থায়ই বীজাপুরে নিয়ে যাবার জন্য। আমি কি ওর কাছে আত্মসমর্পণ করে মরব? কিন্তু বল দেখি, আমি কি কোনোদিন কোনো বন্ধুকে প্রতারিত করেছি?' কী বলবেন? শিবাজী মহারাজ অসৎ ছিলেন? মাতৃভূমির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এই সমস্ত কিছুই যে ধ্বংস করতে উদ্যত, তাকে বিনষ্ট করা তো পবিত্র দায়িত্ব। এই রাজনৈতিক দায়িত্বই তো তিনি পালন করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, 'যেসব মূল্যবোধের কথা তুমি এখন বলছো, কোথায় ছিল সেই সমস্ত মূল্যবোধ তখন?' কথাটা লক্ষ্য করুন। যুক্তিহীন কথা, তাই বলবেন তো? কিন্তু ওই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করণীয় কাজ ছিল তাই, ঠিক যেমনটা ছিল মহারাজ শিবাজীর, তাঁর সেই মুহূর্তে। সঠিক মুহূর্তের সুযোগে করণীয় সঠিক কাজ বা বক্তব্য সঠিক বার্তা। কিন্তু এখন কেউ যদি যুক্তিহীন তর্কে

প্রবৃত্ত হয়ে বলে, 'রাম সেতু ধ্বংস করে দেব।' তবে আমরা তা হতে দেব না। যে কোনো বক্তব্যের সত্যতার একটা প্রাসঙ্গিকতা থাকা দরকার। হিন্দু সমাজকে এই প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারে সতর্ক, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ হতে হবে। কী করণীয় এবং তা করতে গিয়ে আমার জাতি, সমাজ বা মানুষের ক্ষতি হবে কী না সেকথা মাথায় রাখা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমার সমাজের সুরক্ষার মতো একটা অতি জরুরি বিষয়ের প্রতি, যার জন্য প্রয়োজনে একটি প্রাণ বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। একটা জনগোষ্ঠীর ক্ষতি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, আর একটা প্রাণ বলিদান একটা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর প্রয়োজনে— এটা মেনে নেবার মানসিকতা তৈরি করা দরকার। পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের বরাবরই ছিল, এখনও রয়েছে। সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন আদৌ নেই।

অতএব, যে কোনো বক্তব্যের সত্যতার একটা পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতা থাকা দরকার। একমাত্র তাই হবে সত্য, মনুষ্যত্ব ও ভ্রাতৃত্ব। এখানেই এই 'হিন্দু' শব্দটার প্রয়োজন। কেননা, আর কোনো শব্দ এই ধারণা এবং প্রত্যয় পরিস্ফুটিত করতে পারে না। এই শব্দ আমরা ব্যবহার করতেই থাকব, যেমনটা করতে থাকবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও। একবার এক খোলা বৈঠকে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'হিন্দু শব্দটা আপনারা রাখবেনই? ভোট বাক্সে ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছো তো।' আমি বললাম, 'এই প্রশ্ন তাদের জিজ্ঞেস করুন, যাদের ভোট দরকার।' তারা বলল, 'আপনারা তো আসলে সবাই ঐক্যবদ্ধ, আপনি ওটা পাল্টালে ওরা তা মেনে নেবে?' তখন আমি বললাম, 'আমরা ওটা বদলাব না, তাতে আমাদের জনপ্রিয়তা কমে গেলেও। আমাদের যদি ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিলীনও হয়ে যেতে হয়, তবে আমরা বিলীন হব হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরেই।' হিন্দুত্ব আমাদের চলার পবিত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অন্যান্যরা নিজ নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকুন না, অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করুন না, যদি অভিপ্রায় এক হয়, তবে আমাদের কোনো সমস্যাই নেই।

কিন্তু আমরা এই 'হিন্দু' শব্দটাই সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার করব। কেননা আজ এই শব্দের ওপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। যাঁরা আমাদের দেশ ও জাতির মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী মতাদর্শ রাখেন, তারা 'ভারত' বা 'ভারতীয়' শব্দগুলো মেনে নেন, কিন্তু 'হিন্দু' শব্দটা মানতে পারেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতে অ-হিন্দু আছেটা কি? আমরা বাইবেল কিংবা কোরান ধর্মগ্রন্থ দুটিকে সম্মান করি, কিন্তু কেমন করে মেনে নিই যে গ্রন্থদ্বয় ভারতীয়? কোরান এসেছে আরবস্থান থেকে আর বাইবেল এসেছে ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া থেকে। রামকৃষ্ণ পরমহংস যোগ সাধনায় যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, অতএব যিশু খ্রিস্টকে আমাদের সম্মান করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তাঁকে কেমন করে ভারতীয় বলি? বলতে পারি না, কারণ যিনিই ভারতীয়, তিনিই হিন্দু। 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' এই শব্দ দুটো সমার্থক। কিন্তু বিভেদপন্থীদের কাছে 'ভারত' সঠিক, অথচ 'হিন্দু' সঠিক নয়, কেন? ভারতে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা, তা হিন্দুদেরই জন্য বলা হচ্ছে, ভারতে অনেক দ্বিধা, অনেক বিরোধ রয়েছে। কোন ভারতে? ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের আগের ভারত, না ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পরের ভারত? কিংবা যখন আফগানিস্তান গান্ধার ছিল, কিংবা যখন ভারত সম্পূর্ণই অবিভক্ত ছিল? কোন ভারত? এই যে মনের অস্থিরতা, এটা কিছু লোক নিজেদের সুবিধার্থে সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা প্রচুর পরিমাণে ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে বিভেদপন্থী এক আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে। তা সফল হলেই তারা ঘোষণা করে বসবে এটা ভারতের অংশ নয়। কেন বারবার কাশ্মীরে গণভোটের দাবি তোলা হচ্ছে? কারণ তাদের ধারণা গণভোট হলে ফলাফল তাদের অনুকূলে যাবে। সেটি অবশ্য হবার নয়। কাশ্মীরের জনগণ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে আদৌ চান না, তাঁরা ভারতের মধ্যেই থাকতে চান।

ভোটের মাধ্যমে কি এই সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা হবে? বর্তমান ব্যবস্থা 'ভারত' শব্দের মান্যতা দেয়, কিন্তু 'হিন্দুত্ব' শব্দের নয়। আমাদের মতাদর্শের মহানুভবতার কারণে আমরা কিন্তু জোর করে আমাদের মতাদর্শ অন্যদের ওপর চাপাই না। কেননা আমরা মনে করি তাদের আদর্শ নিশ্চয়ই তাদের কাছে সঠিক এবং আমরা এই বিভিন্নতার মধ্যেই একসঙ্গে কাজ করতে পারি। এটা কিন্তু আবার বহুজাতীয় সংস্থাগুলির পছন্দ নয়। তাদের কায়েমি স্বার্থ ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এটা সেই বিভেদপন্থীদেরও পছন্দ নয়। যারা সমস্ত দেশটাকেই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রঙে রাঙিয়ে দিতে চায়। একটিমাত্র শক্তিই রয়েছে, হিন্দু। যে এই স্বৈরাচারী, মৌলবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এই 'হিন্দু' শব্দটাই এই মূল বিষয়টা সঠিকভাবে পরিস্ফুটিত করে তোলে। আর সেই জন্যই এর বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত আক্রমণ। আর এই কারণেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সঙ্ঘ কোনোদিন এই 'হিন্দু' শব্দটি পরিত্যাগ করবে না। অন্যেরা তা করলে এটা মনে রেখে করবে যে, মূল মতাদর্শ অবিকৃত থাকছে। হিন্দুত্বের মূল মতাদর্শ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সময় মনে রাখতে হবে আমরা ঠিক কী কারণে এই শব্দটিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছি। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর তাঁর দেহে পদাঘাত করা আমাদের সংস্কৃতি নয়, আমাদের সংস্কৃতি হলো রাবণের পরাজয়ের পর তাঁর কাছে লক্ষ্মণকে পাঠানো প্রশাসন সম্পর্কে পাঠ নিতে। কেননা, রাবণ অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। শত্রুতার পরিবেশেও আমরা কখনো সীমা লঙ্ঘন করি না। ওই শত্রুতা জগৎ হিতার্থে ছিল, কিন্তু তবুও শত্রুতা সর্বদাই শেষ অবলম্বন হওয়া উচিত। আমরা যুদ্ধের আগে দূত হিসাবে অঙ্গদকে পাঠাই, যাতে যুদ্ধ এড়ানোর শেষ কোনো রাস্তা বের করা যেতে পারে। এইরকম বিচক্ষণতা তো থাকতেই হবে। বিরোধের মূল বিষয়টা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে থাকলেই এই বিচক্ষণতা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং কী শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, তার চাইতে বড়ো কথা হলো সেই শব্দ মূল মতাদর্শকে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত করছে কী না। সেটা করলেই সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকবে।

এসবই আমাদের মূল মন্ত্র। সাহিত্যে, পত্র-পত্রিকায় আলোচিত এবং আমাদের পরম্পরায় বিধৃত। আসল সমস্যা হচ্ছে এদের বাস্তবায়ন এবং অনুশীলন। এই মূলমন্ত্রগুলো সমাজকেই প্রয়োগ

করতে হবে। ধর্ম, সংস্কৃতি এই সবই বহুল আলোচিত, প্রশংসিত এবং বৌদ্ধিক স্তরে গৃহীত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সমাজ। বিপদটা সাধারণ নয়, এর দুটো মুখ আছে। একে তো হিন্দু সমাজ আজ আক্রান্ত এবং এর পুনর্জাগরণ অতি আবশ্যক। তাকে প্রত্যাঘাত করতে হবেই। এই প্রত্যাঘাত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কিন্তু বিজয়ী তাকে হতেই হবে। হিন্দু সমাজের বিজয়ের অর্থ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির বিজয়। পিছু হটা বা হার স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই নেই। বিজয়ী না হতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতি চলতেই থাকবে। হিন্দু সমাজ থাকবে, আর সঙ্গে থাকবে আগ্রাসী শক্তিগুলো। বিজয় ব্যাতীত আর কোনো রাস্তা নেই।

এই বিবাদ বিগত ১২০০ বছর ধরে চলছে। এটাই একমাত্র যুদ্ধ যা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে এখনও চলছে। আমাদের এই যুদ্ধে জিততেই হবে। কিন্তু এই রকমটি কেন হলো যে শুধুমাত্র আমরাই এই আগ্রাসনের একমাত্র লক্ষ্য? আর বিপদের দ্বিতীয় মুখ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। এই দুর্বলতা আমাদের নিষ্কাষণ করে ফেলে দিতে হবে। এমন একটা সময় ছিল, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরাও নবি মহম্মদ ও যিশু খ্রিস্টের জন্মের পর আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু বলে মানতেন। অনেক কাব্যেই এর উল্লেখ আছে। তাঁরা এখান থেকে জ্ঞান লাভ করতেন। ১৮৫৭ সাল অবধি এই পরিস্থিতি বজায় ছিল। সমগ্র ইউরোপ ভারতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ ছিল। হিটলার নিজেকে কেন 'আর্য' বলে অভিহিত করতেন? পশ্চিম জগতে এই শব্দটা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতক এবং সম্মানিত। তাহলে আজ আমাদের এই অবস্থা কেন? আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল হয়েছে। আমাদের সমাজে কত রকমের বিভিন্নতা, কত দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরাই আমাদের মানুষজনের চারপাশে দেওয়াল খাড়া করেছি। আমরা ওদের থেকে নিজেদের আলাদা করেছি। সাগর পাড়ি দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। কত দুর্নীতি, অসদাচরণ আমাদের দুর্বল করেছে। শাস্ত্রে আমাদের নারীদের উচ্চতম আসন দেওয়া হলেও আমরা নিজ গৃহে তাঁদের পরিচারিকার স্তরে নামিয়েছি। বহুবিধ দুষ্কর্ম আমাদের শতধা বিভক্ত করেছে।

আমাদের দেশের সীমানা আক্রান্ত। তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কী এসে যায়? আমরা ভুলেই গেছি যে আমাদের জাতি এক ঐক্যবদ্ধ জাতি। মানবতা আক্রান্ত এবং আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সুরক্ষা দেওয়া। এই সুরক্ষা দেওয়া ছাড়াও আর একটা আনুষঙ্গিক কাজ রয়েছে। সেটা হচ্ছে, ওই আক্রমণকে সুবিধা করে দেবার জন্য যে অভ্যন্তরীণ অপপ্রচার চলছে, তার মোকাবিলা করা। যে মোকাবিলা অনেক রকমেই হয়। এছাড়া মানুষ মনে করেন বিবেকানন্দর হিন্দুত্ব, হেডগেওয়ারের হিন্দুত্ব, সাভারকরের হিন্দুত্ব, সঙ্ঘের হিন্দুত্ব, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিন্দুত্ব, বজরঙ্গ দলের হিন্দুত্ব— এই সবই ভিন্ন ভিন্ন। আসলে আদৌ তা নয়। হিন্দুত্ব কোনো ব্র্যান্ড বা ট্রেডমার্ক নয়, এটা কারুর একচেটিয়া নয়, তা হতেও পারে না। হিন্দুত্ব প্রসারিত হয়েছে ভারতে, কিন্তু সেটা একটা কাকতলীয় বা সমাপতন মাত্র। আমরা হিন্দু এবং আমাদের দিয়েই হিন্দুত্বের প্রসার হবে। সেটা ঐশ্বরিক পরিকল্পনা। কিন্তু হিন্দুত্ব অক্ষয়, চিরন্তন সত্যের খোঁজে এক চলমান অন্বেষণ। মহাত্মা গান্ধীর কথায়, 'হিন্দুত্ব হচ্ছে সত্যের অবিচল অনুসন্ধান।'

হিন্দুত্ব ভারতের অন্তরাত্মা। জাতি যখন হিন্দুত্বের আধারে পুনর্গঠিত হবে, ভারত তখন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কারণ জীবনের সমস্ত দিক এবং উপাদান এতেই রয়েছে। আর সেই কারণেই গড়ে উঠেছে এর রাজনৈতিক সংযোগ। হিন্দুত্ব যদি জাতির অন্তরাত্মা হয় এবং সেই ভাবনায় যদি জাতি পুনর্গঠিত হতে থাকে, তবে এর প্রবক্তা এবং বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী। রাজনীতিতে বহুবিধ মতামত থাকে। এই বিসংবাদের তেমন কিছু গুরুত্ব নেই। হিন্দুত্ব স্বয়ং কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলই হিন্দুত্বের অংশীদার, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলই সম্পূর্ণভাবে আমাদের নয়। রাজনীতির জরুরি দায়িত্ব হচ্ছে হিন্দু সমাজের ওপর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে বিজয়ী হওয়া। এই কারণে সব আন্দোলনই রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, তাতে কিছু অসুবিধা নেই। কারণ সকলেই তা করে থাকে।

কিন্তু রাজনীতিই সব নয়। রাজনীতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা করণীয় কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিতও নয়। রাজনীতি আন্দোলনের আনুষঙ্গিক এবং পরিপূরক ক্রিয়া মাত্র। আন্দোলন বা রাজনীতির অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তির আচার আচরণ, কাজকর্ম, তার স্থিতি অনুসারে যথাযথ হবে এবং রাজনীতি একমাত্র আমাদের জাতীয় স্বার্থেই চালিত হবে, তার অন্যথা নয়। হিন্দু আন্দোলনে হিন্দুত্বের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোনো অবস্থান হয় না। হিন্দুত্ব আমাদের পরিচয়, আমাদের জাতীয় স্থিতি। হিন্দুত্বের বিরোধীরাও বিদেশে হিন্দু বলে বিবেচিত হয়। ড: সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী যখন চীনে গেলেন, এক মৌলবি তাঁকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার ধর্ম কী?' স্বামীজী বললেন, 'হিন্দু'। সঙ্গে সঙ্গে মৌলবি জানতে চাইলেন, 'কোন দেবতার আরাধনা করেন?' স্বামীজী বললেন, 'মহাদেব শিব।' মৌলবি তখন বললেন, 'তাহলে বলুন আপনি শৈব। আমি আপনার জাতীয়তা জানতে চাইনি। ভারত থেকে এসেছেন যখন, আপনি নিশ্চয়ই হিন্দু। আপনার ধর্ম হচ্ছে কোন দেবতার উপাসনা আপনি করেন, তা। সেটা প্রথমেই বলতে পারতেন।'

'হিন্দু' পরিচয়ের যত বিরোধিতাই করা হোক না কেন, বিদেশে গেলে কি হয় দেখেছেন? স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় হিন্দু যোগী' নামে বিখ্যাত ছিলেন। এটাই আমাদের পরিচয় এবং এই ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বোধ থাকা প্রয়োজন। নিজের পরিচয় নিয়ে আর কোনো দেশের বিভ্রান্তি নেই, শুধু আমাদের দেশ ছাড়া। সবাই এই কথা বলে। কিন্তু 'হিন্দু' এই শব্দ শুনলেই আবার অসন্তোষের ফিসফাস। আমাদের রেলগাড়িগুলোর নাম 'হিমগিরি এক্সপ্রেস, কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস— এরকম কেন? আর কোনো নাম নেই? প্রতিটি সরকারি দপ্তরের মূলমন্ত্র সংস্কৃতে লেখা। পুলিশ দপ্তর, যারা হিন্দু আন্দোলনের লোকদের ধরে ধরে গ্রেপ্তার করে, তাদেরও তাই— 'সদ্ রক্ষণায়, খল নিগ্রহণায়।' (গুণীর সুরক্ষা, অশুভের বিনাশ)।

সবাই একই কাজ করে। সবাই কার্যক্রমের প্রারম্ভে প্রদীপ জ্বালায়। কিন্তু বিজেপি করলেই দোষ। সমস্ত কাজেই হিন্দুত্বের প্রকাশ কিন্তু স্বীকার করতে যত আপত্তি। কলেজে পড়ার সময় সিনেমার একটা হিন্দি গান শুনেছিলাম। নায়ক জিজ্ঞেস করছে, 'আজ সোমবার? বাগানে ফুলের বাহার আছে?' ইত্যাদি। সব প্রশ্নেরই উত্তর— হ্যাঁ। একই লয়ে শেষ প্রশ্ন, 'আমায় ভালবাস?' উত্তর, 'না, না, না।'

ঠিক তেমনই সমস্ত কাজেই তুমি হিন্দু, তবে এত অস্বীকার কেন? কী লাভ এতে?

আমরা যদি আমাদের আত্মপরিচয় সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং গর্ব করে তা বলতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবে। আমাদের সব কাজেরই উৎস হিন্দুত্ব। এটাই আমাদের পরিচয়। হিন্দুত্বের এই বোধ মনুষ্যজাতির উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানবিকতার অপর প্রতিশব্দ হিন্দুত্ব। এই পরিচয়ে সংকোচের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। সমগ্র পৃথিবীরই প্রয়োজন হিন্দুত্বের শুভ জাগরণ।

প্রত্যেককেই বুঝে নিতে হবে হিন্দুত্বের বোধ ঠিক কীভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করতে হবে। কীভাবে একে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। পণ্ডিত দীনদয়ালজীর পরামর্শ হচ্ছে, 'একাত্ম মানবদর্শন।' সেটা কী? সেটা হলো বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্বের উপলব্ধি ও প্রয়োগ। হিন্দু রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের এগোতে হবে। এর অধ্যয়ন ও প্রয়োগ শেখাতে হবে হিন্দু সমাজকে। বিভাজন, অপক্রিয়া ইত্যাদির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য হিন্দু মূল্যবোধ সংবলিত নতুন কর্মপদ্ধতি শুরু করতে হবে। রাজনীতি এই সামগ্রিক ব্যবস্থার একটা উপাদান মাত্র। এই সংগ্রাম প্রতিটি পরিবারে হয়ে চলেছে। যেহেতু পরিবার সমগ্র সমাজব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই আমাদের মূল্যবোধ, জ্ঞান, পরম্পরা যদি পারিবারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সুরক্ষিত রাখা যায়, তবে কারুর সাধ্য নেই আমাদের সঙ্গে বিরোধে নামে। পরিবারকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। করণীয় কাজ কতই তো আছে। যারা রাজনীতি করছেন, তারা সুচারু ভাবে রাজনীতি করুন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ভারতের প্রাচীন দৃঢ় সমাজব্যবস্থার বর্তমান এই হাল হলো কী করে? অল্প কিছু লোক ৮০০০ মাইল দূর থেকে এসে কী করে আমাদের শাসন করতে শুরু করল? এর থেকে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সংশোধন করা দরকার। এই সমস্ত কাজ এক সঙ্গেই চলতে থাকবে। আমাদের প্রভূত সুবিধে হবে যদি আমরা হিন্দুত্বের সূক্ষ্ম, যথাযথ ও নির্ভুল সংজ্ঞা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে প্রতিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কী রূপ হবে সেটা বুঝে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করতে থাকি। এটাই পৃথিবীর এখন প্রয়োজন ও প্রান্তিক নিয়তি। এই কাজ করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়।

আহমেদাবাদে ২০০৯ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিচার মঞ্চ (গুজরাত) আয়োজিত 'হিন্দুত্ব ইন প্রেজেন্ট কনটেক্সট্' শীর্ষক দুদিন ব্যাপী সেমিনারে সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহনরাও ভাগবতের উপসংহার বক্তব্যের অনুবাদ।

অনুবাদক : অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র, স্বয়ংসেবক, কলকাতা।

রত্নসম্রাট
জুয়েলারি

সঠিক জ্যোতিষ পরামর্শ এবং ১০০ শতাংশ গ্যারান্টিযুক্ত আসল গ্রহরত্নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

জ্যোতিষ বিভাগ শনিবার ও রবিবার
বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ শ্রী গৌতম দেব এখানে
নিয়মিতভাবে বসছেন।

—ঃ আজই যোগাযোগ করুন ঃ—

কুমারঘাট, ঊনকোটি, ত্রিপুরা, পি ডব্লিউ ডি রোড,
মোবাইল : ৯৮৬২৪১৮৪৭৫ / ৭০০৫৫১৭৭৫৭

গৌতম দেব অ্যাস্ট্রোলজার ইউ টিউব চ্যানেলটি আজই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

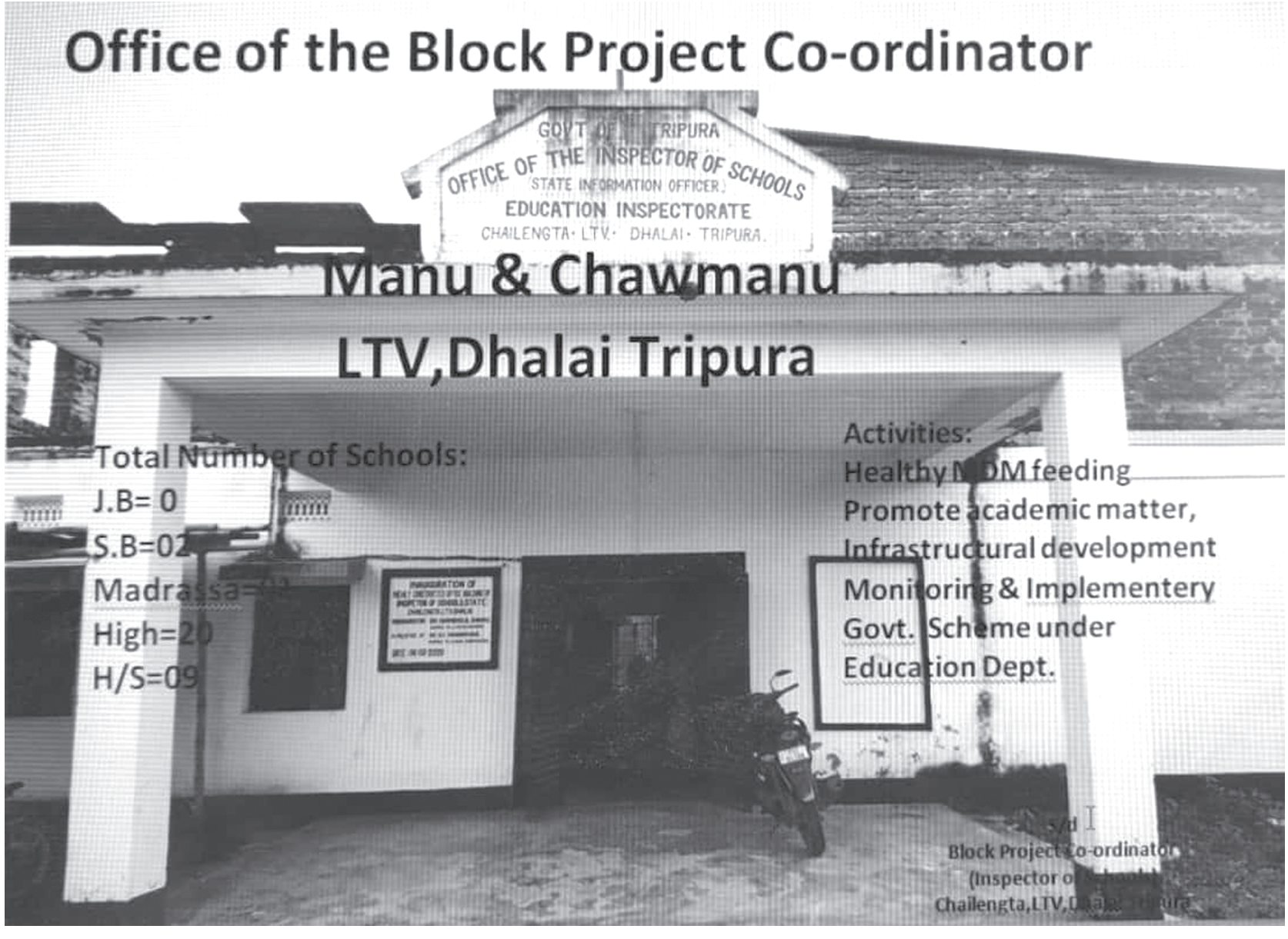
Office of the Block Project Co-ordinator
GOVT OF TRIPURA
OFFICE OF THE INSPECTOR OF SCHOOLS
STATE INFORMATION OFFICER
EDUCATION INSPECTORATE
CHAILENGTA· LTV· DHALAI· TRIPURA.
Manu & Chawmanu
LTV,Dhalai Tripura
Total Number of Schools:
J.B= 0
S.B=02
Madrassa=
High=20
H/S=09
Activities:
Healthy MDM feeding
Promote academic matter,
Infrastructural development
Monitoring & Implementery
Govt. Scheme under
Education Dept.
s/d
Block Project Co-ordinator
(Inspector o
Chailengta,LTV,D
ura

পটভূমি পশ্চিমবঙ্গ
কেন্দ্র-রাজ্য সংঘর্ষ ও সংঘাত

সুজিত রায়

সবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।

রচিত এবং গৃহীত হয়েছে স্বাধীন এবং সার্বভৌম ভারতের সংবিধান। কেন্দ্র চাইল প্রিভেন্টিভ ডিটেকশন আইনের সম্প্রসারণ। কেরলে তখন মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ। ভারতের একমাত্র কংগ্রেস বিরোধী রাজ্য।

কেন্দ্র বৈঠক ডাকল সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। সেখানেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে আপত্তি তুললেন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ। তাঁর বক্তব্য, ওই আইনের সম্প্রসারণ মানে মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া। বৈঠকে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধান চন্দ্র রায়। নাম্বুদ্রিপাদের তর্কে অসন্তুষ্ট ডা: রায় তাঁকে একটু মৃদু তিরস্কারের সুরেই বললেন, 'হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে আপনিই একমাত্র দেশপ্রেমিক।'

এই তিরস্কার কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদকে তাঁর অবস্থান থেকে নড়াতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে তাঁর আপত্তি ধোপে টেকেনি। কিন্তু তিনি বিধানচন্দ্র রায়কে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কোনো বিতর্কে যোগ দেব না। কিন্তু বৈঠকের কার্যাবলীর রেকর্ডে যেন আমার আপত্তিটা নথিবদ্ধ করা হয়।'

ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সম্ভবত সেটাই ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সম্পর্কিত প্রথম বিতর্ক।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কেন্দ্র রেল ধর্মঘটের মুখোমুখি হয়। কেরল সরকার ওই ধর্মঘটীদের সমর্থন জানিয়েছিল। অনুপ্রেরিত রেলকর্মীরা হুমকি দিল, তারা রাজ্যের কেন্দ্রীয় দপ্তরে আগুন লাগিয়ে দেবে। বাধ্য হয়েই নয়াদিল্লি কেন্দ্রীয় পুলিশ মোতায়েন করে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করে। কারণ, কেরলের রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি রক্ষায় কোনো দায়িত্ব নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল।[১]

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরপর সবচেয়ে বড় সংঘাতটি সৃষ্টি হলো এই পশ্চিমবঙ্গেই। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে। সেবারই প্রথম এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরকারকে হটিয়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছিল সম্মিলিত অ-কংগ্রেসি জোট যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর তৎকালীন বহু বিতর্কিত রাজ্যপাল ধর্মবীরা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই সি এস) অফিসার। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং ক্যাবিনেটের যুগ্মসচিব হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। তিনি রাজ্যপাল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে পা রাখার পর থেকেই টুকিটাকি বিতর্ক লেগেই ছিল নয়া সরকারের।

নতুন সমস্যায় পড়ার পর যুক্তফ্রন্ট চেয়েছিল, নতুন করে নির্বাচন

ঘোষিত হোক। কারণ কংগ্রেসি চক্রান্তে যুক্তফ্রন্টের বহু মন্ত্রী ও বিধায়ক ততক্ষণে পদত্যাগ করেছেন। আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি ছিলেন পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (পিডিএফ) দলের নেতা। কড়া রাজ্যপাল ধরমবীরা যুক্তফ্রন্টের সব দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের আগেই ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করে দিলেন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষায় 'বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদীদের নেতা প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। এই সরকারকে সমর্থন জানায় কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাহয্যে, বিগত নির্বাচনে জনগণের কংগ্রেস-বিরোধী রায়কে সামান্য গুরুত্ব না দিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ মুখমন্ত্রীর পদে আসীন হন। গঠিত হয় পিডিএফ সরকার। রাজ্যের জনগণের নির্বাচনী রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যে বেনামি কংগ্রেস শাসন শুরু হয়।[২]

এই ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যজুড়ে শুরু হয় বাম-তাণ্ডব। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নেপথ্য সহযোগিতায় এবং রাজ্যপালের প্রত্যক্ষ যোগসাজসে নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেছে— এই অভিযোগ তুলে সিপিআই এমের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট তাণ্ডব শুরু করে। ২২ নভেম্বর থেকে টানা ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হয়। আহত হন অর্ধশতাধিক। গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় আড়াই হাজার মানুষকে, যাদের মধ্যে ছিলেন যুক্তফ্রন্টের বহু নেতা।

২৯ নভেম্বর ফের বিধানসভা অধিবেশন বসলে তৎকালীন স্পিকার বিজয় ব্যানার্জি প্রফুল্ল ঘোষের সরকারকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিধানসভা মুলতুবি ঘোষণা করেন। আরও বিধায়ক ও নেতাদের গ্রেপ্তারি চলতেই থাকে। ফের বিধানসভার অধিবেশন বসে ২৯ নভেম্বর। কিন্তু স্পিকার পুনরায় অধিবেশন মুলতুবি করে দেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। রাজ্যপাল তখনও বিধানসভায় উপস্থিত উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্য। এরই মধ্যে বিধানসভা কক্ষে শুরু হয়ে যায় চরম বিশৃঙ্খলা। বিধানসভায় বাতাসা ভোগের মতো পড়তে থাকে পচা ডিম, পচা টমেটো। তৈরি হয়েই এসেছিল বামেরা। সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ঢেলে দেওয়া হয় দোয়াতভর্তি কালি। এমনকী রাজ্যপালও চরম আক্রমণের শিকার হতে হতে বেঁচে যান তাঁর সুরক্ষাবলয় কর্মীদের তৎপরতায়।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বিধানসভা ভবনের মধ্যে এতবড় তাণ্ডবের ঘটনা এটাই প্রথম।

এই পরিস্থিতিতে প্রফুল্ল ঘোষ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন। রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। সেটিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক কারণে ঘোষিত প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন। মোট ৩৭০ দিন রাষ্ট্রপতির শাসন চলার পর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষিত হয়। ফের যুক্তফ্রন্টই জয়লাভ করে। মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সেসব মেটার পরও সিপিএমের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্র রাজ্যের নয়া সরকারের নীতি অনুযায়ী কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে বাধা উঠছিল যুক্তফ্রন্টের অন্দরমহল থেকেই। এমনকী 'আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন' এই অভিযোগ তুলে যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিই অনশন শুরু করেন কার্জন পার্কে।

আসলে সমস্যাটা তৈরি হয়েছিল ভূমি সংস্কার আন্দোলন ঘিরে। সিপিএমের উগ্র জোতদার ও জমিদার বিরোধী ভূমিসংস্কার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে রাজ্যে চলছিল অবাধে জমি দখল, লুঠপাট, খুনোখুনি। সিপিআই এমের অভিযোগ ছিল, এসবই গোয়বলসীয় প্রচার অথবা কংগ্রেসেরই চক্রান্ত। ঘটনা যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৭০-এর ১৬ মার্চ অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করেন। জ্যোতি বসু লিখে গেছেন, সিপিআই এম একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এখানেই কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করেছিল। জ্যোতি বসুর ভাষায়— 'রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান ওঁদের (সিপিএম বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধীন কিছু দলীয় নেতা) মত অনুযায়ী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেন ১৯৭০ সালের ২৯ মার্চ। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর নির্দেশে বিধানসভা ভাঙা এবং মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করলেন না। পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে ঘৃণ্য উপায়ে ১৩ মাস শাসনকালেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও পতন ঘটানো হলো।[৩]

এরপর রাজ্যে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে থাকে। আরও একবার অজয় মুখার্জি নির্বাচনে হেরে গিয়েও কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের (এমনকী বামপন্থী দলেরও) সম্মতি নিয়ে সরকার গঠন করেন। চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গের তদারকি মন্ত্রীর দায়িত্ব দিলেন। ওদিকে রাজ্যে তখনও অবাধে চলছে বিশৃঙ্খলা। তখনও জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের দিকেই আঙুল তুলেছিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠিতে লিখেছিলেন '.... এই অকথ্য ষড়যন্ত্রের বিষয়টি গুরুতরভাবে ও অবিলম্বে বিবেচনার জন্য এবং এমনকী কংগ্রেসের বিরোধী পার্টির বিরুদ্ধেও কিছু করতে হলে কিছুটা গণতান্ত্রিক ও ভদ্র পদ্ধতিতে তা করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।'[৪] যদিও তাতে কোনো ফল মেলেনি। বরং ২৫ জুন গভীর রাতে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। অর্থাৎ ১৯৬৭-১৯৭০-এর মধ্যে তিনবার। আর ১৯৭২-এর ১১ মার্চ পুনর্নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১১ দফা দাবি পেশ করেও ভোটে হেরেছে সিপিআই এম। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। আর এই পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকাকেই উদাহরণযোগ্য করে তুলে গোটা ভারতবর্ষে মূলত কেন্দ্রের শাসক দলের বিরোধী দলগুলির পরিচালিত সরকারগুলি বারেবারে দাবি তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার সুষম বণ্টন ও সুসম্পর্কের বিন্যাস গড়ে তোলার। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে এবং নিঃসন্দেহে সেই প্রশ্ন উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই, একদা বামফ্রন্টের লাল ঝান্ডার জৌলুষে। অধুনা মা-মাটি-মানুষের অতি নাটকীয় তৃণমূলের দৌলতে।

যুক্তরাষ্ট্র বনাম এককেন্দ্রিক সরকার

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা মানে জাতীয় সরকারের প্রাধান্যের

পরিবর্তে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্থাপন। এই সংবিধান মতেই গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। সংবিধান মেনেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকার বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরে কোনো আইন গঠন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হলে এগোতে হয় সংবিধান সংশোধনের পথেই। অর্থাৎ যেখানে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রাধান্য থাকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের, আঞ্চলিক সরকারগুলি যেখানে কেন্দ্রের হাতের কাঠপুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্য এবং কেন্দ্রের দু'পক্ষেরই অবস্থান তাকে প্রায় সমশক্তির অবস্থায়। মডার্ন কন্সটিটিউশন-এর লেখক কে সি হোয়ার বলেছেন, "In Federal Constitution, the powers of Governments are divided between a Government for the whole country and Governments for parts of the country in such a way that each Government is legally independent within the sphere." সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন, "By the federal principle, I seen the method of dividing powers so that general and regional Governments are each within a sphere, coordinate and independent. [৫]

তার মানে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এবং আপন রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা— এই দুই মনোভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাইসি তাই স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র হলো জাতীয় ঐক্য শক্তির সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সমন্বয় সাধনের রাষ্ট্রনৈতিক উপায়।'

ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় ঠিক এই একটি কাজকে ঘিরে। তা হলো সমন্বয়সাধন। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বা রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক সমন্বয় সাধন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি রীতিমতো ভয়াবহ। তার কারণ, পশ্চিমবঙ্গই হলো সেই রাজ্য যেখানে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা শাসকদল বিরোধী রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরেই সরকারে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক তথ্যই বলে— যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় যখন কেন্দ্র এবং রাজ্য একই শাসক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন এই সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় না। সমস্যা হয় তখনই যখন বিরোধী পক্ষ রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়। তখনই কারণে বা অকারণে উঠে আসে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বৈরিতা বা দ্বন্দ্ব।

আগেই বলেছি, ভারতবর্ষে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের এই দ্বন্দ্ব প্রথম শুরু হয় কেরলে বাম জমানায়, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে। তারপরেও বহুবার কেরলে ক্ষমতায় এসেছে বামেরা। কখনো কখনো ক্ষমতা দখল করেছে কংগ্রেস। কখনও বা বাম কোয়ালিশন বা কংগ্রেস কোয়ালিশন। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে যখন কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দল রাজ্যে সরকার স্থাপন করেছে।

পরবর্তীকালে মূলত ১৯৭৭ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গই হয়ে ওঠে এই দ্বন্দ্বের উৎসভূমি। মূল কারণ, এরাজ্যে ওই সময় থেকে বামেরা হয়ে ওঠে চরম রাজনৈতিক বাহুবলী এবং প্রায় বছর নানা ছোটবড় ইস্যুতে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা ছিল এরাজ্যের নিত্য নিয়মিত ঘটনা।

১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দিল্লির যে সম্পর্কের অধঃপতন ঘটে, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট বিশাল শক্তি নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা পাবার পর সেই সম্পর্ক এসে ঠেকে তলানিতে। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল মধুর। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেই মাধুর্য কোনো প্রতিবিধানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি। এমনকী কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় একসময় এই বাঙ্গলার রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব পাহাড় প্রমাণ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করলেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কের কোনো উন্নয়ন সাধন করতে পারেননি। সবসময় একটা বিষয় রাজ্যের তরফে অভিযোগ উঠে এসেছে, রাজ্যের কাজে অকারণে হস্তক্ষেপ এবং এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করার।

জ্যোতি বসুদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে যখন রাজশক্তিগুলি একত্রিত হয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার চেষ্টা করেছে তখন কেন্দ্রের বদান্যতায় এবং কৌশলে এরাজ্যে সেই বাম প্রগতিশীল আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শারীরিক অত্যাচারই শুধু নয়, রাজ্যের পুলিশকে বসিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে নির্বাচনকে এরাজ্যে প্রহসনে পরিণত করে অবাধে রিগিং করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে কংগ্রেস। এমতাবস্থায় ১৯৭৪ সালের মে মাসে বিশ লক্ষ রেল শ্রমিক ও কর্মচারীর লাগাতার ধর্মঘটের শরিক হয় সিপিএম এবং অন্যান্য বাম শক্তিগুলি। এর ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈরিতাই দৃঢ় হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের জারি করা জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থা জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের সর্বত্রই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের চেষ্টা করেছিল। তবে নিঃসন্দেহে এর দীর্ঘমেয়াদি ফল ভালো নয়, এই ভেবেই অসুবিধায় পড়েছিল বিরোধী শক্তিগুলি। তারা গোটা দেশে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে এবং শেষপর্যন্ত সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশজুড়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তোলপাড়। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসেই ভারতীয় লোকদল, সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং জনসঙ্ঘ ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেস-ইর বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করে (ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তখন ইন্দিরা কংগ্রেস বা কংগ্রেস-ই নামেই পরিচিত ছিল)। এই নির্বাচনে সম্মিলিত জনতা দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসে। এরাজ্যের বামপন্থী দলগুলিও অভাবনীয় সাফল্য পায় এবং কেন্দ্রের জনতা দল সরকারের পাশে দাঁড়ায়। এই সময়ে কিন্তু তেমনভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে কোনো বৈরিতার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কারণ, কেন্দ্র এবং রাজ্য তুলাদণ্ডের মাপকাঠিতে একই রাজনৈতিক অবস্থানে অবস্থান করছিল। জনতা দল সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার এরাজ্যে রীতিমতো শিকড় গেড়ে বসে এবং টানা ৩৪ বছরের বেশি সময় ৰাজ্যের

OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT COORDINATOR
(DISTRICT EDUCATION OFFICE)
SAMAGRA SHIKSHA ABHIYAN
DHALAI DISTRICT

****

PRESENT STATUS OF LEARNING OUTCOME (NATUN DISHA)

Name of District	Class	Total	Language				Mathematics			
			Class Appropriate		Prerana & Sadhana		Class Appropriate		Prerana & Sadhana	
			Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Dhalai	III	6694	4729	70.65	1965	29.35	4656	69.55	2038	30.45
	IV	7377	5469	74.14	1831	24.82	5209	70.61	2091	28.34
	V	6969	5581	80.08	1388	19.92	5150	73.90	1819	26.10
	VI	6517	5260	80.71	1257	19.29	4947	75.91	1570	24.09
	VII	6102	5216	85.48	886	14.52	4884	80.04	1218	19.96
	VIII	6298	5590	88.76	708	11.24	5275	83.76	1023	16.24

CONSOLIDATED PROGRESS REPORT UNDER SAMAGRA, DHALAI DISTRICT

SL.	INTERVENTIONS	TARGET (Physical)	ACHIEVEMENT (Up to 31st July, 2021)
1	Free Text Books	57649	57649
2	Uniform	56447	56447
3	Teacher Training (in service)	6596	6596
4	Inclusive Education	409	409
5	Status of Teachers	1195	1195
6	Status of Students	70506	
7	School Management Committee/PRI Training	4956	996
8	Special Training for Out of School Children	109	109
INFRASTRUCTURE			
9	Total School	821 (Govt.)	
10	Block Resource Centre	8	
11	Cluster Resource Centre	50	
12	Primary Schools	489	
13	Upper Primary Schools	235	
14	High Schools	64	
15	Higher Secondary Schools	33	
16	Residential Hostel	4	
17	KGBV(Type-1 & Type- 4)	6	
18	Girls' Hostel	3	
19	Residential Special Training Centre	6	

ক্ষমতায় আসীন থাকে। জ্যোতি বসু সম্মানিত হন ভারতবর্ষের প্রথম দীর্ঘস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, এবং সেটাই এরাজ্যের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ১৯৮০ সালে কংগ্রেস সরকার ফিরে আসার পর আবার কোন্দল শুরু হয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় একটা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৩ সালের ৯ জুন গঠিত হয় সারকারিয়া কমিশন।

কমিশন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই বিবেচিত হচ্ছিল। কারণ, বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলেন, কেন্দ্র যেন একটি সূর্য আর রাজ্যগুলি তার গ্রহ। ঠিক এই মনোভাবের জন্যই বলা হয় ভারতের শাসনতন্ত্র অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। রাজ্য যেন প্রজা। কেন্দ্র যেন রাজা। এটা কিন্তু ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারেরই বহমানতা, যদিও অভিযোগ হলো, স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রের আধিপত্য নানাভাবে জোরদার হয়, বিশেষ করে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ মূলত চার ভাগে বিভক্ত। রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, রাজস্ব নীতি ও অর্থনৈতিক। এই বিকেন্দ্রীকরণ নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন, বিকেন্দ্রীকরণের একটি কার্যকারিতা যুক্তি আছে— যেমন পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের ব্যবস্থাটির বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভালোভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করা যায়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণ ভালো ফলাফল করে। তাতে সম্পদের ব্যবহার অনেক কার্যকর হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, বিকেন্দ্রীকরণ শুধু কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যেই নয়, প্রয়োজন রাজ্যের ভিতরেও, কারণ সেখানেই শাসন ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের গুরুত্ব।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক রিপোর্টটির দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পরিচালনার প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, অনেক সময়েই সপ্তম তপশিলে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষযগুলিতে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়ার আগে কেন্দ্র রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করেনি। দ্বিতীয়ত, আন্তঃরাজ্য পরিষদ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। তৃতীয়ত, রাজস্ব ছাড়া কেন্দ্র রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার বহির্ভূত অবশিষ্ট বিষয়গুলির অধিকার রাজ্যের হাতে দেওয়াই ভালো। চতুর্থত, বিধানসভায় অনুমোদিত বিল রাষ্ট্রপতি বিবেচনার জন্য কতদিন আটকে রাখবেন তার সময়সীমা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। পঞ্চমত, রাজ্যপালের নিয়োগ এবং অপসারণ হোক রাজনীতিমুক্ত। ষষ্ঠত, সংবিধানের ৩৫৬ ধারার প্রয়োগে রাজ্যপালের যথেচ্ছাচার সম্বন্ধে সতর্কতা দরকার। সপ্তমত, যোজনা কমিশনে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। অষ্টমত, রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে সদস্যকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে। নবমত, সর্বভারতীয় পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যের গুরুত্ব বাড়ানো প্রয়োজন। রাজস্ব ও ব্যায়ের বিভাজন সূত্রে ভারসাম্যের অভাব। দিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'গড়পড়তা হিসেবে রাজ্যগুলি মোট রাজস্বের ৩৪ শতাংশ আদায় করে এবং খরচ করে মোট ব্যয়ের ৫৮ শতাংশ। রাজ্যগুলির মোট ব্যয়ের ১৫ শতাংশ যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকল্পে। সুতরাং রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে ৫৮ শতাংশেরও কম। তার উপর প্রতি বছরেই কেন্দ্র নির্দেশিত প্রকল্পে রাজ্যের দায়ভার ক্রমশ বাড়ছে। এর পাশাপাশি রাজ্যগুলির নিজস্ব রাজস্ব থেকে চলতি খরচ সংস্থানের সামর্থ সীমিত এবং সঙ্কুচিত হচ্ছে। রাজ্যগুলির মূলধনী আয় বাড়ানোর সুযোগও কম। যোজনা এবং যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পার্থক্যটি অবিলম্বে মুছে দেওয়া দরকার।'

সারকারিয়া কমিশন

কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে সাংবিধানিকভাবে রয়েছে তিনটি তালিকা। (১) কেন্দ্রীয় তালিকা (২) রাজ্য তালিকা (৩) যুগ্ম তালিকা। এই তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলি তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ার বলে মনে করে। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি কেন্দ্র ও রাজ্য যুগ্মভাবেই ভোগ করে। হিসেব মতো রাজ্যগুলি যেমন কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজকর্মে মাথা গলাবে না কেন্দ্রীয় নির্দেশ ব্যতিরেকে, তেমনি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত আইনশৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে নাক গলাবে না কেন্দ্র রাজ্যের অনুমতি ব্যতিরেকে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের অবনতির পথে এই এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাগুলির সীমা নির্ধারণ নিয়েই বাধে বিতর্ক। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে যে রাজ্যপাল পদে কেন্দ্রীয় শাসক দলের প্রতিনিধিদের বসিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকারের অনুশাসনভুক্ত এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

বিচারপতি আর কে সারকারিয়ার নেতৃত্বাধীন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখে সুপারিশ করার। পাঁচ বছরের মধ্যে সুপারিশ পেশ করা হয়, কিন্তু তখন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট নেতৃত্ব জানায়, ওই রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁদের অনেক বক্তব্য আছে। রিপোর্টে কমিশন মোট ২৪৭টি সুপারিশ করেছিল। ১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত এই রিপোর্টে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েইছল বিধানসভার ক্ষমতা, রাজ্যপালের ভূমিকা এবং সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ-অপ্রয়োগ প্রসঙ্গে।

রাজ্যপাল নিয়োগ প্রসঙ্গে কমিশনের মূল সুপারিশগুলি ছিল—

১) রাজ্যের বাইরের অধিবাসী হবেন।

২) বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন।

৩)প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ থাকবে না।

৪) তিনি কোনো দলের প্রতি ঘনিষ্ঠ থাকবেন না।

৫) উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যপাল নিয়োগ করতে হবে।

৬) সংবিধানসম্মত ভাবে তাঁকে কাজের সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁর কাজের মেয়াদকাল পূর্ণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৭) রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে একজনকে বাছাই করতে হবে, অথবা রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তালিকা থেকে রাজ্যপাল নিযুক্ত হবে।

৮) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই রিপোর্টটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকটাই রাজ্য সরকারের সহায়ক। তবুও বামেদের উদ্যোগেই অকংগ্রেসি দল শাসিত চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের (পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু, অন্ধ্রের এন টি রামা রাও, ত্রিপুরার নৃপেন চক্রবর্তী এবং কর্ণাটকের রামকৃষ্ণ

Onis
Adding Light to Life
Lighting solutions

Onis - Lighting Solution provides you advanced LED technology that ensures minimal wastage of resources

All kind of lighting solutions available at Onis -
LED Bulb
LED Tube Light
LED Street Light
LED Flood Light
LED TrackLight
LED Garden Light
LED Inverter Bulb
LED Strip Light
LED T Bulb
LED Fan Light
Deep Junction Light / COB
Panel Light - Adjustable
Hanging Decorative Item

Why Onis

- Saves 80% of Electricity
- Uniform Optical & Reliable Design
- No UV light
- Brighter than your traditional lights
- No Hazardous solids, liquids or gases which can be harmful to the environment
- Onis LED don't attract bugs and insects

MAKE IN INDIA

For More Enquiries and Dealership details Contact us
Call or Whats App
+91-97524 48854 or +91-9893868490

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

With Best Compliments from :

Golden India

হেগড়ে) নিয়ে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন হয়। সেখানে আরও যাঁরা যোগ দেন তাঁরা হলেন, 'সি পি আই এম থেকে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, সি পি আইয়ের টি রাজেশ্বর রাও, জনতা পার্টির চন্দ্রশেখর, বিজু পট্টনায়েক, এইচ এন বহুগুণা, কংগ্রেস (স) নেতা শারদ পাওয়ার, অকালি দলের হরজাঁত সিং লাঙ্গোয়াল, জনবাদী পার্টির চন্দ্রজিৎ যাদব, জগজীবন রাম আর উদ্যোক্তা রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লা। সেখানে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। যদিও তার আগেই সি পি আই এম ১১ দফা দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেখানে মূল দাবি ছিল, অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা সম্প্রসারণ। কাশ্মীর সম্মেলনের প্রস্তাবেরও মূল বিষয়গুলি ছিল।

১) ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের আগে রাজ্যপাল আন্তঃরাজ্য পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

২) আর্থিক ব্যবস্থার অনেকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির সমপরিমাণ বা মূল্যানুপাতিক হারে অর্থ বণ্টন করা হোক।

৩) রাজ্যগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হোক।

১৯৮৪ সালে ফের কলকাতায় সম্মেলনে বসে। সেখানে সি পি আই, সি পি এম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, জনতা পার্টি, ডি এম কে, তেলুগু দেশম, ন্যাশনাল কনফারেন্স, ডি এম পি, ইউনাইটেড ফ্রন্ট, কংগ্রেস (ই) কংগ্রেস (এস), রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস, জনবাদী পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি (জে), শিরোমণি অকালি দল ও পিজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পাটি অংশ নেয়। হাজির ছিলেন জ্যোতি বসু, অশোক মিত্র, আই কে গুজরাল, চন্দ্র শেখর, শারদ পাওয়ার, বিজু পট্টনায়েক, জর্জ ফার্নান্ডেজ, মধু দণ্ডবতে, রামবিলাস পাশোয়ান, করুণানিধি, চন্দ্রজিৎ যাদব, তারকেশ্বরী সিনহা প্রমুখ। এই সম্মেলনে মূলত অর্থনৈতিক বণ্টন নিয়ে নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া বলা হয়, অ-কংগ্রেসি রাজ্য সরকারগুলিকে দুর্বল করার জন্য কেন্দ্র অবিরাম যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা বন্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া জনজীবনে দৈনন্দিন দ্রব্যসামগ্রীর গণবণ্টন ব্যবস্থাও কেন্দ্রকে জোরদার করতে হবে। আর্থিক স্বনির্ভরতার জাতীয় নীতি পুনঃস্থাপন করতে হবে। কৃষকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে। কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিজাত পণ্যের উপযুক্ত দাম দিতে হবে কৃষককে। ভূমি সংস্কারের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নাসা বা এসমা-র মতো জনবিরোধী আইনগুলি বাতিল করতে হবে।

এসব চলাকালীনই ১৯৮৩ সালে রাজ্যপাল বদল হয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনা না করেই। তার আগে পর্যন্ত রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডে, টি এন সিংদের নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু শর্মার সময় থেকে এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয় বাম সরকার।

একথা সত্য, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সারকারিয়া কমিশনের কোনো সুপারিশই কার্যকর করেনি। এমনকী বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত প্রস্তাবগুলিরও মান্যতা দেয়নি। ফলত, রাজ্যপাল শর্মাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। এক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত তালিকাকে গুরুত্ব দেননি। ১৯৮৪ সালে অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করেনি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল রাজ্যে উৎপাদিত চারটি প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চা ও পাটজাত দ্রব্যের ওপর রাজ্যের বিক্রয় কর বসানোর প্রস্তাব। কর বসানো বা না বসানোর অধিকার নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের অভিযোগ ছিল অনেক। কারণ, আর্থিক সমবণ্টন নীতি না থাকার ফলে রাজ্য সরকার চরম আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়। এ ধরনের অজস্র বৈষম্য নিয়ে এরাজ্য থেকেই অভিযোগ উঠেছে বারে বারে। কিন্তু অভিযোগের সমাধান হয়নি।

অন্যান্য রাজ্যের পরিস্থিতি

কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায় পড়েছে অন্যান্য রাজ্যও। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ না করে অপারেশ ব্লু-স্টার সংগঠিত করে কেন্দ্রকে অবস্থা সামাল দিতে হয়। তার পরিণতি হয় ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে মাত্র ৪৬ দিনের ব্যবধানে দুটি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটায় কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ, দুটি পতনই ছিল অসাংবিধানিক। প্রথম ফেলে দেওয়া হয় কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লা সরকারকে। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশের এন টি আর মন্ত্রীসভাকে। এই দুটি ঘটনাই সে সময় গোটা দেশে সমালোচনার ঝড় তুলে দিয়েছিল।

এরপরও সরকার ভাঙার খেলা শেষ হয়নি কংগ্রেস আমলে। ১৯৯২ সালে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দির-বাবরি মসজিদ ইস্যুতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধাঁচা ভাঙা পড়ার পর ১৪ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ ইস্তফা দেন। আর তার পরদিন ১৫ ডিসেম্বর রাতেই ভেঙে দেওয়া হয় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলিকে।

লক্ষণীয়, এসময় বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কোনো প্রতিবাদ করেনি বাম দলগুলি বা অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। বামেদের পক্ষ থেকে অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল, বিজেপি সরকারগুলি সাংবিধানিক বাধ্যতাকে লঙ্ঘন করেছিল।

অধুনা রাজনীতির ঘোলা জলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

বাম আমলের ৩৪ বছর ধরে কেন্দ্র বিরোধিতার ফলে আখেরে রাজ্যের কোনো লাভ হয়নি। বরং কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ায় রাজ্যের উন্নয়নই ব্যহত হয়েছে।

না, তার মানে এই নয় যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে না। সংবিধান বহির্ভূত কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। আবার এ দাবিও উঠবে যে, সব বিষয়েই যদি সংবিধান সংশোধিত হতে পারে, তাহলে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক সম্পর্কিত আইনই বা সংশোধন হবে না কেন? কেনই -বা সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেনি কংগ্রেসি সরকার? তাহলে কমিশন গঠন করাটা কি ছিল শুধু লোকদেখানো ভাঁওতা?

পাশাপাশি এটাও মানতে হবে, সব ক্ষেত্রে যে পশ্চিমবঙ্গের বা

অন্যান্য রাজ্যের দাবি এবং প্রতিবাদ সঠিক বা আইনানুগ ছিল তাও নয়। পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, রাজ্যপাল মুখ খুললেই রে-রে করে উঠত বামফ্রন্ট সরকার। ভাবখানা এমন ছিল যেন রাজ্যপাল একটি অসাংবিধানিক পদ। রাজ্যপাল পদটিকে অবাঞ্ছিত করে তোলার জন্যই অনেক সময় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হইচই হতো। যে রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত অসাংবিধানিক কাজকর্ম মেনে নিতেন, তাঁদের নিয়ে বাম সরকারের কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু যেখানেই রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করতেন বা কোনো বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ চাইতেন, সেখানেই গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন রাজ্যপাল খুবই কম পাওয়া গেছে, যাঁদের মনের মানুষ বলে বামফ্রন্ট সরকার আপন করে নিতে পেরেছে। বামফ্রন্ট পছন্দ করতেন টি এন সিংহের মতো নির্বিরোধী গান্ধীবাদী রাজ্যপালকে, যিনি সাত্ত্বিক জীবনযাপন নিয়ে বস্ত থাকতেন। সকালে রাতে ছাগলের দুধ খেতেন। তাঁর পোষ্য ছালগটি একবার রাজভবন থেকে হারিয়ে যাওয়ায় কলকাতা পুলিশকে বাম সরকার বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছেড়েছিল।

আর এখন?

কহতব্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার গঠনের আগে থেকেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে। শুরু গোপালকৃষ্ণ গান্ধী থেকে। তারপর এম কে নারায়ণন হয়ে কেশরীনাথ ত্রিপাঠী— রাজভবনের অধিকার নিয়ে বিতর্কের খামতি নেই। আর এখনকার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের রাজত্বে তো রাজ্য সরকার রীতিমতো 'বিদ্রোহী' হয়ে উঠেছে এবং একদা বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে— রাজ্যপাল পোষা আর হাতি পোষা খরচ একই এবং অপ্রয়োজনীয়। অতএব বাতিল হোক রাজ্যপাল পদটি। আর তার সঙ্গে মিশেছে সেই একই ঐতিহ্যময় বিষয়গুলি— আর্থিক সমবণ্টন নীতি, সরকার ফেলে দেবার চক্রান্ত, নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়ে বিজেপিকে সরকার গড়ার সুযোগ করে দেওয়ার মতো গতানুগতিক দাবিদাওয়া। কিন্তু এখনকার বিদ্রোহে নতুন যা যুক্ত হয়েছে তা হলো— রাজনৈতিক ঝগড়াকে কলতলার ঝগড়ায় পরিণত করা। মানে সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী থেকে অধঃস্তন মন্ত্রীরা পর্যন্ত যে ভাষায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করছেন, প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন, রাজ্যপালকে আক্রমণ করছেন, যেভাবে সরকারি ও সাংবিধানিক নিয়মকানুনকে তুচ্ছ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে 'দূর-ছাই' করে জঞ্জালের ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছেন, যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক নির্দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, তা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। যে রাজনীতির জন্ম হয়েছিল আদিগঙ্গার পাড়ে, বস্তির ধারে, সেই রাজনীতিই এচ্ই কলতলার রাজনীতির জন্মদাতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজ্যপালের প্রসঙ্গেই আসা যাক। শুরু গোপালকৃষ্ণ গান্ধী দিয়ে। তখনও তৃণমূল সরকার গড়েনি। বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন প্রশাসনিক প্রধান। তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আসুক। তাই দলের নির্দেশ উপেক্ষা করে ডেকে এনেছিলেন টাটা গোষ্ঠীকে। হুগলীর সিঙ্গুরে ন্যানো মোটরগাড়ির কারখানা খোলার জন্য। সাড়া পড়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। কারণ, সিঙ্গুর দ্রুত হাঁটছিল জামশেদপুরের টেলকো নগরী হয়ে ওঠার পথে। তৃণমূল কংগ্রেস বুঝেছিল, ওই ন্যানো কারখানাই হবে তাঁর রাজনীতির কফিনে শেষ পেরেক। কারখানা হলেই বামফ্রন্ট আরও ৩৫ বছর ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করবে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। অতএব শুরু হয়ে গেল রাজনীতি। কী? না পরিবর্তন চাই। কীসের পরিবর্তন? কারখানা হতে না দেওয়াটা নাকি পরিবর্তনের রাজনীতি! মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জাতীয় সড়কে ২৬ দিন ধরে শুয়ে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তুললেন 'নয়া তেভাগা আন্দোলন'। তেভাগা আন্দোলন? কেন? ইতিহাস না জেনেই নামকরণটা হয়েছিল। এবং অনেক কিছু না জেনে ওই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সুযোগ সন্ধানীরা এমনকী মাওবাদীরাও। (তাদের দু-চারজন এখন তৃণমূলের মন্ত্রী, এমপি, পুরসভার চেয়ারম্যান কিংবা দলীয় পত্রিকার সম্পাদক)। বিস্তারিত ইতিহাসে যাচ্ছি না। এমনকী যাচ্ছি না এরাজ্যের সেইসব বুদ্ধিজীবী কিংবা সংস্কৃতিজীবীদের ভূমিকাতেও, যাঁরা সুযোগরই সন্ধান করেছেন এবং আখের গুছিয়েছেন। একজন তো মন্ত্রীই হয়ে গেছেন। তাঁর কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা বা ছড়ায় সুর দেওয়া আর সেগুলি গেয়ে রেকর্ড করা।

যাই হোক, বিরক্ত টাটাগোষ্ঠী হাত ধুয়ে ফেলার আগে তখনকার রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ ইতিবাচক। তিনিও চেয়েছিলেন, তৃণমূলের প্রতিবাদটা শোনা হোক, কারখানাটাও হোক। বারবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখোমুখি বসিয়ে সমস্যার সমাধান করতে। বুদ্ধদেববাবু ছুটে গেছেন রাজভবনে কিন্তু মমতা যাননি। যখন একা গেছেন তখন জানিয়ে এসেছেন— মা, মাটি মানুষকে বামফ্রন্ট ঠকাচ্ছে। ওখানে কারখানা হতে দেব না। কারখানা হয়নি। টাটারা হাত ধুয়ে ফেলেছেন ১৪ হাজার কোটি টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে। তারপর আদালতের নির্দেশে ওই কারখানা মাইন দিয়ে ফাটিয়ে ভেঙে মাঠ করে সর্ষে বীজ ছড়ানো হয়েছে। তাতে ন্যানো যেমন হয়নি, তেমনই সর্ষেও হয়নি। ন্যানো এখন গুজরাটের মানন্দায় ফসল দিচ্ছে। যে অটো হাব সিঙ্গুরে হতে পারতো, তা হয়েছে গুজরাটে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, এখনকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চেষ্টায়। সে অন্য গল্প।

সিঙ্গুর আন্দোলন এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন— দুটো শিল্পবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। আর হুংকার শুরু হয়ে গেল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। সেই বামফ্রন্টেরই ট্র্যাডিশন। অভিযোগ— কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলেই গেলেন, একসময় তিনিই বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন। তাতে কী হয়েছে? এখন তো রেলমন্ত্রী নই! ক্ষীর খেয়েছি বলে প্রতিবাদ করব না? কিসের প্রতিবাদ? বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ২৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ কেন্দ্র মকুব করছে না। এটা নাকি সাংবিধানিক দাবি। এই নিয়ে শুরু। এবার রাজ্যপাল হয়ে এলেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। পণ্ডিত এবং শান্ত মেজাজের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁকেও পছন্দ হলো না। কন্সটিটিউশনাল ডিসক্রিশন নিয়ে নবান্নে প্রতিদিন তোলপাড়। সব সহ্য করেই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাটিয়ে গেছেন কেশরীনাথজী। একেবারে বিদায়বেলায় তিনি বলতে বাধ্য হলেন প্রকাশ্য সাক্ষাৎকারে— 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোষণের

রাজনীতি করছেন। নষ্ট হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।... আমার মনে হয়, বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক নাগরিককেই তাঁর সমানভাবে দেখা উচিত।'

যেই না বলা, শুরু হয়ে গেল তরজা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'উনি কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব এবং রাজ্যের ব্যর্থ শিল্পমন্ত্রী এবং বর্তমানে শিল্পামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'রাজভবন যে বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে উঠেছে একথা তিনি যাবার সময় প্রমাণ করে গেলেন।'

বিরোধী দলের সরকার। কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যপালকে একথা বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা তো ঘটনা, সাংবিধানিকভাবেই রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান। তিনি এককভাবে কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যেমন সত্য, তেমনই সত্যি, রাজ্যের সমস্ত তথ্য জানার অধিকার তাঁর আছে। আইন মেনেই তাঁকে প্রতি মাসে রাজ্য সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে হয় কেন্দ্রের কাছে। আবার তাঁর সই ছাড়া কোনো বিলই আইনে পরিণত হবার স্বীকৃতি পায় না। রাজ্যপাল মনে করলে যে কোনো বিলের ওপর রাষ্ট্রপতির মতামত চাইতে পারেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা যে কোনো মন্ত্রী ও প্রশাসনিক প্রধানদের ডেকে পাঠাতে পারেন। যে কোনো বিষয়ে রিপোর্ট চাইতে পারেন। যে কোনো আইনগত ও প্রশাসনিক বিষয়ে সরকার তাঁকে জানাতে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ হয়তো দিতে পারেন না, কিন্তু পরামর্শ দেবার অধিকার তাঁর আছে সাংবিধানিক ভাবেই।

মুশকিল হচ্ছে, তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, সংবিধান সংবিধানের জায়গায় থাকুক। পশ্চিমবঙ্গে তিনিই সংবিধান। তাই রাজ্যপাল ডেকে পাঠালেই যেতে হবে— এটা তিনি মানেন না। রাজ্যপাল কোনো রিপোর্ট চাইলেই দিতে হবে এটা তিনি মানেন না। রাজ্যপালের পরামর্শ কানে তুলতেই হবে এটা তিনি মানেন না। প্রশাসনিক অফিসারদেরও তিনি বারণ করে দেন— রাজ্যপাল দেখা করতে চাইলেও আমার না জানিয়ে যাবেন না।

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী আসানসোলে গোষ্ঠী সংঘর্ষের পর সেখানে পরিদর্শনে যেতে চেয়েছিলেন। সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে, এই ভয়ে আর উনি গেলে গণ্ডগোল বাড়বে এই অভিযোগে তাঁকে আটকে দিয়েছিলেন। যদিও পরদিন তিনি জোর করেই গিয়েছিলেন এবং শেষমেশ বলেই গিয়েছিলেন 'মমতা তোষণের রাজনীতি করছেন।'

কেশরনাথ ত্রিপাঠী পর্যন্ত তবু একরকম ছিল। নরমে গরমে চলছিল সরকার এবং রাজভবন। কিন্তু যেদিন থেকে নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় রাজভবনে পা রেখেছেন, সেদিন থেকে মমতা বনাম ধনকড়, কেন্দ্র বনাম রাজ্য সম্পর্ক এক নতুন রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। এ রাজনীতিটা আসলে বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, তোলাবাজি, অকর্মণ্যতা, আত্মপ্রচার, মিথ্যার ফুলঝুরি এবং নিজস্ব ব্যর্থতা ঢাকার রাজনীতি এবং এ রাজ্যে নিত্য নব রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্মদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ওই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য যে সব সময় তির উঁচিয়ে রয়েছেন কেন্দ্রের দিকে তা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না মানুষের। একমাত্র তাঁর পদলেহনকারী সংবাদমাধ্যম এবং শাসক দলের লেজুড় হয়ে ঝুলে থাকা কিছু আত্মনির্ভরহীন মানসিকতার মানুষ ছাড়া।

নতুন রাজ্যপাল ধনকড়ের সঙ্গে ঝগড়ার সূত্রপাত হলো যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র যোগদানকে ঘিরে। ওইদিন মাওবাদী কিছু ছাত্র-ছাত্রী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বাবুল সুপ্রিয়র ওপর হামলা করে। একই দিনে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পলকেও আক্রমণ করে ছাত্ররা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাষায়। তাঁর শাড়ি ধরে টান মারা হয়। বাবুল সুপ্রিয়র চুলের মুঠি ধরে টান মারা হয়। পরবর্তীকালে ছবি-সহ প্রমাণিত হয় ওই ছাত্ররা সবই বহিরাগত এবং মাতাল।

প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করেন ফোনে। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেননি। কলকাতা পুলিশকে ফোন করেন রাজ্যপাল। তারাও সাড়া দেয়নি। শেষপর্যন্ত রাজ্যপাল নিজেই নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে চলে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাবুল সুপ্রিয় ও অগ্নিমিত্রা পলকে উদ্ধার করে আনেন। এতেই গোঁসা হয় মুখ্যমন্ত্রীর। সরাসরি প্রশ্ন তোলেন— এটা কি রাজ্যপালের কাজ?

সবাই জানে, এটা রাজ্যপালের কাজ নয়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য— এঁরা কেউই যদি নিজের কাজটি না করেন, তাহলে তা কাউকে না কাউকে করতেই হয়। রাজ্যপাল নিজেই সে কাজ করে দিয়েছেন এবং একটি বিশাল রক্তপাতের ঘটনার লজ্জা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেছেন। মমতার উচিত ছিল রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দেওয়া।

তারপর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। রাজ্য সরকারের রিপোর্ট তলব করেন। রাজ্যপাল যত কঠোর হয়েছেন, রাজ্য সরকার ততই নির্লজ্জ হয়েছে। এমনকী শাসক দলের সদ্যোজাত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরাও রাজ্যপালকে নিয়ে সমানে কটূক্তি করে চলেছেন। রেশনে দুর্নীতি হলে রাজ্যপাল বলতে পারবেন না। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই বললে রাজ্যপালকে গালাগাল দেওয়া হবে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ বললে রাজ্যপালের সমালোচনা হবে। রাজ্যপাল যদি বলেন, রাস্তায় নেমে গোল গোল দাগ না কেটে মাইকিং করে প্রচারে না নেমে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলুন— তাতেও দোষ হয় রাজ্যপালের। মুখ্যসচিব বা অন্যান্য অফিসারদের বারণ করে দেওয়া হয় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। রাজ্যপাল একের পর এক চিঠি পাঠান রাজ্য সরকারকে রাজ্য উত্তর দেয় না। এবং শেষপর্যন্ত রাজ্যের পরিস্থিতি এবং রাজ্য সরকারের মনোভাব মানুষের কাছে স্পষ্ট করার জন্য রাজ্যপাল সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নেন। নিতে বাধ্য হন এবং তারপরেই ওই খালপাড়ের কলতলার খণ্ডচিত্র উঠে আসে মমতার ট্যুইটে।

রাজ্যে আক্রমণের অভিমুখ যখন রাজ্যপাল, কেন্দ্রে তখন মমতার টার্গেট মোদীজী আর অমিত শাহ। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি সামলাতে ১০০ শতাংশ ব্যর্থ রাজ্য সরকার তা প্রতিদিন প্রমাণিত হয়েছে। তার উপর রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রকে গালাগাল। প্রথমদিকে রাত-দিন চিৎকার শুরু করল, কেন্দ্র ট্রেন দিচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকরা পথেঘাটে মারা যাচ্ছেন। যখন কেন্দ্র ট্রেন দিল,

"মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গো-ধন প্রকল্প"

অধিক দুগ্ধ উৎপাদন - অধিক আয় - আত্মনির্ভর ত্রিপুরা।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্যের আটটি জেলায় "মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গো-ধন প্রকল্প" রূপায়নের কাজ শুরু করেছে এবং এই প্রকল্প ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ অবধি চলবে"।

➤ এই প্রকল্পে আপনার প্রিয় ডাকে আসা গাভী ও দামড়ীকে উন্নত প্রজাতির অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের বংশগত বৈশিষ্ট্য যুক্ত লিঙ্গ নির্ধারিত হিমায়িত বীর্য দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন বা ডাক ধরানো হচ্ছে।

➤ লিঙ্গ নির্ধারিত হিমায়িত বীর্য দ্বারা ডাক ধরালে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষম শুধুমাত্র স্ত্রী বাছুর (ডেকী বাছুর) জন্ম নেবে (স্ত্রী বাছুর জন্মানোর হার ৯০ শতাংশ বা তার বেশী)।

➤ এতে রাজ্যে উন্নত প্রজাতির অধিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভী ও দামড়ীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যে দুধের উৎপাদন বাড়বে ।

➤ রাজ্য সরকার গোপালকদের আর্থিক বোঝা লাঘবের উদ্দেশ্যে বীর্যের মূল্য মাত্র ১৫টাকা ধার্য্য করেছে। এই প্রকল্পে প্রতি ডোজ লিঙ্গ নির্ধারিত হিমায়িত বীর্যের জন্য সরকারী ভুর্তকীর পরিমান ৫০৪ টাকা ।

" বহু আকাঙ্খিত অধিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষম উন্নত প্রজাতির গাভী
এখন আপনার হাতের নাগালে "

আপনার গাভী ও দামড়ী ডাকে আসলেই লিঙ্গ নির্ধারিত বীর্য দ্বারা ডাক ধরানোর উদ্যোগ গ্রহন করুন।

এরজন্য নিকটবর্তী প্রাণী চিকিৎসালয়/গো-প্রজনন কেন্দ্র বা ভ্রাম্যমান গো-প্রজনন কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ত্রিপুরা প্রাণী উন্নয়ন সংস্থা দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।

তখন পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনো তালিকা রাজ্য সরকার দিতে পারল না। দেবে কোথা থেকে? কোনো তালিকাই তো নেই। যখন পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন্দ্রের দেওয়া ট্রেনে উঠে দেশে ফিরতে শুরু করল, তখন মমতা চিৎকার শুরু করে দিলেন, রাজ্যে করোনা ছড়াতে কেন্দ্র পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় পাঠাচ্ছে।

একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীজী যখন করোনা নিয়ে সতর্কতার কথা বলতে শুরু করেছেন তখন মমতা বললেন, আর্থিক ব্যর্থতা ডাকতে মোদী করোনার ভয় দেখাচ্ছেন। আর যখন করোনা সত্যি সত্যিই ছড়িয়ে গেল, মমতা বললেন, কেন্দ্রের ভুল নীতির জন্যই করোনা ছড়িয়েছে।

বাস্তবিক, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে বামেদের আমলে তবু একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে এগিয়েছিল বাগবিতণ্ডা। কিন্তু এখন হবু রাজা গবু মন্ত্রীর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলাটাই শৃঙ্খলা। যুক্তি নেই, সত্য নেই, সভ্যতা নেই, শালীনতা নেই, সংস্কৃতি নেই, মূল্যবোধ নেই। আছে শুধু মিথ্যা ভাষণ, বড় বড় বুলি, উপদেশ, সরকারি অর্থের অপচয় করে ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন প্রচার করে মিডিয়াকে কিনে রাখার অপচেষ্টা। এরপর হয়তো কোনো দিন দেখা যাবে, প্রচার চলছে — 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যে করোনার সংক্রমণ সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করল।'

কেন্দ্রের অন্যায় থাকলে রাজ্য প্রতিবাদ করবে— এটাই নিয়ম। কিন্তু মমতা রাজ্যে সবই উল্টো। এখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হয় রাজ্যের নামে। যেমন 'স্বচ্ছভারত অভিযান প্রকল্প' হয়ে যায় 'মিশন নির্মল বাংলা'। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনা' হয়ে যায় 'বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা'। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' হয়ে যায় 'বাংলার গৃহ প্রকল্প' ইত্যাদি। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নেওয়া বা জানানোর ন্যূনতম ভদ্রতাও রাজ্য দেখায় না। এও বাহ্য, কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত-এর মতো জনপ্রিয় স্বাস্থ্য প্রকল্প রাজ্য সরকার গ্রহণই করল না। ক্ষতি হলো ৬০ লক্ষ গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত রাজ্যবাসীর। কৃষকদের জন্য কৃষিঋণ প্রকল্পও বাতিল করে দিয়েছিল এ রাজ্য। প্রতিটি চাষি কেন্দ্রের ওই প্রকল্পে বছরে ৬ হাজার টাকা কৃষিঋণ ঠিক সময়ে পেতে পারত।

এর নাম কেন্দ্র বিরোধিতা কিনা জানা নেই। তবে এর নাম যে 'পাগলা দাসুর নাটক' তা অনায়াসে বলা যায়।

অথচ যখনই টাকার প্রয়োজন হয়, তখন হাত পাততে দ্বিধা করে না রাজ্য। ২০২০ সালে পরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং করোনায় বিপর্যস্ত রাজ্যের মানুষ যখন প্রাণ বাঁচাতে নাজেহাল তখনও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ভোলেননি রাজ্যের জেলায় জেলায় ক্লাবগুলিকে কিনে নিতে ১৩০০ কোটি টাকা দান খয়রাতি করতে। কারণ, ২০২১ সালে ভোটে ওইসব ক্লাবের সদস্যরাই দলকে ভোট পাইতে দিতে রিগিংয়ে সাহায্য করবে। অথচ প্রতিদিন বিকেলে নবান্নয় বসে চোখের জল ফেলবেন, কখনো আঙুল বাঁকাবেন— কেন্দ্র কিছু সাহায্য করছে না বলে। আর যখনই কেন্দ্র টাকা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে পালটে যাবে মুখের চেহারা। একবারও বলবেন না, কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ।

তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ২০১১ সালে সম্পূর্ণ নেতিবাচক ভোটে। এই ভোট ছিল বামবিরোধী ভোট। একটি ভোটও সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে ইতিবাচক ভোট ছিল না। যদি বাম সরকার তার ৩৫ বছরের শাসনকালে অন্তত ১৫টা বছরও মানুষের কল্যাণে সরকারটাকে কাজে লাগাতো তাহলে রাজ্যের মানুষকে আজ এই যন্ত্রণাদায়ক জীবন কাটাতে হতো না। এখন এ রাজ্যে কন্যাশ্রী মেয়ে নতুন সাইকেল পেয়েও হাসতে পারে না, কারণ সে জানে, বাড়ি গিয়ে তার মুখে উঠবে না দু-মুঠো ভাত। রূপশ্রী প্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা পেয়েও মেয়ে জানে, বিয়েতে ওই টাকাটা খরচ হবে না। খরচ হবে বাবার বন্ধক রাখা জমিটা ছাড়াতে। বিষ মদ খেয়ে মৃত বাবার ক্ষতিপূরণে দু-লক্ষ টাকার চেক হাতে পেলেও ছেলে জানে আগামীকালই পার্টির দাদারা এসে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যাবে নজরানা হিসেবে।

একদিকে যখন পরিস্থিতিটা এমনই, অন্যদিকে তখনই পাড়ার অমুক সঙ্ঘ, তমুক সঙ্ঘ পরিকল্পনা শুরু করে এবার বছরের প্রাপ্য দু'লক্ষ টাকা এসে পিকনিকটা কতখানি জমানো যাবে কিংবা এবারের শিবরাত্রির পুজোটা কেমন করে চমকে দেওয়া যাবে পাড়ার সুন্দরীদের।

তবু অর্থানুকূল্যের অভিযোগটা কেন্দ্রের ওপর চাপাবেই রাজ্য। করোনা হলো, দায়ী কেন্দ্র। রাজ্যে রেশনে দুর্নীতি হলেও দায়ী কেন্দ্র। তবু মোদীজীর কপাল ভালো— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কষ্ট করে চেপে গেছেন। বলেননি— আমফানের জন্যও দায়ী কেন্দ্র।

উপসংহার

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি প্লিজ ভাববেন না, এত কথা বলছি আপনার বা আপনার দলের প্রতি কোনো জাতক্রোধ থেকে। না, একেবারেই নয়। কারণ, আপনি বা আপনার দল এমন কোনো বিশাল দল নয়, কিংবা এমন কোনো বিশাল উন্নয়নের নজির রাখতে পারেননি যে আপনাকে হিংসা করতে হবে। অকারণে সমালোচনা করতে হবে। আসলে আপনার রাজনীতির ৮০ ভাগ নাটক। সারবত্তাহীন। বাকি ২০ ভাগ জেল্লাহীন রাজনীতি যা অদূর ভবিষ্যতে অর্থহীনতার দোষে দুষ্ট হয়। তার মানে কী আপনি রাজনীতিটা বোঝেন না? পাগলেও সে কথা বলবে না। বিলক্ষণ বোঝেন। কিন্তু মুশকিল হলো, কোন রাজনীতিটা কোন সময়ে কোন স্তর পর্যন্ত করতে হবে সেই মাত্রাজ্ঞানটার আপনার অভাব আছে। ২০১৪ সালের ভোটের আগে আপনি প্রকাশ্য সমাবেশে বলে বেড়ালেন মোদীকে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন। ফল কী হলো, উনি আপনাকে এমন নাকানি চোবানি খাওয়ালেন হাসতে হাসতে একটুও না রেগে, ২০২১ সালে আপনার রাজ্যপাট তলিয়ে যায় যায় অবস্থা। আপনি বললেন, মোদী অপয়া। মোদীর জন্যই এত বিপর্যয়। অথচ দেখুন, এত অপয়া মানুষটার হাত ধরেই ফের অর্থনৈতিক ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে গোটা দেশ। আপনি নোট বাতিল, জি এস টি লাগু নিয়েও তো কম রাজনীতি করেননি। আজ আপনারই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হচ্ছে, জিএসটির ফলে রাজ্যের হাতে করের পরিমাণ বেড়েছে। আপনি বারবার চিৎকার করেছেন, রাজ্যপাল এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে রাজ্যবিরোধী কাজ করছেন। যেই রাজ্যপাল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তখন আপনি মূক ও বধির হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনার মন্ত্রী, মেয়র ভুলভাল বকছেন তাল হারিয়ে।

Glimpses : Ambassa Education Inspectorate

Blood Donation Camp

Blood Donation Camp

TLM Park

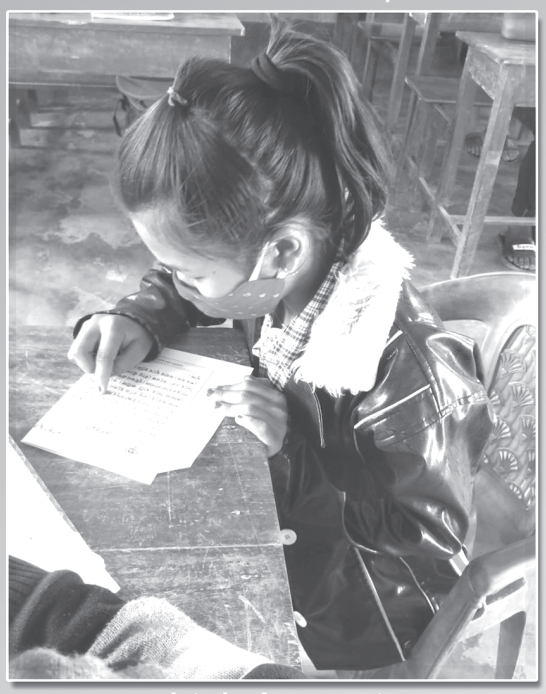

Interim Assesment

BALA

Mid-Day Meal

Library

Uddipan

বিদ্যালয় পরিদর্শক, আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা,

আপনি কেন্দ্র বিরোধী। তাই রাজ্যের বিজেপি নেতারাও আপনার চক্ষুশূল। কিন্তু আপনি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি ইস্যুতে আপনি বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের কাছেও যে 'খোরাক' হয়ে উঠলেন তা কি রাজ্যের বিজেপি নেতাদের দোষে? যখন বিজেপি নেতারা আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দিতে বেরিয়েছেন, নিজেরা রাস্তায় নেমে পড়েযাওয়া গাছ কেটে রাস্তা সাফল করেছেন, আপনি বাধা দিয়ে বলেছেন— ওদের জন্য করোনা ছড়াচ্ছে।

যে কোনো গণতন্ত্রেই বিরোধিতা অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু বিরোধিতা যদি সারবত্তাহীন হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বিরোধিতা আর ধোপে টেকে না। আপনার কেন্দ্র বিরোধিতা তেমনই এক সারবত্তাহীন বিরোধিতা, যা আপনার রাজনৈতিক অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে প্রতিদিন। এখন যা দাঁড়িয়েছে আপনার রাজনীতির চেহারা, তা আসলে মুণ্ডুহীন একটা ধড়। একা প্রশান্ত কিশোর কেন হাজার প্রশান্ত কিশোরও মুণ্ডুহীন ধড়কে দিয়ে কী রাজনীতি করবেন?

প্রধানমন্ত্রী যখন কোনো বৈঠক ডাকবেন, মুখ্যমন্ত্রী যাবেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বৈঠক ডাকলে আপনি কাউকে যেতে দেবেন না। ডিজিটাল কনফারেন্সে আপনি মুখ বুজে বসে থাকবেন। তারপর প্রেসকে ডেকে বলবেন, অঅমাকে তো কিছু বলতেই দেওয়া হলো না। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে কেন্দ্র-রাজ্য বিতর্ক সব দেশে সর্বকালেই আছে। এদেশে আছে। ইতিহাস বলে, স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া বা আর্থিক সমবণ্টন নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বহু বিতর্ক হয়েছে। যদিও দুজনেই ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ স্তরের নেতা। কিন্তু তার মধ্যে নিহিত ছিল রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্ন। রাজ্যের স্বার্থের প্রশ্ন। তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তি রাজনীতির প্রভাব ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সবসময় একটা সত্যকে মেনে চলতে হয় সব রাজ্যকে, যে একটা রাজ্যের দায় ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দায় গোটা দেশের, সব রাজ্যের। কারণ, তিনি সব রাজ্যের অর্থাৎ সব রাজ্য মিলিয়ে গঠিত দেশটির প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মানুষ বলে গুজরাটকে বেশি প্রাধান্য দেবেন কিংবা কংগ্রেস জাতীয় স্তরের দল বলে রাজস্থানকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসবেন আর আপনার মতো ছোট রাজ্যের একটি আঞ্চলিক দলের শাসিত রাজ্য বলে পশ্চিমবঙ্গকে দূর-ছাই বলে দূরে ঠেলে রাখবেন— একথা ভাবা হলো মূর্খের স্বর্গবাসের সমান।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি একটু হিসেব করে দেখবেন, আপনি গত ১০ বছরে কেন্দ্রের কাছ থেকে উন্নয়নবাবদ কত টাকা পেয়েছেন, আর কত টাকার হিসেব দিয়েছেন। হিসেব না দিলে ম্যাচিং গ্র্যান্ট পাবেন না। এটাই নিয়ম। হাজার চেঁচালেও টাকা আসবে না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি একটু হিসেবে করবেন, মেলায়, খেলায়, বিনোদনে, তোষণে, পোষণে আপনি কত কোটি টাকা অপচয় করেছেন। কেন্দ্র হিসাব চাইলে দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। কারণ, যতই লজিক দিন, টাকাটা রাজ্যের, প্রশ্ন উঠবেই— আপনার তো নয়?

গত ১১ বছর ধরে আপনি রাজনৈতিক বৈষম্যের যে রাজনীতি করে এসেছেন, তার নিট ফল আসলে শূন্য। কারণ, আপনার অভিযোগগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয়, অথবা বাস্তবোচিত নয়। কিংবা সত্য হলেও বাস্তবোচিত ভাবে পেশ করতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসেও আপনি ১১ বছর ধরেই বিরোধী নেত্রীর ইমেজটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনভাবে রাজ্যের গালে পাউডার মাখিয়ে উন্নয়নের ধোঁকা দিয়েছেন, তেমনই কেন্দ্র বিরোধিতার নামে নাটক করেছেন। কারণ, আপনি জানেন, একদা রাজনীতিক দিগ্‌বিদিক হারা স্রোতে আপনি যখন ভাসছিলেন, তখন আপনি আশ্রয় নিয়েছিলেন যে চরে, সেটার নাম ছিল বিজেপি। আপনি জানেন, আগামীদিনেও আপনার বিপদ, মারণ উচাটন যাতেই ক্ষতি হোক না কেন, আপনার আশ্রয়স্থল একটাই। সে পথটা খোলা রাখতে চাইছেন, তাই নাটক করে মানুষের চোখে সাধু সাজছেন।

কিন্তু অঙ্কটা বোধহয় এর মধ্যে বদলে গেছে। সিঁড়িভাঙা অঙ্ক তো। একটু ভুল করলেই স্লিপ করে আছাড় খাবেন। আর ভুল তো আপনার রাজনীতির অঙ্গ। অতএব সাধু সাবধান! আর না এগোনোই ভালো। আপনি বরং কেন্দ্র বিরোধিতার মাত্রাটা আর একটু চড়িয়ে দিন। তাতে অন্তত আপনার বিরোধী নেত্রীর ইমেজটা একটু হলেও সম্মান পাবে। ওটাই তো এবার আপনার একমাত্র ভরসা।

সহায়ক পাঠ্য :— কেন্দ্র এবং রাজ্য, উঁচু এবং নিচু, রাজা এবং প্রজা ঃ বিবেক দেবরায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩।
যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবতন : বিকাশ পিডিয়া।

With Best Compliments From-

TECHNO MANUFACTURING & SALES CORPORATION

With Best Compliments
From-

UNIVERSAL CORPORATION

With Best Compliments
From-

POWER MACHINERY CORPORATION

With Best Compliments
From-

APOLLO IMPEX

With Best Compliments
From-

J.G. Hardware Stores

With Best Compliments
From-

Kothari Trading Centre

With Best Compliments
From-

Hooghly Mills Projects Limited

ন্যায়-অন্যায়

শেখর সেনগুপ্ত

প্রকৃতির মতলব বোঝা কঠিন। সকাল শুরু হয়েছিল পিটপিট বৃষ্টিতে। বাতাসের নিতান্ত বালিকা-স্বভাব। কখন কোথায় খোঁচা মেরে অনির্বচনীয় আনন্দ পাবে, অনুমান করা প্রায় সাধ্যাতীত। প্রথমে ছিল পূব থেকে পশ্চিম, পরে দক্ষিণ থেকে উত্তর। সকাল গড়িয়ে দুপুরে পা দিতেই কিন্তু পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। তারপর সূর্য যখন মাঝআকাশে, সরকারি গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরীর লেখক-মাতুল শিখর সেনগুপ্ত কম-বেশি

আহ্লাদিত। মনে হচ্ছে, আজকের সন্ধ্যায় আনন্দের পূর্ণঘটটি যথাসময়েই স্থাপিত হবে। প্রকৃতি ওরকম কখনো চপলা, কখনো শান্তস্বভাব হয়েই থাকে। কাজেই প্রকৃতির চাপে উদিত বাসনাকে ত্যাগ করলে অথবা কোনো অনুষ্ঠিতব্য আয়োজনের ওপর ইতি টানলে একরকম ভীরুতার নজির হয়ে থাকবে সেটা। হয়তো এই যুক্তিতেই শিখরবাবু পাজামা খুলে প্যান্ট পরতে শুরু করে দিলেন। আর সেই সময়েই বাধা এল তাঁর মিসেসের কাছ থেকে, 'আবার কিন্তু মেঘ ঘনাতে পারে। আর বৃষ্টি মানেই তো কলকাতা নরক। যে কৌশলই নাও না কেন, কেউ তোমাকে রেয়াত করবে না। এটা অবশ্য তুমি আমার থেকে ভালোই জানো।'

হাফ হাতা জামাটায় মাথা গলাতে গলাতে লেখক জবাব দিলেন, 'আমি কিন্তু ম্যাডাম প্রকৃতির চরিত্রচর্চাতেও তুখোড়। আজ আর মেঘের মুখভার দেখতে হবে না। মাটি থেকে আকাশ আদ্যোপান্ত সব নীলে নীলাক্কার। তাছাড়া প্রত্যেক লেখককে গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায় নিয়েছেন স্বয়ং উদ্যোক্তা।'

'উদ্যোক্তাটি কে?'

'তোমাকে বলেছিলাম। ভুলে গিয়েছ। উদ্যোক্তা হলেন অভিষেক সংবাদপত্রের মালিক স্বপ্নময় ঘোষ। পত্রিকা চালাতে গিয়ে প্রথমে কয়েকবার হোঁচট খেয়েছেন। তারপর দেখলেন, দুটো বিষয় পাবলিক খুব খায়। প্রথমত, খ্যাতনামা লোকেদের ইহজন্ম-পরজন্ম ঘাঁটিয়ে রসালো, অথচ গোপন কেচ্ছাকে খুঁচিয়ে বের করে ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বিশেষ সংখ্যায় অন্তত একটি করে অপরাধমূলক সত্যি কাহিনি কোনো দক্ষ লেখককে দিয়ে লেখানো। এই দুই কৌশল অবলম্বন করার পর থেকেই স্বপ্নময়বাবুর গোঁত্তা খাওয়া অভিষেক দিব্যি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।'

'তা তুমি বুঝি ওইসব অপরাধমূলক সত্যি কাহিনি লেখকদের একজন?'

'এখনও লিখিনি। এরপর হয়তো লিখতে হবে মহৎ প্রাপ্তির বিনিময়ে। এই ধরনের গল্প লিখে যাঁরা অভাবের হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাচ্ছেন, আজকের সভায় 'অভিষেক' সম্পাদক স্বপ্নময় ঘোষ তাঁদের অনেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রত্যেকে একটি করে সত্যি কিন্তু অলিখিত গল্প শোনাবেন, স্বপ্নময়বাবুর হাত থেকে অগ্রিম বাবদ একখানা খাম নেবেন এবং স্বপ্নময়বাবু তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেবারও ব্যবস্থা করবেন। তুমিই বলো, আমি কি বোকার মতো এরকম সুযোগ হাতছাড়া করতে পারি? সামনে পুজো।'

শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তর মুখ থেকে ছায়া সরে যায়। কিন্তু গলায় অন্য হুঁশিয়ারি, 'কিন্তু করোনাকে মনে রাখতে হবে, স্যার। মাস্কটা যেন মুখেই থাকে।'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! হয়তো আরও বৎসরাধিককাল আমরা সব মুখে মুখোশ পরেই থাকব। বিশেষত বয়সটাও যখন সত্তর অতিক্রম করেছে, তখন এইভাবেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হতেই হবে। বাহ্যজ্ঞানরহিত জীবনযাপন অধমের অভিজ্ঞতার বাইরে।'

'খুব হয়েছে। গিয়ে একটা কল দেবে কিন্তু।'

'সিওর, সিওর।'

ট্যাক্সিতে উঠে শিখরবাবু দেখলেন, নগর কলকাতা এখনও তার সেই টিপিক্যাল ক্যারেকটার ফিরে পায়নি। ধারাবাহিক লকডাউন, তার ওপর উম্ফুনের অকল্পনীয় তাণ্ডব— ভয়ে মুখ লুকিয়েছে আদত কলকাতা। এতবড় প্রলয় কলকাতার ইতিহাসে আর আছে কিনা, বিতর্কের বিষয়। ফনি, বুলবুল, আয়লা সব কিছুকে নাস্যাৎ করে দিয়ে এ যে এক মহাপ্রলয়। কলকাতার হৃদস্পন্দন এখনও পুরোপুরি ফিরে আসতে সময় লাগবে। ফলে চারচাকায় গতি আজ ক্ষিপ্র। কয়েক পাক ঘুরে একটা উড়ালপুলকে অবলম্বন করে পৌঁছে গেল অকুস্থলে। সল্টলেকের এবি-এসি ব্লকে। গাড়ি থেকে অবতরণ করেন শিখরবাবু। সামনে একটা পার্ক। পার্কের দক্ষিণ প্রবেশপথে দুবছর আগে একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল, 'সেরার সেরা সংবাদ-কাম-সাহিত্যপত্র অভিষেক'...। তদবধি সম্পাদকের নাম সমেত সেটা ওখানেই ঝুলছে। সম্পাদকবাবু স্বপ্নময় ঘোষের রমণীয় বাসস্থান অদূরে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিদিন ভোরে এই পার্কে তিনি চক্কর কাটেন। বপু বিশাল হওয়ায় কাজটা কঠিন। বড় বাড়ির লাগোয়া প্রেসে ঢুকে সবকিছুর তদারকি চালানো আরও কঠিন। আর হয়তো কাজগুলি কঠিন বলেই সানন্দে কাগজের বিক্রি বাড়িয়েই চলেছেন তিনি। একসময়ের চটকলের পার্টনার নিজের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে একটি বাজারচালু পত্রিকার মালিক-কাম-সম্পাদক। অন্তত যতদিন বেঁচে আছেন, এ বাণিজ্য গুটিয়ে নেবার সম্ভাবনা নাস্তি।

বাড়ির মধ্যেই মাঝারি মাপের হলঘর। সেখানে শিখরবাবু প্রবেশ করার আগেই জনা তিনেক কাহিনিলেখক উপস্থিত। তিনজনই বয়সে প্রায় তরুণ। প্রবীণ শিখর সেনগুপ্তকে দেখে তাঁদের হৃদযন্ত্র যেন নেচে ওঠে, অন্তত ভাবভঙ্গিতে সেটাই মনে হয়। স্বপ্নময় ঘোষ নির্লিপ্ত না থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে একরকম বরণ করে নিলেন সেনগুপ্তকে। সসম্মানে বসালেন নিজের ঠিক পাশের চেয়ারটিতে। এরপর এলেন আরও

দু'জন। দু'জনই মধ্যবয়স্ক। কলেজপাড়ায় কেউ বই না ছাপুন, বাজারচালু বাংলা ম্যাগাজিনে তাঁদের গল্প-উপন্যাস মাঝেমধ্যেই ছাপা হয়। লেখায় মুন্সিয়ানা থাকলেও সেক্সের প্রাধান্য বড্ড প্রকট।

যথারীতি শুরু করলেন আহ্বায়ক স্বপ্নময় ঘোষ, '... আমি অনায়াসেই এই সমাবেশের মুখ্য আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি শ্রীযুক্ত শিখর সেনগুপ্ত মহাশয়কে। অনেক ক্রাইম থ্রিলার তিনি লিখেছেন, প্রয়োজনে প্রচলিত নিয়মকানুন ভেঙে নতুন টেকনিক এনেছেন তাঁর রচনায়। এই ভুবনে তিনি স্বয়ং একটি আকর্ষণীয় ব্র্যান্ড। আমি ধরে নিতে পারি তাঁর লেখা ক্রাইমস্টোরিগুলি সবই কাল্পনিক নয়। অনেক বয়স, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, তাই প্রত্যক্ষ ও সত্যি ঘটনার ছায়াও নিশ্চয় রয়েছে দু-একটি উত্তীর্ণ সৃষ্টিতে। আমাদের একান্ত আবেদন তাঁর কাছে, আজ তিনি এখানে এমন একটি অপরাধের ঘটনা জানাবেন, যা নির্ভেজাল সত্যি এবং এখনও তিনি ওই খাঁটি সত্যকে নিয়ে কোনো কাহিনি রচনায় প্রবৃত্ত হননি। আমরা এখানে একরকম দলবদ্ধভাবে বসে আছি শিখরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। আজ তিনি আমাদের যা শোনাবেন, পরবর্তীকালে সেটাই হয়তো সত্যকে বহুলাংশে অতিক্রম করে একটি থ্রিলারে রূপান্তরিত হবে এবং আমাদের 'অভিলাষ' পত্রিকায় তা ছাপাও হবে।

শিখরবাবুর মুখে স্মিত হাসি। বুদ্ধিমান মানুষ নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন, স্বপ্নময় ঘোষের সঙ্গে লাভজনক টাই-আপ অ্যারেঞ্জমেন্টে যেতে হলে এইসব দাবি মেনে নিতেই হবে। কেবল লিখে যাওয়াটাই তো বড়ো কথা নয়। জীবনের এই শেষ প্রহরে লেখা বাবদ কিছু উপার্জনও বাড়াতে হবে। শিখরবাবু শুরু করার আগে চা সেবন সত্ত্বেও বোতলের জলে গলা ভেজালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা স্পষ্ট, 'একজন সাহিত্যিক কী লিখবেন, কীভাবে লিখবেন না, এটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। নীতিনির্ধারণের দায়ও তাঁর একার। তিনি কতটা চর্চা করবেন, তাঁর পঠনপাঠন কতদূর যাবে, এই নিয়েও তাঁর ওপর খবরদারি করার কেউ থাকতে পারে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। খুব কম বয়সেই আমার লেখালেখির সূচনা। প্রথমেই একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম। তা হলো, আমার কল্পনাশক্তি তেমন জোরালো নয়। একমাত্র সেই লেখাগুলিই আমি সাবলীলভাবে লিখতে পারি যেগুলিকে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ং জড়িয়ে পড়েছি। সুচিন্তিত প্রয়াসে আমি হয়তো একাধিক নিবন্ধ লিখতে পারি, কিন্তু গল্প উপন্যাস নয়। তাই ভাগ্নে সরকারি গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরীকে নায়ক করে আমি এযাবৎ যতগুলি রহস্য উপন্যাস লিখেছি, তার প্রতিটিতেই সত্যের ছোঁওয়া রয়েছে। যদিও তার কয়েকটি যে হারে আলোড়ন তুলেছে তা লক্ষণীয়। তা বলে ভাববেন না, রহস্য গল্প বা রহস্য উপন্যাসই বুঝি আমার কলমের শেষ কথা। তা কিন্তু নয়। নানান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে জোগাড় করে লেখা আমার তিনশো'র ওপর গল্প খ্যাত-অখ্যাত পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। নাবিকদের ওপর লেখা আমার উপন্যাস নামি প্রকাশক ছেপেওছেন। তবে আজ আমি এখানে এসেছি একটি অপরাধমূলক সত্যি ঘটনার বিবরণ পরিবেশন করতে। তবে এটা আমার চোখে দেখা ঘটনা নয়। আমার বন্ধুস্থানীয় একজন পুলিশ অফিসারের কাছে শুনেছিলাম ঘটনাটি। তিনি আমাকে এরকম একাধিক সত্য কাহিনি শোনাতেন অবসর সময়ে। যাতে আমি ওই সমস্ত বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত ঘটনা নিয়ে ছোট বড়ো গল্প লিখে যেতে পারি। তিনি যখন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি নামি গ্রামাঞ্চলে থানার অফিসার-ইন-চার্জ, তাঁকে এই কেসটার ওপর যবনিকা টানতে হয়। এইটুকুই উপক্রমণিকা। এবার চলে আসি মূল ঘটনায়।

ধরে নিন, গ্রামটির নাম ব্রতগঞ্জ। ব্রতগঞ্জের পূবদিকে জোয়ার-ভাঁটায় প্রবহমান নদীটির নাম গাণ্ডীব। ব্রতগঞ্জের অদূরে মোহনা— যেখানে নদী গিয়ে মিশেছে সাগরে। সেখানে ঢেউয়ের আছাড়ি-পিছাড়ি জোয়ারের সময় বড়োই প্রকট। গাণ্ডীবের এইদিকে ওইদিকে আদিকালের যাত্রীবাহী কয়েকটি নৌকো। ভাঁটার সময় এখানে এমন কাদা হয় যে যাত্রীদের সামান্য পয়সার বিনিময়ে মাঝি-মল্লারা কাঁধে তুলে নিয়ে নৌকোয় বসায়। মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রে দৃশ্যটি কম-বেশি চমকপ্রদ। যেন প্রেমে-সোহাগে হাবুডুবু চলেছে একজোড়ার। নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। ব্রতগঞ্জে সম্ভবত এমন একজনও নেই, যে ওই ছবিকে আড়চোখেও জরিপ করার তাগিদ অনুভব করবে।

ব্রতগঞ্জের অধিকাংশ লোকেরই দুর্বার দারিদ্র্য। চাষবাসই মুখ্য জীবিকা। জমির উর্বরতা কম। বেশিরভাগ একফসলি। কালেভদ্রে নোনা জল যখন ঢুকে পড়ে, হিন্দু-মুসলমান চাষারা কেবল কপাল চাপড়ায় আর নিজেদেরই তৈরি কী যেন এক মন্ত্র বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করে। তবে ধৈর্যচ্যুতি বড় একটা ঘটে না। সাংঘাতিক চার চার জন সুদখোর আছেন এলাকায়। তাদের কাছে সোনাদানা বন্ধক রেখে টাকা ধার নেয় এরা। সুদের হার মাসে শতকরা দশ টাকা। ফসল পাকলে তা বাজারজাত করে কৃষক যে টাকা পায়, তার সিংহভাগকে তুলে দিতে হয় সংশ্লিষ্ট সুদখোরের হাতে। বন্ধকি গয়না ফেরত এনে অন্তত কিছুদিনের জন্য পরিবারের

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

সুনিবিড় প্রেমে স্বপ্নময় হয়ে রয়। তখন নিভৃত কোণে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবী নিষ্ঠুর হাসি হাসেন পরবর্তী মরশুমের কথা ভেবে। এটাই ওদের জীবন। ব্রতগঞ্জের ব্রতের ধারাবাহিকতা।

গ্রামে কিন্তু বিডিও সাহেব আছেন একজন। একটি থানাও আছে। এর চেয়েও বড়ো কথা, একটি কলেজ এবং দু দুটো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রয়েছে। এককালে একটি অপরিসর সিনেমাহলও ছিল। এখন তা প্রায় ধ্বংসস্তূপ। স্বপ্নমাখা স্মৃতিটুকুও আছে কিনা সন্দেহ। জনসংখ্যা যে ঠিক কত, বলা মুশকিল। বিশেষত মুসলমান পরিবারগুলোতে তো বছর বছর গণ্ডায় গণ্ডায়...। পশ এরিয়াতে অনেকগুলি দ্বি-তল, ত্রি-তল পাকা বাড়ি। আছে মস্ত রাসলীলা মন্দির। সাংস্কৃতিক সংস্থা 'ব্রতপ্রতিভা'য় বিকেল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত নাটকের মহড়া চলে। ব্রতপ্রতিভা-র যিনি সম্পাদক, তিনিই মুখ্য নট হরিহর পাহাড়ি। সব নাটকেরই মলাটের রোল তাঁর চাই-ই। চন্দ্রগুপ্ত-র চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান-এর সাজাহান, বব্রুবাহন-এর বব্রুবাহন... অবশ্য মহেশ-এর মহেশ তিনি হতে চাননি। মোটামুটিভাবে এই হলো এলাকাটির পরিচিতি। সেই পরিচিতির টানেই ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্কের একটি শাখাও এখানে তার মহিমা বিস্তারে ব্রতী। আর আমার এই গল্পের পরিধিতে ঘন ঘন ঢুঁ মারবে ব্যাঙ্কের ওই ব্রাঞ্চটি। যেহেতু এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, সকাল সাড়ে ন'টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জেনারেটারের আলোতে অফিসটা আলোকিত হয়ে থাকে। ব্রাঞ্চম্যানেজার প্রৌঢ় গজেন্দ্র ব্যানার্জি সপরিবারে ব্যাঙ্কবিল্ডিং-এর ওপরে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে থাকেন। স্ত্রীর মুখঝামটা নিত্য হজম করতে হয়। অভিশাপ দেন রিজিওন্যাল ম্যানেজার ও অফিসার্স ইউনিয়নকে। এই বয়সে পচা শামুকে তাঁর পা কেটেছে। প্রমোশনের লোভ ছিল খুব। আর সেটা বুঝতে পেরেই তাঁকে নিমেষে ব্রতগঞ্জের ভিলেজ ব্রাঞ্চে ম্যানেজারি করতে ঠেলে পাঠালেন রিজিওন্যাল ম্যানেজার মি: টি টি ভূতলিঙ্গম্।

ভাগ্যিস গজেন্দ্র ব্যানার্জির বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকে পুনেতে, আর পুত্র দিব্যকান্ত রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে। তবুও নৌকোয় চাপবার আগে মাঝির কোলবন্দি হওয়া এবং নদী গাণ্ডীব পার হওয়া নৌকোয় দোল খেতে খেতে সেইদিন সত্যি অঝোরে কেঁদেছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। কী বেয়াড়া চাকরি রে বাবা! রোমান ক্রীতদাসদেরও অধম অমন এক ব্রাঞ্চম্যানেজার স্বামী। বিয়ের সময় লোকটা সুপুরুষ ছিল। তারপর বয়স যত বাড়ে, ব্যাঙ্কের নানা কাজে সময় ও মেধার প্রয়োগ ঘটাতে ঘটাতে সেই লোক আজ আধবুড়ো। উচ্চাশা বেড়েছে, শারীরিক লালিত্য কমেছে। তারপর দুম করে ব্রতগঞ্জের ভিলেজ ব্রাঞ্চেপোস্টেড হওয়ায় এখন নিয়োগকর্তাদের ওপরই খেপে লাল। চকিতে শপথ নিলেন, এই ব্রাঞ্চটার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে তিনি কিছুই করবেন না। শুধু টাকা জমা দেওয়া ও তোলা— এর মধ্যেই সীমিত থাকবে কাস্টমার সার্ভিস। কেউ ধারটার নিতে চাইলে এমন ব্যবহার করেন, যাকে কদর্যই বলা চলে। ব্রাঞ্চে অফিসার তো মাত্র দু'জন— ব্রাঞ্চম্যানেজার এবং হেড ক্যাশিয়ার। হেড ক্যাশিয়ার সমীর ঘোষকে একরকম বৃদ্ধই বলা চলে। চাকরি জীবনের গণ্ডি প্রায় অতিক্রম করতে চলেছেন। তাই শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই তাঁর বদলির অর্ডার আসবে। ব্রতগঞ্জ ছেড়ে চলে যাবেন একেবারে কলকাতায়। যেন ক্ষুদ্রতাকে পেরিয়ে সীমাহীনতায় পৌঁছে যাওয়া। সমীরবাবু খুক্‌খুক্ করে কাশেন। গ্রাহক পরিষেবার কথা যেন ভুলেই গেছেন। ব্যাঙ্কে যাঁরা প্রত্যাশা নিয়ে আসেন, তাঁদের প্রতি খাজাঞ্জি সাহেবেরও উপেক্ষা বিশেষভাবে প্রকটিত। গজেন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে সমীর ঘোষের বুঝি একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলেছে— কার ট্রান্সফার অর্ডার আগে আসবে, তারই। দু'জনেরই ক্ষোভ অনেক। কোনোরকমে সততার পন্থা অবিকৃত রেখে অফিস খোলা এবং বন্ধ করা। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কম। চাষবাস যাঁরা করেন, ছোট ছোট দোকান যাঁরা চালান, তাদের সম্পর্কে হীন মন্তব্যও ছুঁড়ে দেন ব্রাঞ্চের অন্যান্য স্টাফদের সামনেই। হেড অফিস থেকে ব্যবসা বাড়াবার চাপ এলে তা তাঁদের বিরক্তিতে ইন্ধন জোগায়। কারণে অকারণে ছুটি নেওয়াটা দুজনের কাছেই লোভনীয় বিলাস। ওই দিনগুলিতে তাঁরা সপরিবারে চলে যান শহুরে পরিবেশে কিংবা কোনো প্লেস অফ ইন্টারেস্টে। তখন সোহাগে ও মাদকতায় ডুবু ডুবু তাঁরা, দেবস্থানে মাথা ঠুকে বলেন, 'এবার আমাকে ফিরিয়ে আনো, মা।'

শিখর সেনগুপ্ত খানিক বিরতি নিলেন। বয়স যত বাড়ে, কোমরের ব্যথা তত চাগাড় দেয়। ব্যথাটা কোমরের যে সঙ্কীর্ণ এলাকায় থিতু হয়েছে, তিনি বা হাত দিয়ে সেখানে সামান্য চাপ দিলেন। অন্যরা যে তাঁর গল্প শুনতে আগ্রহী ও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, অনুধাবন করে আবার বলতে শুরু করে দেন, 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং হেড খাজাঞ্জি— এই দুই প্রবীণ আধিকারিকের মধ্যে প্রথম বাজিমাত করলেন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের হেড সমীর ঘোষ মহাশয়। ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল অফিস থেকে এসে গেল তাঁর ট্রান্সফার অর্ডার। ব্রতগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে তিনি অতঃপর জয়েন করবেন

কলকাতার হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চে। তাঁর কাছ থেকে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের চার্জ বুঝে নিতে কিছুদিনের মধ্যেই ব্রতগঞ্জে পা রাখতে আসছেন যে অফিসার, তাঁর নাম মি: অমল দাস। বার্তা পেয়ে প্রবীণ সমীর ঘোষের আনন্দ আর ধরে না। তাঁর কথাবার্তা, মেজাজ, গতিভঙ্গি সব কিছুতেই কম-বেশি পরিবর্তন এসে গেল। গ্রাহকদের সঙ্গে হেসে কথা বলা। ব্রতগঞ্জের প্রধান মিষ্টির দোকানটি থেকে খানকয়েক সন্দেশ কিনে একরকম জোর করে স্ত্রীর মুখে গুঁজে দিলেন দুটো। তখনও এই বঙ্গে মোবাইল ফোন সকলের জীবনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও দরকারি আভরণ হয়ে ওঠেনি। তাই অফিসের ল্যান্ডফোন থেকেই ছেলে-মেয়েদের, বউমাদের, নাতি-নাতনিদের সুখবার্তা পাঠাতে থাকলেন রোজ। সমীরবাবু যখন ফোনে গলা তুলে কথা বলে চলেছেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার গজেন্দ্র ব্যানার্জির দুই চোখে যেন রক্তের ফোঁটা দেখা যায়, যদিও প্রকাশ্যে সমীরবাবুর সঙ্গে হাতও মেলালেন এরই মধ্যে অন্তত তিন তিনবার। স্ত্রীর দ্বারা তিরবিদ্ধ হয়ে বাজার করে ফেরার পথে কালভার্টের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়েও যান এবং ব্যথায় বিধুর হয়ে আপন হাঁটুজোড়া পরীক্ষা করালেন ব্যাঙ্কের মেডিক্যাল অফিসার ডা: চিত্তরঞ্জন মাইতিকে দিয়ে। না, আঘাত আদৌ গুরুতর নয়। সরষের তেল গরম করে মালিশ করলেই ব্যথা পালাবে।

অতঃপর নতুন ক্যাশ অফিসার অমল দাস ব্রতগঞ্জে যাবেন বলে এক বুধবার মধ্য বেলায় গাণ্ডীব নদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। গাণ্ডীব তখন জোয়ারের জলে টইটম্বুর। হু-হু বাতাসও বইছে। কপালের জোরে তাঁকে ওই সময়ে মাঝির কাঁধে চেপে নৌকোয় গিয়ে উঠতে হলো না। যন্ত্রযুগে লগি-ঠেলা নাও যেন চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক। আর সেই কারণেই অমলের উৎসাহ বেশি। বয়সেও নবীন। সার্ভিস রেকর্ড মোতাবেক তেত্রিশ। কম বয়সে প্রোমোশন পেলেও উচ্ছ্বলতা সহসা উধাও হয়ে যায়নি দায়িত্বের চাপে। গায়ের রং মিশকালো হলেও শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের কল্যাণে সান্ত্বনা বা ধিক্কারের প্রশ্নই ওঠে না। দুই বড়ো চোখের বড়ো নজর তাঁর চিত্তের প্রসারতাকে প্রমাণ করে। তবে মাথায় অমন বাবরিছাঁটের চুল কেমন যেন বেমানান। উদারতার পাশাপাশি অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় সম্পর্কে ঈষৎ ধন্ধ জাগে। সেই তরুণ অফিসার উৎসাহের সঙ্গে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের ফুল চার্জ বুঝে নিলেন সমীরবাবুর কাছ থেকে মাত্র একদিনেই। ঝড়ের বেগে নোট গুনতে পারেন। হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে লম্বা লম্বা টোটালের নির্ভুলতা নির্ণয়ে সক্ষম। ব্রাঞ্চের দুই ক্যাশিয়ার অনিল জানা ও শক্তি কর্মকার প্রায় সমবয়সি স্যারকে পেয়ে খুব খুশি। ব্রাঞ্চের আবহাওয়াটাই অচিরে এমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে আড়ালে বৃদ্ধ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যেন হেঁপো রোগীর মতো ফোঁসফোঁসিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের চার্জ বুঝে নেবার পর অমল দাসের প্রধান কাজ হলো ব্রতগঞ্জকে একেবারে হাতের তালুতে এনে বসানো। অবিবাহিত যুবক। প্রেমের কিছু স্যাঁতস্যাঁতে অভিজ্ঞতা যদি থাকেও, কোনো সুন্দরীই তাকে সংসার জীবনে বেঁধে ফেলতে পারেনি। অমলের কাছে তাই হয়তো প্রতিটি রাত্রিই বিলকুল নিশীথিনী। ব্রতগঞ্জ চষে বেড়াচ্ছেন। সকল শ্রেণির লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতাতে যেন বদ্ধপরিকর। অনেকে খুব খুশি। অনেকে আবার বিস্ময়ে নিথর কিংবা আড়ষ্ট— ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েও অমন দিলখোলা! ভাবা যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় গাণ্ডীবের কিনারে গিয়ে দাঁড়াবেনই— জোয়ার ও ভাঁটায় জলরাশির দ্বিবিধ নর্তন তাঁকে পুলকিত করে। পঞ্চায়েত অফিসের ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে থানার অফিসার ইন চার্জ, বিডিও সাহেব— সকলেরই অন্তরঙ্গ হতে চান। ব্যাঙ্কের দেওয়া এতবড় কোয়ার্টারে একা থাকেন। কাজের মেয়েটাই ঝাড়ঝোড় দেবার পর রান্নাও করে দেয়। বাবুটি তার দিকে মাঝেমধ্যে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে বিবাহিতা বেচারির গায়ে কাঁটা দেয়।'

শিখরবাবু আর এক দফা বিরতি নিলেন। এবার তিনি সিগারেট ধরালেন। অনেকটা বুঝি সেই হেতুই এসে গেল আর একদফা চা-পর্ব। 'নতুন ক্যাশ অফিসার হয়ে গেলেন ব্রতগঞ্জে অনেকের চর্চার কেন্দ্রস্থল'। লেখক আবার শুরু করে দিলেন, 'লোকটা শহর থেকে এলেও ঠিক যেন শহুরে মেজাজের নন। অনেক ব্যাপারেই উৎসাহ। লজ্জা ও অনুশোচনা— দুটোই যেন একটু কম। এক রবিবার এলাকার পলেটিক্যাল ফিগার দেবরঞ্জন বলের বড়ো পুকুরটাতে নেমে পড়লেন সাঁতার কাটবেন বলে। ঘাটে সমবেত বিভিন্ন বয়সি মহিলাদের দেখে থমকাবার বদলে আরও বেশি করে নিজের কেরামতি দেখাতে থাকেন। গুণ তো নেহাত কম নয়। বড়ো চাকরি। বড়ো চেহারা। সহজে মানুষকে আপন করে নিতে জানেন। ক্রমে প্রকাশ পেল, নজরুল গীতিতেও তাঁর খানিক দখল রয়েছে। নিবাসের ছাদে মাঝে মধ্যে পায়চারি করতে করতে কলেজ ফেরত যুবতীদের দিকে তাকিয়ে নজরুলের সুপরিচিত কোনো গানের দু-এক কলি গেয়ে ওঠেন হয়তো কোনো অপৌরুষের অনুভবের প্রভাবে। স্টাফ অনিল জানা একদিন ওই রকম কোনো গানের ভগ্নাংশ

শুনে ফেলেন। খবরটা ছড়ায়। আসতে থাকে এখান-ওখান থেকে মিনতি। কোত্থেকে অনিল জানা একটা হারমোনিয়ামও জোগাড় করে আনেন। তখন একটা পুরো গানই গাইতে হয়েছিল অমল দাসকে। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবার মিষ্টির ব্যাপারি। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি তিন প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে চলে এসেছিলেন। একটা জিনিস ছিল লক্ষণীয়। ব্যাঙ্কের এই দাস সাহেব অন্য সকলের খবরাখবর নিলেও নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন না। প্রশ্ন এলে এড়িয়ে যান। এখনও তিনি কেন অবিবাহিত, সেই বিষয়ে আলোকপাত করবে না কোনো মতেই। অথচ তিনি যে মেয়েদের দেখলেই সাগ্রহে নিরীক্ষণ করেন, এটা একাধিক জনের নজরে এসেছে। ক্রমে এটাও স্পষ্ট হলো যে, নারীসঙ্গ তাঁর কাছে উপভোগ্য। কৌতূহল স্ফীততর হয়, যখন দেখা গেল, একদিন তিনি স্থানীয় কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা মধ্যবয়স্কা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের আদিপর্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে একজন আর একজনকে ছুঁয়ে ফেলছেন। যদিও ব্যাপারটা বেশি দূর তখন গড়ায়নি। সুদেষ্ণাদেবী তো কেবল বিবাহিতা নন, তাঁর স্বামী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁদের একমাত্র কন্যা এখানকার কলেজেরই ছাত্রী। ক্রমে জানা গেল, কেবল গান নয়, দাসসাহেব তবলাতেও তুখোড়। এক লয় থেকে আর এক লয়ে হাজির হতে পারেন এক ছুটে। স্থানীয় অনুষ্ঠানে হঠাৎই মঞ্চে আসেন জনৈকা গায়িকার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন বলে। সকলে অবাক! প্রায় বালিকা গায়িকা কয়েক পলক বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে জনপ্রিয় দাস সাহেবের মুখের দিকে। তারপর ইশারা পেয়ে গাইতে শুরু করে। গান শেষ হলে হাততালির ঝড়। বাহবা, মুগ্ধতা গায়িকার প্রতি নয়, তবলচির কেরামতির প্রতি। আবার সেই আসরেই অমল দাসের সঙ্গে পরিচয় হয় স্থানীয় জবরদস্ত বাম নেতা হরিচরণ মাইতির। নেতার থোবড়া গালে বলিরেখার কাটাকুটি, তবে বক্তব্য যখন রাখেন, বিপ্লবের রংবেরঙের ফুলকি ছুটে আসতে আসতেই মধ্যপথে মিলিয়ে যায়। হরিচরণবাবুর কাছ থেকেই দাসসাহেব অবগত হলেন ব্রতগঞ্জের হালহদিশ। এলাকায় খুব দাপট চারজন সুদ কারবারির। চার জনেরই হাতে অদৃশ্য ধারালো দা। আসল ফেরত পাবার জন্য নয়। সুদই আগে চাই। ঘাপটি মেরে বসে থাকে, কবে পাকা ধান উঠবে। তখন আসলের সঙ্গে মোট বিনিয়োগের চারগুণ সুদ— এক লপ্তে দিতে হবে। অন্যথায় বন্ধকি সোনার গয়নাগুলি আর ফেরত পাবে না। মাথায় বিকট দেনার মস্ত ধামা চাপিয়ে নিরীহ চষারা শূন্য দৃষ্টিতে আকাশপানে চেয়ে থাকে। পিতলের ঘড়া কাঁখে চাষার বউ কিন্তু উদ্‌গ্রীব— আবার তার পুঁটুলিতে ফেরত আসবে বন্ধকি গয়নাগুলো।

পুলিশ, ব্লক উন্নয়নের কাণ্ডারি, তথাকথিত নেতা-নেত্রী— সকলে কেবল নির্বিকার নন, চার সুদখোরকে খাতিরও করেন বেশ। কারণটা তো একটা শিশুও বোঝে। ন'মাসে ছ'মাসে তাদের ট্যাঁকেও কিছু গুঁজে দিয়ে যান চার বাঘা সুদখোর।

ব্যাঙ্কের নতুন ক্যাশ অফিসার তাঁর চওড়া বুক ঠেসে বাতাস ঢোকান। ভেবেচিন্তে শপথ নেন, চার সুদখোরের যেটা মাথা, সেই বিজয় বর্মন সমেত অন্য তিনজনের কারবারেই আমি এবার ছাই ঢেলে দেব। একজন লোকও যাতে আর ওদের কাছে বউয়ের গয়না নিয়ে হাজির না হয় তার বিকল্প ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আচমকা নয়। ধীরে ধীরে। আমি যে কী করতে পারি, বা পারি না, ব্রতগঞ্জের অগ্রবর্তী আমলারাও এবার টের পাবেন। ভাবতে ভাবতে দাসসাহেব এমন দৃঢ়চিত্ত হলেন যে পরের রবিবারও তাঁকে দেখা গেল না স্থানীয় কোনো যুবতী অথবা মহিলারা সঙ্গে আলাপচারি হতে। কেবল ছাদে পায়চারি করেন ও নিজের কর্মস্থল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান। বেস গ্লানিবোধ ও তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস, শিরার টনটনানি।

আদতে ব্রতগঞ্জে ওই ব্যাঙ্কের ভূমিকা কদাচিৎ কেবল টাকা রাখা ও তোলা। ব্যালান্স মেলানো লেজারগুলির, ব্যাস। রিজিওন্যাল অফিস থেকে তাগাদা আসে— বিজনেস কোথায়? ম্যানেজার, আপনি লোন দিচ্ছেন না কেন? মাঝেমাঝে দু-একজন অফিসার আসেন তদন্তে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার গজেন্দ্র ব্যানার্জি পাল্টা খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠেন, 'এখানে লোন নেবার লোক অনেক। কিন্তু টাকা ফেরত দেবার মানসিকতা ওদের নেই। উইদাউট সিকিউরিটি লোন দিয়ে এই বুড়ো বয়সে আমি ফাঁসি আর কী! তার চেয়ে আমাকে এখান থেকে তুলে নিন। নতুন ম্যানেজার এসে ফুল ফোটাক।'

যিনি এসেছিলেন তদ-অন্তে তিনি যে কী রিপোর্ট দেবেন, তা সহজবোধ্য।

কিন্তু গোল্ড লোন? সোনার গয়না বন্ধক রেখে তো ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারত! সেটা কী এখানকার অফিসারদের মাথায় ঢোকেনি? আশ্চর্য! অথবা এটা তো অবাক হবার কিছু নেই। কেউই হয়তো চান না, অজ পাড়াগাঁয়ে বদলি হয়ে এসে নিজেকে উজাড় করে অফিসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। যেমন এই শাখা প্রবন্ধক গজেন্দ্র ব্যানার্জি। সকাল সাড়ে ন'টায় চেয়ারে এসে বসেন। উঠে যান বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। এতটা সময় তিনি যেন এক টেরাকোটার মূর্তি। নট নড়নচড়ন। কবে যে এখানে অবস্থানের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে, তারই প্রতীক্ষায় হয়তো মুহূর্ত গুনে

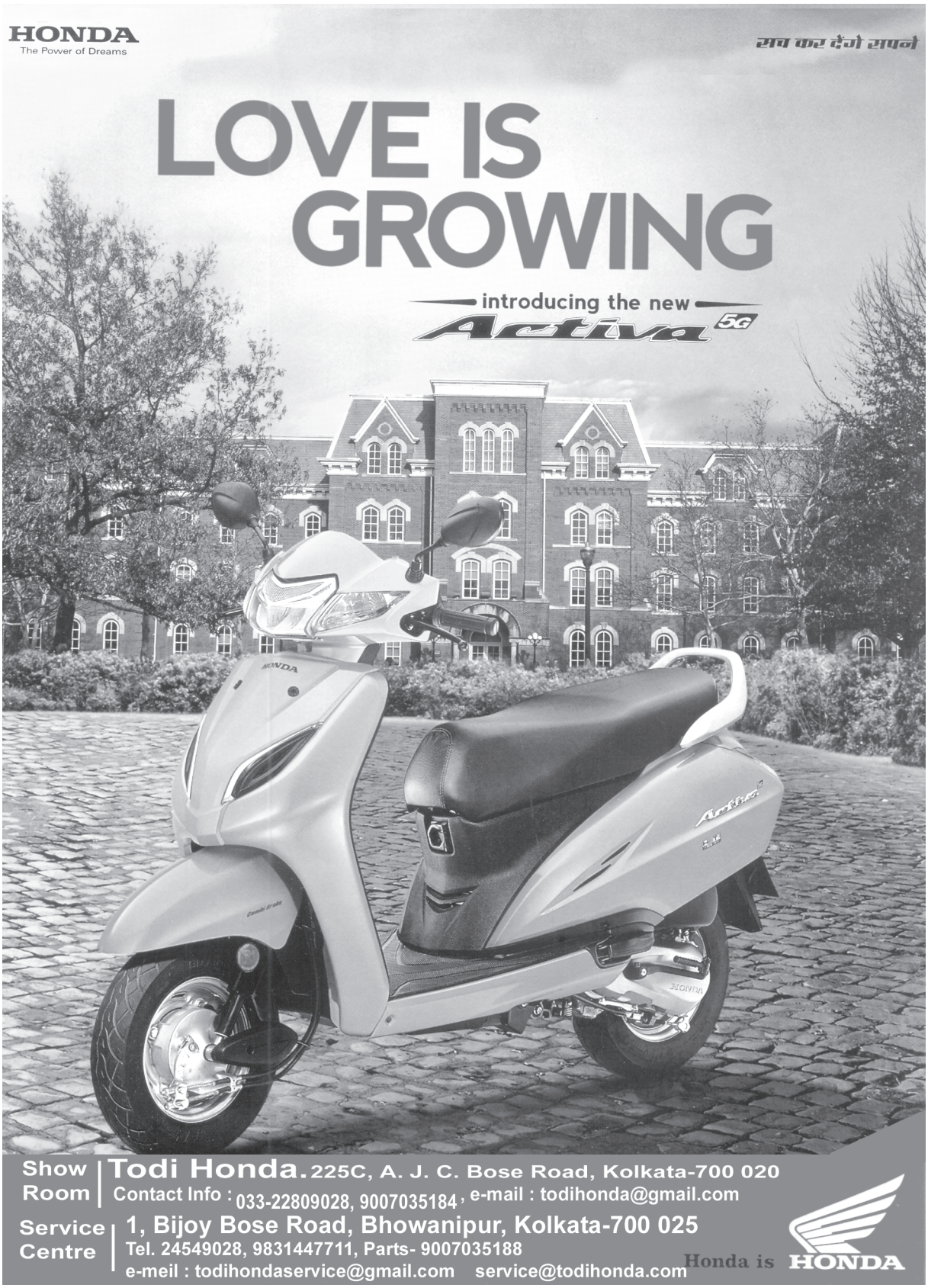
HONDA
The Power of Dreams
सच कर देंगे सपने
LOVE IS GROWING
introducing the new
Activa 5G
Show Room | Todi Honda. 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info : 033-22809028, 9007035184, e-mail : todihonda@gmail.com
Service Centre | 1, Bijoy Bose Road, Bhowanipur, Kolkata-700 025
Tel. 24549028, 9831447711, Parts- 9007035188
e-meil : todihondaservice@gmail.com service@todihonda.com
Honda is
HONDA

চলেছেন।

দাসসাহেবের আগে যিনি হেড ক্যাশিয়ারের চেয়ারে বসে থাকতেন, ব্যাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে তিনিও কদাপি মাথা ঘামাননি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশাও ছিল নামমাত্র। যেহেতু দুজনেরই শিকড় কলকাতায়, গ্রাম ব্রতগঞ্জকে উপহাস করার অধিকার যেন তাঁদের মজ্জাগত। ব্রতগঞ্জে শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা যে যথেষ্ট, এটাও নানান ভনিতায় তাঁরা জানতে চাইতেন না। অন্যদিকে দেখা গেল, নবাগত ক্যাশ অফিসার অমল দাস একেবারে অন্য ধাতুতে গড়া। গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর অপছন্দের নয়। আবার কৃষকদের সুদখোরেরা যেভাবে বিনা বাধায় শুষে খাচ্ছে, সেটাও মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর। একটা সরকারি ব্যাঙ্ক যে এই পরিস্থিতিকে অনেকটাই বদলে দিতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। অমল দাস ছিলেন ফুর্তিবাজ, এখন হয়ে গেলেন রীতিমতো ভাবুক ও গম্ভীর। থিয়োরি এবং প্র্যাকটিস দুটোই তাঁর একরাশ ভাবনাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার দিকে, যার নাম গোল্ড লোন। সোনার গয়না বন্ধক রেখে দরিদ্র কৃষকদের ঋণ দেওয়া। চাষিদের বাড়িতে সোনা কম, সোনা দিয়ে তাঁরা মার্বেল-গুলি বসান না। তবুও সাফ সাফ কথা বলতে কী, নিতান্ত হেঁজিপেঁজি ভাগচাষির ঘরেও কুচি-কাচা সোনা একটু থাকবেই। এটাই যে ঐতিহ্য, তার সবুদও আকছার। ওই সোনাটুকুও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, বিলাপ করার পরিভাষাও নিখোঁজ হয়ে যাবে। সুতরাং মুষ্টিমেয় মানিলেন্ডারদের হাত থেকে অসংখ্য গরিব চাষিদের বাঁচাতে এবার থেকে ব্রতগঞ্জের ব্যাঙ্কটি স্বর্ণঋণ দেওয়া শুরু করবে। করবেই।

ঋণের সমস্ত নিয়মকানুন শর্তাদি গরিব কৃষকদের মগজে খোদাই করে দিতে হবে। অমল দাস বেছে বেছে লোন দেবেন সেই সমস্ত অভাবী চাষিদের, যাঁরা এতকাল চড়া সুদে টাকা ধার নিতেন ব্রতগঞ্জের চার সুদখোরের কাছ থেকে। টুকটাক সোনা যা থাকে বাড়িতে, সব দিয়ে আসতে হতো ওই রাক্ষুসে মহাজনদের। চার সুদখোরের মধ্যে সবচাইতে ডাকসাইটে সেই লোকটা, নাম যার বিজয় বর্মন। অমল দাস টার্গেট হিসাবে প্রথমে বেছে নিলেন বর্মনকেই। ছোট স্প্যানের মধ্যেই মিলল বেশ কিছু তথ্য। লোকটার জন্ম ব্রতগঞ্জে নয়। জন্ম তার পশ্চিম বর্ধমানের কোলফিল্ড এরিয়া লাউদহে। এক বাস কন্ডাক্টরের সুপুত্র। লেখাপড়া বেশিদূর গড়ায়নি। কোন পথে গেলে মালকড়ি ভালোই কামানো যাবে, তারই খোঁজে এক সময় দিকবিদিক জ্ঞান ছিল না। কিছুদিন কলিয়ারির কয়লাও চুরি করে পয়সা জমিয়েছেন। থানাকে হাত করার কৌশল রপ্ত হয়েছে। ক্রমবর্ধিত টাকার টানে আরও কত কী করার পর অবশেষে এই সুদের কারবারে বিজয় বর্মন এখন তো একরকম টাকার কুমির। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। সাদা-কালো দাড়ি অনেক সময়ই গালপাট্টা কাপড়ে মোড়া। অথচ বিয়ে-থা করেননি। পরিবর্তে কালেভদ্রে রাখওয়ালে আনান কম খরচে। দিনের বেলা যে মেয়ে তাকে ধম্মবাপ বলে, রাতে সেই হয়ে যায় সস্তার মেয়েমানুষ। এব্যাপারে পাড়ার নন্দখুড়ো বর্মনকে সাহায্য করতেন সামান্য দশ-বিশ টাকার বিনিময়ে। আচানক তাদের দুজনের মধ্যকার সেই সম্পর্ক কেন যে ভেঙে গেল, সেটা এক রহস্য।

অমল দাস নন্দখুড়োকেই বেছে নিলেন বিজয় বর্মন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে।

'লাউদহের লোক অতদূরে এসে নদী টপকে ব্রতগঞ্জে থিতু হলো কীভাবে?'

'আরে সাহেব, এই লোকটা আগে সুদের কারবার করত না।'

'তাহলে কী করত?'

'কম বয়সে কোল মাফিয়াদের লেজুড় ছিল। কাঁচা কয়লা বর্ডার পার করে চালান দিত। একবার পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। ততদিনে অনেক মাল কামিয়ে নিয়েছে। মাস ছয়েকের হাজতবাসও করেছে তখন।'

'তারপর?'

'তারপর, ছাড়া পেয়ে আর কাঁচা কয়লা চালানে নামেনি। শুরু করল জমি বেচাকেনার কারবার।'

'কী রকম?'

'কম দামে জমি কিনে কিছুদিন বাদে বেশি দামে বেচে দেওয়া। দুনিয়ার সব কিছুরই তো দাম বেড়েই চলে, কমে না কোনোকিছুরই।'

'কমে খুড়ো। একটা জিনিসের দাম কেবল কমেই চলেছে।'

'বলেন কী! কী সেই জিনিস?'

'মানুষ— যারা সমানে মৃত্যুকে কিনে নিচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে।'

নন্দখুড়ো থমকে যান দাসসাহেবের কথার তাৎপর্য বুঝতে। তারপর আবার শুরু করেন, 'ওই সস্তার জমির খোঁজ করতেই একদিন এলেন গাণ্ডীব পেরিয়ে ব্রতগঞ্জে। এক ফসলি চাষের জমি কিছু কিনতে গিয়ে টের পেলেন এখানকার অর্থনীতির। পাকা মাথা। বুঝে গেলেন সুদের কারবারে মধু কত! এখানেই পাকা বাড়ি করলেন। সংসার পাতেননি। তাই মেয়েমানুষ আনতে হয়। আগে আমি সাপ্লাই দিতাম। এখন দিচ্ছে এক মাসি— রেখা পুরকায়েত। ভগবান যে কেন এরকম মানুষের মাথাতেও হাত রেখে দয়া দেখান, বুঝি না।'

নন্দখুড়ো দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

দাসসাহেব খুড়োর কাঁধে হাত রেখে

বললেন, 'বিজয় বর্মনের কারবার আমি বন্ধ করব। গরিব চাষিদের যজমান হবার সুযোগ সে এবার হারাবে।'

ব্যাঙ্ক অফিসারের এই কথার অর্থও নন্দখুড়ো ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।'

শিখর সেনগুপ্ত আবার স্বল্পস্থায়ী বিরতি টানলেন। তাঁর বলবার গুণে শ্রোতারা বেশ প্রভাবিত। সুদখোর বিজয় বর্মনের মাথায় কীভাবে বজ্রাঘাত নেমে আসে, তা শুনতে উপস্থিত সকলেই যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব। বয়স্ক বক্তা অবশ্য উঠে গিয়ে টয়লেটে ঢুকলেন। ফিরে আসতে দেরি হলো। আবার একটা সিগারেটও ধরালেন। কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে রূঢ়ভাবে লম্বা সিগারেটটাকে অকালে খতমও করে দিলেন। তারপর কিয়ৎক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। সম্পাদকের মুখের দিকে চেয়ে হালকা হাসি হেসে বুঝি পাখির ডানায় ভর করে আবার এসে নামলেন ব্রতগঞ্জে। 'ব্যাঙ্কের হেড খাজাঞ্জি সাহেব অতঃপর একদিন গিয়ে ঢুঁ মারলেন একেবারে খোদ বিজয় বর্মনের নিবাসে। ব্রতগঞ্জের লাগোয়া বেড়াবেড়ি গাঁয়ে প্রায় এক বিঘে জমি নিয়ে মস্ত দোতলা বাড়ি। অথচ তিনি নাকি একা মানুষ।। না, ঠিক একা নন। আছে আরও দুজন— প্রথমজন রেখা মাসি, এমন চেহারা যেন মনে হয় এক বয়স্কার জীবন্ত মামি। অন্যজন নফর-কাম-গার্ড সুখরাম বাহাদুর। প্রৌঢ় নেপালি। নাক বোঁচা, ঠোঁট ঝোলা, চোখ পিটপিট। দেখলেই মনে হবে খুব দায়িত্বশীল। যখন তখন ভর্ৎসিত হতে রাজি নয়।

'বর্মনবাবু আপনার বাড়িখানা কিন্তু দারুণ।' — দাসসাহেব বললেন।

বিজয় বর্মনের মুখে রহস্যময় হাসি, 'আমার ন্যায়বোধ গভীর, স্যার। তাই এই বাড়িটাকে আমি একার বলে মনে করি না। এখানে আছেন এক অনাথা বৃদ্ধা রেখামাসি। আমার ভালোমন্দ দেখেন। আর একজন মালিক সুখরাম। আমার পাঁচখানা সিন্দুকে রয়েছে গরিব ও ভাগচাষিদের যত সোনার গয়না, সব পাহারা দেয় ও একা। একাই ও রুখে দিতে পারে একদল ডাকাতকে। সে আস্থা আমার আছে। আপনাদের ব্যাঙ্কে লকার ভাড়া নিয়ে যারা নিজেদের গয়না রাখে, তারা তো আমার কাছে রাখবে না। আমার কাছে যারা নিজেদের সম্পত্তিকে নিরাপদ রাখে, সমাজে তাদের স্ট্যাটাস আলাদা, এখানকার নিয়মনীতিও তাই আলাদা। এখানকার ভালোবাসার উষ্ণতা আলাদা, বহুদিনের ঐতিহ্য। তাই না?'

রেখামাসির দিকে একবার তাকিয়ে মাননীয় আগন্তুককে নিজের অট্টহাসিও শোনালেন। চড়া সুদের দাপুটে কারবারি বিজয় বর্মন। এমন হাসি, যা দিনরাত এক করে ছাড়ে, যদিও কপালের আড়াই ভাঁজের জটিলতা মুছে যায় না।

দাসসাহেবকেও ওই মুহূর্তে চেষ্টা করতে হয়েছে নিজের মুখ বিকৃতিকে আটকাতে। রেখামাসি মুখলগ্ন কাপড়ে হাসি চাপতে চাপতে উঠে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে চা বানাতে। বিজয় বর্মন এর পরে আরও কিছুক্ষণ এমন মেজাজে গল্প করেছিলেন যেন স্টেজে উঠে নৃপতির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। হয়তো তখন দাসসাহেবের মনে হচ্ছিল, উঠে গিয়ে রক্তশোষকটার গালে একটা চড় কষাতে পারলে শান্তি পাওয়া যেত। তাঁর ঘৃণা-ক্ষোভ যে কতটা, তা বোঝা গেল যখন অনেক অনেক জবরদস্তি করেও বর্মন সেদিন ব্যাঙ্কের মাননীয় ক্যাশ অফিসারকে এককাপ চাও খাওয়াতে পারলেন না। আচরণে অফিসার অবশ্য বেমানান হননি। বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরের দিকে তাকালেন। আকাশের হালত সুবিধার নয়। কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। আলপথ ধরে বেড়াবেড়ি থেকে যখন ব্রতগঞ্জে ঢুকলেন তখন শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। এক ফুঁয়ে কে যেন নিভিয়ে দিল সূর্যলণ্ঠনকে। একেবারে গাড়লের মতো ভিজছিলেন। আর ঠিক এই সময় একজন প্রায় ছুটে এসে তার মাথায় ফুলকাটা ছাতা মেলে ধরলেন। কে? তিনি অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী। দু'জনই নির্বিবাদে ভিজছেন। দু'জনই পা পিছলে একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরছেন। জলে কাদায় রোমাঞ্চকর মাখামাখি। দুজনে এক হয়ে যেন একটা ছোট জেলে নৌকো— গাণ্ডীবের স্রোতে নিজেদের আর সামলাতে পারছেন না। উপোসি অমল দাস যে আদতে কতটা ক্ষুধার্ত তার কিছুটা অন্তত টের পেলেন স্থানীয় কলেজের মাননীয়া অধ্যাপিকা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে দুটো ছবি— সিভিল ইঞ্জিনিয়ার স্বামী এবং কলেজে পাঠরতা কন্যা। কাদায় মাখামাখি তাঁদের শকল সুরত যাচ্ছে বদলে। বেইমান নয়। তাঁরা দুজন যে একেবারে ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা।'

লেখক সেনগুপ্ত আবার সিগারেট ধরালেন। পরপর কয়েকটা সুখটান দিলেন। পুনরায় শুরু হলো তাঁর গল্পের তুরগ গতি, 'সেই যে বিপন্ন মুহূর্ত, তার হাত থেকে দুজনকে রক্ষা করতে একটা লোক কিন্তু ছুটে এসেছিল আরও একটি বড় মাপের ছাতা নিয়ে সে একজন নিতান্ত গরিব চাষি। সে মিনতি করে করে বলেছিল, 'আপনারা এখন আমার কুঁড়েতে একটু আশ্রয় নিন। পরে বৃষ্টি থামলে আপনাদের আমি পৌঁছে দেব।'

অধ্যাপিকা রাজি না হলেও ক্যাশ অফিসার কিন্তু সাগ্রহে ঢুকে পড়লেন চাষির কুঁড়েতে। চাষির বউ আনন্দে ও সঙ্কোচে প্রথমে জড়সড় হলেও পরে শ্রদ্ধায় বিভোর। চাষির নজর কিন্তু যুগপৎ ভীরু ও খর— সাহেবকে নিয়ে তার এই ঘরে ঢোকাটা মহাজন বিজয় বর্মন দেখে ফেলেননি তো? দেখলে কী যে সব

কুৎসিত মন্তব্য করবেন, ভাবলে লজ্জায় ও অসহায়তায় মাথা কাটা যায়।

দাসসাহেব যার কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকলেন, সেই লোকটি কিন্তু এক সময়ে ভাগচাষির পর্যায়ে ছিল না। তার নিজের নামে বিঘেতিনেক ধানি জমি ছিল। সেই জমিতে উন্নত মানের ধানচারা লাগাবে বলে বিজয় বর্মনের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। তখন বর্মনের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছিল গুটিকয়েক সোনার গয়না, ওজন যাদের কমসেকম নব্বুই গ্রাম। পাকা ফসল মাঠে নাচতে শুরু করে। স্বাচ্ছল্যের প্রায় সান্নিধ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল এই মেহনতি চাষি শম্ভু গুছাইত। কিন্তু তাঁর পরিশ্রম, আনন্দ, স্বপ্ন সবই যেন খামোকা। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন বিজয় বর্মন। 'ও শম্ভু, তোর গয়নাগুলি এবার ফেরত নিবি না?' বলতে বলতে ঘরে ঢোকা, সটান বিছানায় হেলান দিয়ে বসা।

আট ভরির ওপর সোনার গয়না। মহাজনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে ধানের গোলার অর্ধেকটাই শেষ। শম্ভু ও তার স্ত্রীর দুচোখে বিভীষিকা। সন্তান দুটোও কোথায় মুখ লুকোবে, বুঝে উঠতে পারছে না। বছরের বাকি দিনগুলির খোরাকি হয়তো রইল মড়াইতে, কিন্তু পরের মরসুমে চাষের কাজে মাঠে নামবার আগে রেস্তর ব্যবস্থা করতে শম্ভু আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই বিজয় বর্মনের দুয়ারে পুঁটলিভর্তি সোনার গয়না নিয়ে। চলল এরকম চারটি বছর। তারপর এই ধারাবাহিকতায় ছেদ টানে চাষা। তিন বিঘে জমিই বেচে দিয়ে সে এখন ভাগচাষি। অন্যের জমি চষে যা পায়, কোনোরকমে পেট চলে চারটি প্রাণীর। গয়না নিয়ে আর দাঁড়াতে হয় না সুদখোরটার সামনে। উপরন্তু জমি বিক্রির চল্লিশ হাজার টাকা এখন স্থানীয় ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত— বছর শেষে সুদ যা পায়, পুজোর সময় জামাকাপড়ের দাম উঠে আসে। দরকার নেই বাড়িতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের। দরকার নেই কোনো বাড়তি শুদ্ধাচারের।

শম্ভু গুছাইতের মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন দাসসাহেব। সেই রাতে ঘুম আর আসতে চায় না। অধ্যাপিকা মিসেস চক্রবর্তীর উষ্ণ স্পর্শের চেয়ে গুছাইতের কথাগুলি যেন অনেক বেশি উত্তেজক। এক হতভাগ্য চাষির বিলাপ সমানে বাজছে তাঁর কানে। পরেরদিন অফিসে গিয়েই বোথ ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট প্রেসার ক্রিয়েট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ওপর। 'স্যার, একটা ব্যাঙ্ক তার একটা ব্রাঞ্চ ওপেন করল। অথচ সেই ব্রাঞ্চ থেকে কোনো ঋণ দেওয়া হলো না প্রথম থেকেই। দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড ইমপ্যাক্ট। আই প্রোপোজ, এবার থেকে এই ব্রাঞ্চ থেকে আর কিছু না দেওয়া হোক, গোল্ড লোন চালু হোক। দেখবেন, শুধু ওই গোল্ড লোন দিয়েই এই ব্রাঞ্চ এক দেড় বছরের মধ্যে প্রফিটে চলে আসবে।'

শুধুমাত্র দাসসাহেব নন, এই প্রপোজালে যেন নেচে ওঠেন ব্রাঞ্চের প্রতিটি স্টাফ, মায় সিকিউরিটি গার্ড নিতাই সরকারও হাতের বন্দুকটা ঠুকে নিজের সমর্থন জানালেন। কিন্তু যত অনাগ্রহ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার গজেন্দ্র ব্যানার্জির। তাঁর ধারণা, একটা কাজ বাড়ালে পায়ে পায়ে আরও পাঁচটা দাবি এসে পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে। এরপর স্লোগান উঠবে, ডি আর আই লোন দেওয়া হোক। তারপর রিজিওন্যাল ম্যানেজারের ভারী গলায় আওয়াজ উঠবে, — হোয়াই নট ক্যাশ ক্রেডিট? তারপর এম এম আই লোন। তারপর অবশ্যই হাউস বিল্ডিং লোন..। অসম্ভব! আরে মশাই ব্রতগঞ্জ একটা এক্সট্রিম ডিফিকাল্ট সেন্টার। এর দুদিকে নদী, একদিকে সমুদ্র। ভেরি ব্যাকওয়ার্ড রুরাল এরিয়া। নো ইলেকট্রিসিটি, নো কমিউনিকেশন। এখান থেকে বের হতে হলে প্রিমিটিভ ফেরিবোট ধরতে হয়। মেয়েদেরও লজ্জা ইজ্জত ভুলে গিয়ে মাঝিদের কাঁধের ওপরে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। এরকম জায়গায় পোস্টিং মানে তো সিভিয়ার পানিশমেন্ট। কোনো রকমে দেড়-দুবছর কাটিয়ে স্বস্থানে ফিরে যেতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস। এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে দাসসাহেব কোন আহ্লাদে গোল্ড লোন চালু করতে চাইছেন? আপনি কী মশাই দিনভর রাতভর কেবল এই ব্যাঙ্কের কাজ নিয়েই থাকতে চান?'

দাসসাহেব জানতেন, মি: গজেন্দ্র ব্যানার্জি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেবেন না। যে মানুষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্ডারকে পাত্তা দিতে চান না, তাঁর কাছ থেকে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট দূরের কথা, ন্যূনতম সহনশীলতাও প্রত্যাশা করা যায় না। তবে তিনিও অমল দাস। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যতই দুর্বলতা তাঁর থাক, অনেক মানবিক দায়িত্ববোধ তাঁর মগজে কিন্তু প্রচণ্ড তাপের সঞ্চার করে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মুখের দিকে চেয়ে স্বরে ওজস্বিতা এনে বললেন, 'একটা ব্যাঙ্কের গণ্ডায় গণ্ডায় অনেক মূল্যবান স্কিম থাকে। আমি তো মাত্র একটা চালু করতে আপনার অনুমতি চেয়েছি। তাও সম্পূর্ণ মানবিক আদর্শের খাতিরে। স্যার, এই ব্যাঙ্কটা কিন্তু সরকারি। দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। সামাজিক দায়িত্বও তার অনেক। বিশেষত এটা হলো একটা ভিলেজ ব্রাঞ্চ। এখানে অন্য কোনো ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ নেই। তাই এই গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবার দায় অনেকটাই এসে পড়ে আমাদের কাঁধে। আমরা যদি সেই দায় ঝেড়ে ফেলতে চাই, সেটা হবে

With Best Compliments From :

MAKAIBARI TEA & TRADING CO. PVT. LTD.

Ph. No. 2248 6017/ 4437/4227/9091 # Fax No. 2243 0177

Web. www.makaibari.com # E-mail : info@makaibari.com

Regd. off.

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhavan, Kolkata - 700 001

Garden :

MAKAIBARI TEA ESTATE

Pankhabari Road, Kurseong, Dist. Darjeeling, West Bengal - 734 203

Enjoy the magical mystical herb, that warms the heart and soul with the Spirit of Makaibari.

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

অপরাধ। স্যার, আপনি চারপাশটা একবার ঘুরে দেখুন। বুঝতে পারবেন, এখানকার গরিব চাষিরা কীভাবে শোষিত হচ্ছে, মাত্র চারজন সুদখোরের দ্বারা। সেই চারজন সুদখোরের নাম বিজয় বর্মন, সেলিম জাহাঙ্গির, গণপতি সরকার এবং নাসির-এ-আলম। এরা একজন আর একজনের পরিপূরক। থানার ডিউটি অফিসার তাঁদের খাতির করেন। বিডিও শরদিন্দু পাল সমানে তাঁদের তোল্লা দেন। ক্ষমতাসীন দলের পঞ্চায়েত প্রধান মকবুল হাকিম ওদের কাছ থেকে কত কী পান, তার হিসেব আর কে রাখে? এককথায় হিয়ার দিস ফোর পারসনস্ আর ভেরি আর্জেন্টলি ভি আই পি। আমি যা বলছি, তা নির্ভেজাল সত্য। তিলকে তাল বানাবার কারিগরি আমার জানা নেই।'

দাসসাহেবের কথা সাজানোতে এলেম যথেষ্ট। ঘোরানো চেয়ারে আধপাক ঘুরে যে ভাবে বলছেন, ব্রাঞ্চের আবহাওয়া বদলাতে শুরু করে। সামনে রয়েছে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি নিয়ে লেখা একখানা পৃথুল গ্রন্থ। মলাটে বড় বড় হরফে মুদ্রিত 'বুক অফ ইন্সট্রাশনস্'। গভীর প্রত্যয়ে ওই বইয়ের কয়েকটি পাতা পড়েও শোনালেন তরুণ ক্যাশ অফিসার, বাংলায় যাদের মর্মার্থ—... সোনার গয়নার কিন্তু সবটুকুই সোনা নয়। সেখানে খাদ থাকবেই। বেস মেটাল হিসাবে থাকে অন্য ধাতুও। অনেকের গয়নাতে আবার পাথর-টাথর ইত্যাদিও বসানো থাকে। ওইগুলির ওজন কিন্তু আন্দাজ মতো মার্জিন হিসাবে বাদ দিতে হবে। এরপর প্রতি দশগ্রাম খাঁটি সোনার বন্ধকি মূল্য হিসাবে ঋণগ্রহীতার হাতে টাকা তুলে দেওয়া।...

এর সঙ্গে দাসসাহেব আরও যা যোগ করলেন, তা এইরকম— ব্যাঙ্ক যত টাকা ঋণ হিসাবে দেবে, তার পরিমাণ সচরাচর সুদখোরদের দ্বারা প্রদত্ত টাকার বেশিই হয়ে থাকে। আর সুদ? সেখানে তফাত শুনলে যে কোনো মানুষ চমকে উঠবেন। আঁতকেও উঠতে পারেন। ব্যাঙ্ক সুদ নেবে বছরে একশো টাকার ওপর ১২ টাকা। আর সুদখোররা নিয়ে থাকে একশো টাকার উপর প্রতি মাসে ১০ টাকা। অর্থাৎ বছরে একশো টাকার সুদ একশো কুড়ি টাকা। আরও একটা মহত প্রভেদ রয়েছে। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ঋণী নিজের সুবিধা মতো টাকা জমা দিয়ে আসলের পরিমাণ কমিয়ে সুদের অঙ্কেও হ্রাস ঘটাতে পারেন। সুদখোরদের বেলায় এই সুবিধা নাস্তি। সুদ নিয়মিত দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আসল পরিশোধে ওসব কিস্তিফিস্তি চলবে না। একসঙ্গে সব টাকা দিয়ে গয়না ফেরত নিয়ে যাও।

অমল দাস যেন একটি ভাষণ শেষ করলেন। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের দুই স্টাফ অনিল জানা ও শক্তি কর্মকার হাততালি দিয়ে ওঠায় গজেন্দ্র ব্যানার্জির স্নায়বিক বিচলন গেল বেড়ে। কেন যে এরা লোকের উপকার করতে অমন প্রলুব্ধ, বুঝে উঠতে পারছেন না। তবুও শেষ অবধি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে আর প্রকাশ্যে টেনে না এনে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দাস সাহেবই সামলাবেন। আমি রিজিওন্যাল অফিসে চিঠি পাঠাচ্ছি। সেই চিঠির বয়ানও তৈরি করলেন খাজাঞ্জিবাবু মিস্টার অমল দাসই। আর চিঠিটা টাইপ করলেন উৎসাহী স্টাফ অনিল দাস। চিঠিটা পেয়ে রিজিওন্যাল ম্যানেজার হাঁফ ছাড়লেন। যাক, এতদিনে ব্রতগঞ্জের ব্রাঞ্চটা ঋণ দেবার পথে হাঁটা শুরু করল। অমল দাস আশা করেছিলেন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ব্যানার্জি এবার ব্রাঞ্চ থেকে গোল্ড লোন দেবার কথা জানিয়ে একটা অন্তত বাংলা ও ইংরেজিতে নোটিশ টাঙিয়ে দেবেন। কিন্তু এখানেও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ভূমিকা নাস্তি। ইদানীং সই-সাবুদ করতে গেলেও লোকটার হাত কাঁপে তিরতির করে। সব সময়েই প্যাঁচে পড়ে যাবার ভয়। ব্যাঙ্কের অন্য অনেক কাজেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সমান্তরাল হয়ে উঠছেন দাসসাহেব। তিনি ওই প্রস্তাবিত গোল্ড লোন দেবার বিষয়েই এরপর যা করলেন এবং যে ভঙ্গিমায় করলেন তা কিন্তু অভিনব। সচরাচর কোনো ব্যাঙ্কের শাখা এ রকমটি করে না। ঠিক ভেল্কি না হলেও বিস্ময়ের অবকাশ বিলক্ষণ। অমল দাস ব্রতগঞ্জের বিখ্যাত রামসীতা মন্দিরের বিশাল চাতালে বিডিও সাহেবের সভাপতিত্বে রবিবার এক গণসমাবেশ আয়োজন করে বসলেন। স্থানীয় কেস্টবিস্টুরা তো বটেই, ভিড় জমালেন ব্রাঞ্চের ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা এবং তাবত কৃষিজীবীরা। আরও যা লক্ষণীয়, দাস সাহেবের অনুরোধে বা ইঙ্গিতে ওই মঞ্চে উঠে এলেন অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীও। একজন অতি বৃদ্ধ কৃষক তাঁর নাতিপুতিদের নিয়ে ভিড় ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে বসে পড়লেন। সেই ছবিটা হয়তো আজও ব্রতগঞ্জের অনেক মানুষের স্মৃতিতে ফসিল হয়ে আছে। লোকাল থানা অফিসার-ইন-চার্জ দুজন লাঠিধারী পুলিশকেও দাঁড় করিয়ে দিলেন। এককথায় বড় পোক্ত বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে লোকাল মানি লেন্ডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্যাঙ্কের হেড ক্যাশিয়ার অমল দাস। অথচ ঠিক মঞ্চ বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নির্মিত হয়নি। তৈরি হয়েছিল কয়েকজন মাননীয় এবং এক মাননীয়াকে নিয়ে একটি বিশেষ বৃত্ত। সভায় আসনের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় প্রতিটি বসার স্থান যেন মিউজিক্যাল চেয়ার। একজন উঠে দাঁড়ালেই তাঁর স্থানটি বেদখল হবার সম্ভাবনা।

সভার তিন দিন আগেই শাখা প্রবন্ধক

গজেন্দ্র ব্যানার্জি ক্যাশ অফিসারকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলেন, তিনি মরে গেলেও ওই সভায় যাবেন না। তা শুনে তন্মুহূর্তে দাসসাহেব বলেছিলেন, যাবেন না! রবিবার। অফিস নেই। বাড়িতে শুয়ে বসে বিশ্রাম নেবেন! ব্যাঙ্কের হয়ে যা করার আমিই করব এবং সেই মেহনতের বদলে কোনো রোজগণ্ডার দাবিও নিশ্চয় করব না।'

সরস গলায় ধারালো বিদ্রূপ।

তবুও সভার দিন দেখা গেল, প্রৌঢ় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাঁর কোয়ার্টারের ছাদে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর বায়নাকুলার রেখে দূরবর্তী সভাটার একটা মাপ নেবার চেষ্টা করছেন। ঠিক কুপিত বলা যাবে না। আবার রোমাঞ্চিতও নন। ঝটিতে বুকের পাটা আরও ছোট হয়ে আসে। এলেম আছে বটে ব্রাঞ্চের ক্যাশ অফিসারের। অন্য কোনো ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হলে কৃতার্থ বোধ করতেন নির্ঘাত। সেই মুহূর্তে গজেন্দ্র ব্যানার্জি ঠিক করলেন অমল দাসের সার্ভিস রেকর্ডকে তিনি কিছু বাছাই করা শব্দে ঝকঝকে করে তুলবেন।

কিন্তু গজেন্দ্র ব্যানার্জি সেটা আর করতে পারেননি। কেন পারেননি, সেটা আমি আপনাদের পরে বলছি।'

লেখক বক্তা আবার বিরতি নিলেন। নিজস্ব ভঙ্গীমায় পুনরায় সুখটান। একা তিনি নন। উপস্থিত সকলেই। পোড়া নিকোটিনের গন্ধ বারংবার চেষ্টা করে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে নিতে। সকলকে হতচকিত করে স্বপ্নময় ঘোষ জানিয়ে দিলেন, 'সেনগুপ্তদা, পত্রিকায় ছাপা হবার পরই এই লেখাটাকে কোনো প্রকাশককে দিয়ে বসবেন না। আমি বাংলার প্রকাশনা ভুবনেও আত্মপ্রকাশ করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে হালকা হাততালি।

শিখরবাবু বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়ি রেখে তিনবার নীচের দিকে চিবুককে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন।

আবার শুরু হলো কাহিনি, 'বক্তৃতা, বক্তব্য পেশ করে চেয়ারে এসে বসবার দু'মিনিটের মধ্যে সুদেষ্ণার সুকৌশলে পাঠানো একটি চিরকুট অমলের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি তখনই সেটা পড়ে ফেললেন না। পড়লেন একটু সময় নিয়ে, সুযোগ বুঝে।

অধ্যাপিকার হস্তাক্ষরও চমৎকার—

'.... ক'দিনের জন্য আমার কর্তা আজ সকালে কাটোয়া গেলেন তাঁর অসুস্থ দিদিকে দেখতে। একা নন। মেয়েকেও নিয়েছেন সঙ্গে। কেবল যেতে পারলাম না আমি। গুচ্ছের পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে। একবার কাটোয়া গেলে তো সাতদিনের আগে ফেরা মুশকিল। তা এই সুযোগে আমরা কী পরস্পরের 'খাতা' দেখে নম্বর দিতে পারি না? সভা শেষে চলে আসবেন বলে আশা রাখি। ব্রতগঞ্জের খেজুরবাগে একটিও খেজুর গাছ নেই। আছে কেবল একটি পোক্ত দালান, 'চক্রবর্তীভিলা'। আমি গিয়েই রান্নার মাসিকে ছুটি দিয়ে দেব। দাসসাহেব আসবেন যে!

সভা শেষ। তারপরও কথোপকথন চলল প্রায় আধঘণ্টা। তারপর একটি দাঁড়টানা নৌকোর মতো অমল দাস প্রথমে গেলেন ব্যাঙ্কের চৌহদ্দিতে। সেখানে কেউ নেই। তারপর নিজের কোয়ার্টারে। নতুন জামা, নতুন প্যান্টে এমন বিদেশি সেন্ট ঢাললেন যে সুগন্ধে যেন সুষুপ্তির আমেজ তাঁকে অধিকার করে নেয়। খেজুরবাগের চক্রবর্তী ভিলা ততক্ষণে ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়া। সেখানে কাছি দিয়ে বাঁধা ডিঙ্গির মতো দুলছেন সুদেষ্ণা।...

প্রায় ঘণ্টাতিনেক বাদে ভিলা ছেড়ে বের হয়ে আসছে একটি দশাসই দেহ সুখ-শ্রান্তিতে চুরচুর অবস্থায়। বয়স্কা অভিজ্ঞা নারীই যে প্রকৃত মহার্ঘ অনুভূতি এনে দিতে পারেন, এতদিনে অমল দাস তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। বিদায় নেবার আগে লণ্ঠনের আলোটাকে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। পরিতৃপ্ত, দীপ্ত, উন্মুক্ত বক্ষদ্বয়, চক্ষু, নিতম্ব তখনও অমানুষিক প্রত্যাশায় উন্মুখ। কিন্তু দাসসাহেব যে প্রকৃতই শ্রান্ত। টালমাটাল। উত্তর-পশ্চিম বুঝি ঠাহর করতে অসমর্থ।

পরেরদিন ব্যাঙ্কের দাসসাহেব সম্পূর্ণ পূর্ববৎ। কার ক্ষমতা যে তাঁকে মূল লক্ষ্য থেকে বেহাসিল করে ছাড়বে। শুরু হয়ে গেল ব্যাঙ্কে সোনার গয়না বন্ধক রেখে ঋণ নেবার হিড়িক। দাসসাহেব বেলা এগারোটা বাজলেই এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ঝাঁপি খুলে বসেন। প্রথম দিনই ব্যাঙ্কের দেওয়াল নিজের হাতে লেখা একখানা বাংলা নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছেন—

'সোনার গয়না বন্ধক রেখে ব্যাঙ্কের এই শাখা সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে দুপুর দুটো অবধি উপযুক্ত প্রার্থীকে ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শর্তাদি সরল। স্বয়ং ক্যাশ অফিসার বুঝিয়ে দেবেন। সুদও অনেক কম। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সর্বাগ্রে শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিয়ে যান।'

এক নোটিশেই কেল্লা ফতে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে দর্শনার্থী তথা আবেদনকারীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। হরেক বাক্যের বিবিধ বিন্যাসে এমন শব্দতরঙ্গ, যা বাইরের সবেধন নীলমণি টিউবওয়েলের আর্তস্বরকেও মাথা তুলতে দিচ্ছে না। আবেদনপত্র নিয়ে যারা ভিড় করছেন, তাদের সকলেই যে পুরুষ, তা নয়। মহিলারাও আছেন। যাদের চুড়ির শব্দ শুনতে পান ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। মি: গজেন্দ্র ব্যানার্জি যতই

বিরক্ত হন না কেন, হেড ক্যাশিয়ার অমল দাসের বিচারে এরা যথার্থই গরিব ও শোষিত। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রকৃত সজ্জনও। এদের জীবনে অলসতা নেই, কিন্তু দারিদ্র্য বড় প্রকট। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন, কিন্তু খাদ্যে পুষ্টির অভাব। চুপিচুপি নিঃসাড়ে তাই এগিয়ে আসে অন্তর্নীল অকাল মৃত্যু। আমাদের দায়িত্ব ওদের আবেদনে আইন, নিয়মনীতি মেনে ইতিবাচক সাড়া দেওয়া।

এখানকার ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চে সোম থেকে শুক্র সেই এক দৃশ্য। এক একটি শীর্ণ জীর্ণ দেহের কাতর মুখ দর্শনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের তপ্ত শ্বাস এবং নীরবে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া ক্যাশ ডিপার্টমেন্টকে আলো করে বসে থাকা মিস্টার অমল দাসকে। সেই যে চক্রের ঘূর্ণন শুরু, দিনের পর দিন তা ঘুরেই চলেছে। দাসসাহেবের অন্তর্দৃষ্টি গড়ে উঠেছে— লাঙল টানা, জনখাটা, গাড়ভাঙা পরিশ্রমে হাড়সর্বস্ব ছাতি— সব তিনি যেন দেখতে পান। বাঁকা প্রশ্ন তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। অনেক সময় অপরিচিত ঘোলা চোখ অভাবী মানুষটার আবেদনপত্রটি অবধি নিজেই ফিল-আপ করে দেন। বিরক্তি নেই। অপ্রিয় কথাই যেন ভুলে গেছেন, এমন শিষ্টজন। কে কোন এলাকা থেকে এসেছে, কোনো ভেড়ি পথ পার হতে হয়েছে কিনা সেটাও জেনে লিখে রাখেন নিজস্ব

নোটবুকে। সেই নোটবুক যাতে খোয়া না যায়, খুব হুঁশিয়ার। জনস্রোতের মধ্যে কাকে কবে লোন দেওয়া হবে, সেটাও তিনিই ব্যাঙ্কের রেজিস্টারে লিখে রাখেন। ব্যাঙ্কের খাসমহলও জেনে গিয়েছে, এতদিনে ব্রতগঞ্জের ভিলেজ ব্রাঞ্চে একজন অফিসারের মতো অফিসার পোস্টেড হয়েছেন। প্রথমাবধি লোকসানে চলা ব্রাঞ্চ আগামী বছরে নিশ্চয়ই কয়েক কাহন প্রফিট করবে।

দাসসাহেবই খুঁজেপেতে আনিয়েছেন স্থানীয় গহনা ব্যবসয়ী নকুল আঢ্যকে। তিনি কষ্টিপাথরে সোনার গয়নাটিকে ঘষেন। তারপর সেই দাগের ওপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ফোঁটা ফেলেন। আর তারপরই বুঝে যান সোনাটা খাঁটি না বেখাঁটি। খাঁটি হলে আঢ্য সার্টিফিকেট দেবেন। আর যদি খাঁটি না হয়, বেচারি আবেদনকারীর চোখে অন্ধকার, দিশাহারা হয়ে ফিরে যান বাড়িতে। পার কেস আঢ্য ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ টাকা করে পান। সেই টাকা ব্যাঙ্ক তাঁকে দিয়ে থাকে ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে। প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচটি করে গোল্ড লোন। দু-দুটো প্রমাণ মাপের আলমারি প্রায় ভর্তি হতে চলল স্বর্ণালংকারে ঠাসা ছোটছোট কাপড়ের ব্যাগে। প্রতিটি ব্যাগের গায়ে আঠা দিয়ে লাগানো কাগজে লেখা রয়েছে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং বরোয়ারের নাম। আটকে থাকা বিগত অভিজ্ঞতার মুক্তিতে দাসসাহেবের আনন্দ আর ধরে না। সোনায় আছে এক মধুর স্নেহ— যার খোঁজ কম লোকই রাখেন। অতি পবিত্র, যার মূল্যায়ন রুটিন মাফিক হয় না। ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রত্যেক স্বর্ণ ধনীর সম্পর্ক মধুর ও অভেদ্য হয়ে ওঠে। নিরাপত্তা প্রদান যেন ব্যাঙ্কের অন্যতম নিশানা। এরইমধ্যে একদিন জোয়ারে তোলপাড় গাণ্ডীব অতিক্রম করে রিক্সভ্যানে পা ঝুলিয়ে ব্রাঞ্চ ভিজিটে হাজির হলেন খোদ রিজিওন্যাল ম্যানেজার। বছর শেষ হবার অনেক আগেই টেলর পাওয়া গেল এই প্রায় উপেক্ষিত গ্রামীণ শাখাটি প্রথম লাভের মুখ দেখতে চলেছে। কাগজে কলমে না হলে কর্তৃপক্ষের বিচারে ব্রাঞ্চটির স্ট্যাটাসও যাবে বদলে। ঊর্ধ্বতনের ভাবনার জগতে এক জনেরই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তিনি ক্যাশ অফিসার মিস্টার অমল দাস। সেই প্রত্যয়ে ফাটল ধরাবার ক্ষমতা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নেই। রিজিওন্যাল অফিস থেকে যিনিই ভিজিটে আসেন, তাঁর মুখ্য আলোচনা চলে ওই দাসসাহেবের সঙ্গেই। গজেন্দ্র ব্যানার্জির বদলি কিংবা পরবর্তী প্রমোশনের স্বপ্নময় পাপড়িগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কথা বলার ধরনও।

ওদিকে কালেভদ্রে সুযোগ বুঝে খবর পাঠান সুদেষ্ণা। দাসসাহেব ঠিক হাজির হয়ে যান। একজন অন্যজনের জ্যামিতিক নকশা নিয়ে বুঁদ। এরকম সুখকর মধুময় অনৈতিক অভিজ্ঞতার যেন বিকল্প হয় না। দাসসাহেবের প্রাণশক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। সকালে পান্তা খেয়ে ব্রাঞ্চে ছুটে আসা গরিব কৃষকের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ান। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দাঁতে দাঁত ঘষে একটা ছোট্ট উচ্চারণই করেন শুধু ‘হারামি’। বাড়িতে তাঁর ঘোর অশান্তি। আর কতকাল আমাকে পচতে হবে এখানেও মিসেস তড়পান। সংসার তখন আর সংসার থাকে না। হয়ে ওঠে অশান্তির কাছারিবাড়ি। দাসসাহেবের বউ নেই। অবৈধ সোহাগ আছে। তাই নিবিষ্ট মনে ব্যাঙ্কের কাজ। উপকৃত চাষিদের সঙ্গেই মাঝেমধ্যে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে বসেন। নবান্নের পুণ্যাহে ওই সমস্ত লোকদের কুঁড়েতেই আমন্ত্রিত হয়ে চলে যান। নিষ্কর জমিতে ধান ছাড়া আর কোনো ফসলের চাষ হতে পারে কিনা, জেনে নেন। চাষার বউ আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকিয়ে থাকেন, যেন সাক্ষাৎ দেবতাটির দিকে।’

টানা বলে যাবার পর আবার একটু বিরতি টানলেন লেখক। বেচারির গলার আওয়াজেও যেন কিছুটা বিকৃতি এসেছিল। চোখ বন্ধ করে এক গেলাস জল খেলেন। উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে এক চিলতে মুচকি হাসিও হাসলেন। আবার শুরু করলেন বলতে, ‘এবার এই গল্পের ঈশাণ কোণে মেঘ জমেছে। অর্থাৎ কাহিনি এবার পৌঁছে যাবে ক্লাইমেক্সে। অমল দাসের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। যেখানেই যান, যত্নআত্তির অভাব নেই। একাধিক সুন্দরী, আহ্লাদী, সঙ্গকামী যুবতীরা তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। তবে দাসসাহেব যেন মরে গেলেও সরে আসতে পারবেন না শ্রীযুক্তা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর কাছ থেকে। ইতিমধ্যে সুদেষ্ণা-কন্যা বি এস সি পাশ করে ভুবনেশ্বর চলে গিয়েছে মেডিসিন বিশেষজ্ঞা হতে। আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার স্বামীও প্রমোশন পেয়ে পোস্টেড হলেন খড়্গপুরে। মাসে দুবারের বেশি গাণ্ডীবকে টপকে ব্রতগঞ্জে পা রাখতে চান না। অধ্যাপিকা চক্রবর্তীও কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। সুতরাং...।

গোল্ডলোন দিতে দিতে বারোয়ারদের নিকট সুদের নোটিশ পাঠাতে পাঠাতে, হাই ডিনোমিনেশনের নোট— প্যাকেট গুনতে গুনতে দাস সাহেবের সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা অবধি যতই কালঘাম ছুটুক, তিনি তাঁর উৎসাহ ও প্রশান্তিকে ধরে রাখতে পারছেন। প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে চলে যান গাণ্ডীব নদীর কিনারে। এক একদিন নাছোড়বান্দা সুদেষ্ণা খুব সেজেগুজে অন্য এক রাস্তা ধরে ঠিক চলে আসেন যথাস্থানে। অমল দাসের হাতের পাতায় নখ দিয়ে যেন ছবি

আঁকেন। অন্ধকার ঘনালে ডিঙ্গি ভাড়া করে চলে তাঁদের জলবিহার। তবে বিষয়টা আর অনাবিষ্কৃত থাকল না। কিন্তু একজন জনপ্রিয় তরুণ ব্যাঙ্ক আধিকারিকের সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্কা নামী অধ্যাপিকাকে জড়িয়ে কেচ্ছা ছড়াতে কেউই ঠিক রাজি নন। অধিকাংশ জনেরই ধারণা, পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভিকর্ষে তাঁরা একত্রিত হন— যেখানে কামনার লেশমাত্র নেই। কেবল চার সুদখোরের ব্যাপক প্রয়াসে একটা হালকা গুজব কখনো ভেসে উঠলেও অচিরেই সেটা লীন হয়ে যায়। দাসসাহেবের জনপ্রিয়তায় যতটুকু টান ধরে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যখন আসেন, পরিবেশের কোনো হেরফের খুঁজে পান না। তাঁদের আদরের মেয়েও এসেছিল ভুবনেশ্বর থেকে পুজোর সময়। বাবা ও মায়ের জন্য প্রচুর জামাকাপড় এবং বই কিনে এনেছে। পুজোর মণ্ডপে ওই তিনজনের চোখের সামনে আরতি করার নামে দাসসাহেব এমন তাণ্ডব করলেন যে চক্রবর্তী পরিবারের তিন সদস্য সদস্যাই হাসি ও হাততালির ফোয়ারা তুললেন। বিজয়ার দিন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কার দাসকে বাড়িতে ডেকে এনে কেবল কোলাকুলি করলেন না, স্কচের একটি খোকা বোতল শেষ করলেন দুজনে মিলে। সুদেষ্ণার চোখ ছলছল দেখে দাসের চিন্তাভাবনা যুক্তিনিষ্ঠা একলাফে এমন এক মগডালে উঠে বসে যার নাগাল সাধারণ মানুষ কোনোক্রমেই পেতে পারে না। দাসসাহেবের কিন্তু খেয়াল করা উচিত ছিল যে, চারজোড়া আগুনে দৃষ্টি তাঁকে প্রতি পলে অনুসরণ করে চলেছে। ব্রতগঞ্জের সুস্থিতির পক্ষেও ওই নজরদারি ছিল বিপজ্জনক। এখন অমল দাসকে নিকেশ করতে না পারলে তাঁদের আত্মিক ও মানসিক শান্তি বলতে আর কিছু থাকবে না। চারজোড়া চক্ষু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করে চলেছে কেবল সুযোগের অপেক্ষায়। তাদের প্রতিশোধস্পৃহা কোনো অলীক কিংবা কাকতলীয় ব্যাপার নয়। এই চারজনেরই লেজে বারবার পা দিয়েছেন ব্যাঙ্কের দাসসাহেব। অনিচ্ছায় নয়, স্বেচ্ছায়। অস্থিরতা নয়, নিরেট স্থিরতা। ইদানীং মুখোমুখি হলে ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। সেই চার কুসীদজীবী— বিজয় বর্মন, সেলিম জাহাঙ্গির, গণপতি সরকার এবং নাসির-এ-আলম। এরা যে মাসিক শতকরা দশটাকা করে সুদ আদায় করে থাকে, সেই তথ্য ব্রতগঞ্জের কে না জানে? মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজান। অথচ ন্যায়ের ঝড়ে উথালপাথাল ঝটকা আর ওঠে না। বিডিও দিলীপ পাল, থানার বড়বাবু কৃপাণ শর্মা, বাজার কমিটির সেক্রেটারি সুখরঞ্জন দলুই, নাটক-পাগল যুবক সুকুমার পাহাড়ি, আমূল পার্টির লিডার ছড়াক্কা হুদা... সব ব্যাটা কেবল সব জানেন না, ওই চার মহাপ্রভুর হাতে তামাকও খান। তেজারতির তেজিদের আসরে ডাক পেলে দিব্যি সময় কাটিয়ে আসেন। যা পারিতোষিক পান, তাতে ক্ষোভ দুঃখ হতাশা বিলকুল ফক্কা। চারজনেরই তালুতে আঁকা এলাকার সকল বাসিন্দার হালহকিকত। যাদের কঠোর লড়াই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, তারাই ছিল চারজনের ভূত ভবিষ্যৎ। আজ সেই ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে ছেড়েছেন ব্যাঙ্কের ওই হামবড়া অফিসার। কোত্থেকে ব্রতগঞ্জে উড়ে এসে তাঁদের কাছা ধরে টানছে সমানে। অথচ ওর নিজের লাইফ নর্মাল নয়। চরিত্রে জং ধরেছে। সময় সময় যে আনমনা ভাব দেখায় বা বড় বড় কথা বলে নিপাট ভালোমানুষ সাজে— সবটাই পাপ লুকিয়ে রাখার কৌশল। চার জোড়া চোখ অনুসরণ তো করবেই।

আর ওই অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী। অভিনয়ে অদ্বিতীয়া। এই সেদিন কী একটা কাজের অছিলায় বোকা স্বামীকে নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। অমল দাসের সঙ্গে কত কী গল্প। হাসাহাসি। আমাদের লোক ঠিক সময়ে ওখানে গিয়ে কান পেতে সব শুনেছে। দাসকে দেবী বলছেন, ভাই। এটা পাপ নয়? এটা অন্যায় নয়?

এটা যদি পাপ না হয়, তাহলে আমরা চারজন যা করছিলাম সেটা মহাপুণ্য। পুণ্যের খাতিরে আমরা পাপকে হটাব।

ওই যে দুজন। বয়স ও অভিজ্ঞতায় ফারাক বিলক্ষণ। কিন্তু দুজনেই বড় গোঁয়ার। বুদ্ধিশুদ্ধি যদি ঠিক থাক, প্রায় সন্ধ্যাতেই তারা এসে হাজির হতেন না গাণ্ডীবের কিনারে। ওখানে চেনাজানার নজরে আসার সম্ভাবনা ষোলোআনা। তাই নদীর পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে চলে যান এমন জায়গায় যেখানে যাত্রীবাহী নৌকোর একপ্রকার জটলা তো নেই, ছোট ভিড়ও তৈরি হবার সুযোগ আসে না। খুব হাওয়া বয়। গাণ্ডীব অদূরে মিসেছে সাগরে। অর্থাৎ জায়গাটা মোহনার কাছাকাছি। জলেরও এমন আছাড়পিছড় যে, কাঁধের লগ্ন গামছা ওড়াতে ওড়াতে কোনো মাঝি সচরাচর ওখানে তার যানকে নিয়ে যায় না। তাই বলে কেউ কি যায় না? যায়। বইঠা ঠেলা মানুষদের মধ্যেও এক আধটা পাগলের দেখা মেলে বৈকি!

তেমনই কোনো পাগলের খোঁজে হয়তো ইত্যবসরে ওই মোহনা ব্যাপদেশে গিয়ে হাজির হলেন দুজনে। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী এবং অমল দাস। মিষ্টি জল যখন নোনা জলে মেশে, তার কারুকর্ম হয়ে ওঠে অনুপম। দাস তাঁর কনুই দিয়ে হাল্কা গুঁতো মারেন চক্রবর্তীর ভরন্ত বুকে। সুদেষ্ণা বদলা নেন আরও স্পষ্টতার সঙ্গে। তাঁরা যে এরকম করেই থাকেন,

সেটা বুঝি দৈবেরই পরোয়ানা। সাবেক কাল থেকে চলে আসছে। সেই মনে দ্বিধা থাকাটাও অনাবশ্যক। হুবহু আপনকার সম্পত্তি। চরিদিক প্রায় শুনশান। কাছের নদী ও দূরের সাগরে চোখ রেখে দাস গেয়ে ওঠেন নজরুলগীতি—

'যে শিবানীর এক রূপ হলাদিনী রাধিকা
যে শিবানী গোলকে রাধিকা
শিবলোকে হর-প্রিয়া
বৈকুণ্ঠে কামলা
বৃন্দাবনে তিনিই শ্রীমতী হয়ে নীল শাড়ি পরি
নীল যমুনার তীরে করিয়াছে লীলা।

সুদেষ্ণার নীল শাড়ি সত্যিই এসময়ে নদীর বাতাসে উদ্দীপ্ত হয়ে ঝাপটা মারে অমলকে। এর ঠিক মিনিট সাতেক বাদে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় মাঝি বাসুদেব বণিকের। একটি ঝকঝকে চটুল ডিঙির চালক সে। বাদুদেব যেন জানে, ঠিক এখানেই প্রেমিক-প্রেমিকারা আসবে এবং তার এই ডিঙিতে চেপে মোহনায় ভাসবে। সেই ডিঙিতে ছই আছে। ছইয়ের তলায় দেহ এলাবার বন্দোবস্ত ইন্টিরিয়ার ডিজাইনিং সমেত।'

শিখর সেনগুপ্ত থামলেন, প্রবীণ প্রাজ্ঞের মুখে শিশুসুলভ হাসির আভা। তবে অচিরে ওই আভা মিলিয়েও যায়। শ্রোতারা আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন ঘটনার পরবর্তী পর্বকে। তাঁরা শুনতে পেলেন কথকের খাদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'একটা কথা কিন্তু অমি হলপ করে বলতে পারি, যথার্থ প্রেম বলতে যা বোঝায়, অমল দাসের মধ্যে তা ছিল না। একাধিক নারীসঙ্গের অভিজ্ঞতা তার ইতিপূর্বেই হয়েছে। প্রকৃত প্রেমের বদলে দৈহিক তৃপ্তিলাভই তাঁকে উতলা করে রাখত। হয়তো এটা সুদেষ্ণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই দেখা গেল, নিছক নির্জনতায় দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁরা বাসুদেব বণিকের ছোট ডিঙ্গিটাকেই মিলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করলেন। ডিঙ্গি চক্রাকারে ঘোরে মোহনার কাছাকাছি এলাকায়। আর নায়ক-নায়িকা দুইয়ের ভেতর প্রেমের ঝড় তুলছেন। বণিকের বাণিজ্যও ভালো হচ্ছে— প্রতিবারে এক থাবা করে টাকা ঢুকছে তার পকেটে। কয়েদিন তো বেশ রাতও হয়ে যায়। এক প্রস্থ হাসি হেসে বাসুদেব বণিক হাত নাড়ে, 'আমি আপনাদের অপেক্ষায় এখানেই থাকব।'

অতঃপর সেই মর্মান্তিক ঘটনা। ব্রতগঞ্জের সর্বত্র আলোড়ন। ব্যাঙ্কের ক্যাশ অফিসার মি: অমল দাস এবং ব্রতগঞ্জ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় লিপিবদ্ধ হলো ঘটনা। একজন জানালেন, ওই দুজনকে সে বাসুদেব বণিকের ডিঙ্গিতে উঠতে দেখেছেন। চুলের মুঠি ধরে বাসুদেবকে থানায় টেনে আনে পুলিশ। সেখানে বাসুদেব সমানে বুক চাপড়ায় আর বলে, 'আপনারা আমার মা-বাপ। উ দুইজন মোর নাও ভাড়া নিয়ে ফুর্তিফার্তা করতেন ঠিকই, কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দেননি। আর আমার নৌকোও ডুবেনি। পাড়ে ওঠার কালে দেড়শো টাকাও দিলেন। মা কালীর দিব্যি..।'

পুলিশি তদন্তে খামতি ছিল না। যেখানে যত সূত্র মিলতে পারে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সবই তারা দেখেছে। অমল দাসের কোয়ার্টারে মিলল ব্যাঙ্কের একগোছা ছোট-বড় চাবি। কিছু এমন সমস্ত সচিত্র অশ্লীল বই— যেগুলি তাঁর দুর্দম কামনার পরিচিতি। অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর আলমারিতে রাশি রাশি শাড়ি, ব্লাউজ এবং এমন একটি গোপন অ্যালবাম, যেখানে কেবল তাঁরই ছবি— যেন এক অপটু অভিনেত্রীর বিভিন্ন ভঙ্গিমা। দুই পাখি গেল কোথায় উড়ে, সোৎসাহে খুঁজতে খুঁজতে পরিশেষে পুলিশ আবিষ্কার করল, গাণ্ডীবের নিকটবর্তী এক প্রায় বনাঞ্চলে একজোড়া নিথর দেহ। কেবল নিথর নয়, পচে গলে দুর্গন্ধময়। সহজেই শনাক্ত হয়— এঁরাই সেই দাসসাহেব এবং অধ্যাপিকা চক্রবর্তী। দাসসাহেবের পকেটে যেমন মানিব্যাগ নেই, মিসেস চক্রবর্তীর দেহেও তেমনি কোনো গয়না নেই। তবে কেবল গুটি কয়েক টাকাটা সিকিটা ইতিউতি ছড়িয়ে আছে। ওই বনাঞ্চলের মালিক কে? আসলে ওটা ব্রতগঞ্জের পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত সিনেমা হল মঙ্গলঘট-এর পিছনটা। মঙ্গলঘট হলঘরের মালিক, পেট্রল পাম্পের ব্যবসায়ী, এলাকার বিশিষ্টজনদের অন্যতম শ্রীযুক্ত ত্রিকাল দে ওই বনজঙ্গল সাফ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলেই মাটিচাপা দেহদুটির সন্ধান মেলে এবং পুলিশ যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ত্রিকাল দের বাসনা হয়েছিল, মঙ্গলঘটকে তিনি আবার জীবন্ত করে তুলবেন। হলঘরটাকে নতুন করে এমনভাবে সাজাবেন যে সপরিবারে ব্রতগঞ্জের লোকেরা আবার এসে ভিড় করবেন। প্রেমিক আসবেন প্রেমিকাকে বগলদাবা করে। কিন্তু সূচনাতেই একী বিপত্তি! একজোড়া পচাগলা দেহ! কী দুর্গন্ধ! গ্রীষ্মেও হিজিবিজি সরীসৃপরা বেরিয়ে আসছে। কানে ঢোকে কাকের কর্কশ ডাক। বাতাসেরও কাণ্ডজ্ঞান নেই। কেবলই বয়ে আনে সেই হুঁশিয়ারি— লাশ! লাশ! একজোড়া। পুরুষ ও নারী। জঙ্গলে লুকিয়ে মাটির তলায় সেঁধিয়ে চলেছে এখনও তাদের সীমাহীন কথোপকথন ও প্রেমালাপ।

পুলিশ আসে। দারোগা আসে। আসে সাংবাদিক। টিভির স্ক্রিনে দেখা গেল, দুটো গলিত শবের ওপর রাজ্যের কাঁটাগাছ।

গলিত শবেরও ময়নাতদন্ত খুব সজাগ ও নিখুঁত। মৃত্যুর কারণ, দু'জনের মাথাতেই নির্মম আঘাত। তালু ফেটে ঘিলু বেরিয়ে আসে। লাশ দুটোকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে সাহস হয়নি। কারণ, সেদিন মোহনায় ঘুরঘুর করছিল অন্তত একগণ্ডা প্রমোদতরী। অনেকেরই চোখে বায়নাকুলার। গাণ্ডীব ও সাগরে ডুবন্ত সূর্য কত হিরে জ্যোতি ছড়াচ্ছে গো! প্রতি মুহূর্তে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলে যায় মনে। খুনি লাশ দুটোকে এনে নিঃশব্দে কবরস্থ করে মঙ্গলঘট-এর জঙ্গলে। এই কাজে হয়তো তার কিছু খুঁত ছিল। হয়তো আচরণেও ছিল অস্বাভাবিকতা। তাই দু'দিনেই দুর্গন্ধ। ক্রমাগত এর বিস্তার ঘটে। অতএব পুনরায় জেরার মুখে সেই সুন্দর ডিঙ্গিটার বইঠাধারী বাসুদেব। এবারে পুলিশের চরম ও চূড়ান্ত রূপ দেখল সে। নব নব প্রক্রিয়ার শাস্তি। শেষমেশ বণিক প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'আমি গরিবদেরও হদ্দ গরিব, হুজুর! অত টাকার লোভ সামলাতে পারি! হুজুর, জীবন যে একটাই।'

'টাকা পেয়েছিস?'— পুলিশি হুংকার।

'পেয়েছি হুজুর! তবে সবটা নয়। অর্ধেক। বাকিটার জন্য এখনও ঘুরছিলাম। ওরা তো একজন নয়। চারজন। এ ওর দিকে আঙুল তোলে। সে তার দিকে। জীবন বর্মন তো আবার ভয় দেখালে আপনাদেরই নাম তুলে। আমি গরিব।—' আর বলা হয় না।

থানার লোকগুলিও নিশ্চুপ। তাঁরাও পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে চলেছেন।'

শিখর সেনগুপ্ত টেবিলে তাল ঠুকে ইঙ্গিতে বোঝালেন, আর এক রাউন্ড চা হোক। সেই সঙ্গে ধূমপান। □

With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

ADMINISTRATION OFFICE :
1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013
Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822
Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779
E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com
Web-site : www.allindiatpt.com
(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.
SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.
SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

পৃথিবীর কোণায় কোণায় অন্ধকার পর্দায় ভাস্বর হয়ে ওঠে বাঙ্গলার নদী, মাঠ, ফুল, পাখি, শহর ও তার গৃহকোণগুলি নিজস্ব গ্লানি ও আনন্দের উপাচার নিয়ে। আবহমান বাংলা ও বাঙ্গালি সত্যজিৎ-এর হাত ধরে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে বাঙ্গালিয়ানার উদ্ভাস

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর তৈরির আগে নিতান্ত কঁচিকাঁচারা কৌতূহলবশত সেখানে গেলেও পরিণত মানুষেরা সেই সূতিকাগার দর্শন সাধারণত এড়িয়েই যান। সেটাই স্বাভাবিক। কেউ কি সুরভিত গোলাপ হাতে পেলে সেই বাগানের মাটি খুঁজতে চায়? সকলেরই অভিষ্ট থাকে সেরা সৃষ্টি কর্মটির রূপ, রস, গন্ধ অনুভব বা উপভোগের। চলচ্চিত্র নির্মাণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেই যৌথ কর্মকাণ্ডকে পর্দায় মানুষের বিচিত্র মানসিক দোলাচলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সহজসাধ্য নয়। একথা বিশ্বের তাবৎ চলচ্চিত্রকার ও বোদ্ধারা বহুবার বলেছেন।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্টের বর্ষণস্নাত দিনটি কিন্তু সে অর্থে একটি গড়পড়তা ছায়াছবির মুক্তি যে নয়, তখন দর্শকরা তা জানতেন না। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় ছবিঘরগুলিতে 'পথের পাঁচালি'র মুক্তি সেদিন বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে দীর্ঘদিনের আদৃত গ্রন্থি ও প্রচলিত ধারা থেকে এনে দিয়েছিল প্রথম 'মুক্তির' আস্বাদ। বাড়িয়েছিল অভিভূত মানুষের সৃষ্টি কর্মটির নির্মাণ পটভূমির ওপর কৌতূহল।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯২৯ সালে। সেসময় সত্যজিৎ ৯ বছরের বালক। আড়াই বছর বয়সে বাবা সুকুমারকে হারিয়ে মায়ের হাত ধরে চলে আসেন দক্ষিণ কলকাতায় (বেলতলা রোডে) তাঁর মামার বাড়িতে। এই গড়পারে, দাদু উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের পারিবারিক ছাপাখানা সুকুমারের অকাল মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ফেলুদা সিরিজের গল্পে মজাদার চরিত্র লালমোহনবাবুকে সত্যজিৎ তাঁর বিশাল পারিবারিক বাসস্থান ও অবোধ শৈশবের সঙ্গে পিতার মহার্ঘ স্মৃতিকে টিকিয়ে রাখতে গড়পারের বাসিন্দা হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই মনে হয়। আজও গড়পার অঞ্চল বলতে একটি বনেদি রক্ষণশীল বাঙ্গালি অধ্যুষিত ছবিই ফুটে ওঠে। সম্প্রতি ৬১ গড়পার লেন নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্রও হয়েছে (সত্যজিতের বাড়ি নয়)। সত্যজিৎ যখন চলচ্চিত্রে তাঁর ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির মহীরূহসম দেহসৌষ্ঠব নিয়ে লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলতেন, সেই barritone কণ্ঠস্বরে স্টুডিও চত্বর সচকিত হয়ে উঠত। এই তিনটি শব্দের জাদুতে সৃষ্ট উপাখ্যান গ্রন্থিত করে তিনি বিশ্ব চলচ্চিত্র জগত অধিকারের স্বপ্ন আজীবন লালন করে এসেছেন। অথচ শুরুটা হয়েছিল নিতান্তই ভিন্ন ধারায়।

দাদু উপেন্দ্রকিশোর স্বাধীনতার বহু আগেই তাঁদের কিশোর সত্য (ময়মনসিং)-এর আদি নিবাস ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন।

গড়পারে বিশাল বসতবাড়ি ও নিজস্ব অননুকরণীয় লেখালিখির সঙ্গে ছাপাখানার ব্যবসাও শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মাত্র ৫২ বছর ও পুত্র সুকুমারের ৩৬ বছর বয়সে অকস্মাৎ মৃত্যুতে মা সুপ্রভা দেবী আক্ষরিক অর্থেই দিশাহারা হয়ে পড়েন। অথচ তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি কম ছিল না। দাদার বাড়িতে এসেও দৃঢ়চেতা সুপ্রভা কিন্তু সংসারে সাহায্য করতে একটি সংস্থায় সূচীশিল্প শেখাবার কাজ নিয়েছিলেন। তিনি সব সময়ই চাইতেন, সত্যজিৎ নিজের পায়ে দাঁড়াক।

সত্যজিৎ ওরফে মায়ের সাত রাজার ধন এক 'মানিক' তখনই কিন্তু নিবিষ্ট মনে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র তো দেখছেনই তাঁর মন অভিনেতা অভিনেত্রীদের পারফরমেন্সের থেকেও ক্যামেরার পেছনের সর্বময় পরিচালকটির কৃৎকৌশলে মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। তাঁর শুরুর তালিকায় ছিল আমেরিকান চিত্র নির্মাতা জন ফোর্ড, ফ্রাঙ্ক কাপরা, ওয়াইলার বা প্রখ্যাত জার্মান পরিচালক Ernesto Lulich-এর ছবিগুলো। ড্রায়ারের নির্বাক ছবিগুলো তো ছিলই। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতেও তিনি আকৃষ্ট হন। সংগীতপ্রেমে তিনি উৎসাহ পান পণ্ডিত নীরদ চৌধুরীর সান্নিধ্যে। খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন সত্যজিৎ। পথের পাঁচালি, অপরাজিত, জলসাঘর, পরশপাথর-এর পর থেকে তিনি উপলব্ধি করেন নিযুক্তি সংগীত পরিচালকদের সীমাবদ্ধতা। প্রসঙ্গত, চারুলতায় পিয়ানো তিনিই বাজিয়েছিলেন। তাঁর মতে, তাঁর তিনটি ছবির সংগীত পরিচালক রবিশঙ্কর ও জলসাঘরের বিলায়েত খাঁ— এঁরা সবাই ব্যস্ত শিল্পী ও কেবলমাত্র নিজস্ব যন্ত্রের ব্যবহারে পারদর্শী। একটি বাংলা ছবির প্রতিটি দৃশ্যের মুড পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কেবলমাত্র তার পরিচালকের মাথাতেই সদা অনুরণন তুলে যায়। এরপর থেকেই আমরা এক অনন্য বাঙ্গালি সংগীতকারকে পেয়ে যাই। গুপী গাইন বাঘা বাইনে নিখাদ বাংলার গ্রামীণ মধুমাখা সুরের ও গায়কীর যে ইন্দ্রজাল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাকে তাঁর কথাতেই বলতে হবে 'মহারাজা তোমারে সেলাম মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম।'

আজও সন্দীপ রায়ের ছবিগুলিতে তাঁর সৃষ্ট অনবদ্য আবহ সংগীতই মূলত ব্যবহৃত হয়। নেপথ্যে যেন ভেসে ওঠে এক দীর্ঘদেহী বাঙ্গালির অবয়ব। রবীন্দ্রপ্রেমী সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে মূলত রবীন্দ্রনামই প্রয়োগ করেছেন। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্র সংগীত ব্যতিরেকে তিনি ছবিতে কণ্ঠসংগীতের বাহুল্য পছন্দ করতেন না।

খ্যাতির উচ্চ শিখরে যখন তাঁর প্রথম টেলিফিল্ম ভারত সরকারের প্রযোজনায় হিন্দিতে ওম পুরী, স্মিতা পাতিল অভিনীত 'সদ্‌গতি'। ভারতীয় জাতপাতের কুপ্রথার ওপর এক অসাধারণ শৈল্পিক কষাঘাত করল। অন্যদিকে অযোধ্যার নবাবের অর্বাচীন বিলাসিতা, লঘু উদাসীন রাজ্য শাসনে কীভাবে ভারতের শাসনব্যবস্থা অবলীলায় ইংরেজ প্রায় বিনাযুদ্ধে করায়ত্ত করে নিলে এরই তৎকালীন লক্ষ্ণৌ-এর পরিবেশানুগ ঢিমেতালে চলা 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'র সাফল্যে হলিউড-সহ ভারতের বহু রাজ্যের তাবড় তাবড় প্রযোজকরা তাঁকে তাঁদের হয়ে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকে চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুরোধ করেন। তিনি সবিনয়ে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমার মূল এই বাঙ্গলায়, এখানকার মানুষের কথাবর্তা, আচার-ব্যবহার, আবেগ অনুভূতিতে অনূদিত সংলাপ, অন্য ভাষায় নির্দেশিত অভিনেতাদের দিয়ে তেমন শিল্পসম্মত ছবি আমি করতে পারব বলে মনে করি না'। (Inter view trench journalist Piere Boutang)। মৃণাল সেন, তপন সিংহ এঁরা কিন্তু বেশ কিছু হিন্দি ছবি করেছেন।

'অপরাজিত' মুক্তির পর দর্শক আনুকূল্য পায়নি, তার একটি কারণ সত্যজিৎ অকপটে বলেছেন, 'বড় অপুর সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কটা তাঁদের কাছে বড্ড বেশি হৃদয়হীন বলে মনে হয়েছে। মা ও ছেলের যে সম্পর্ক দেখতে তাঁরা (বাঙ্গালি) অভ্যস্ত সেটা আরও কোমল রঙে আঁকা।' ভেনিসে অপরাজিত স্বর্ণসিংহ জিতলেও নিজের মানুষের কাছে এই প্রত্যাখ্যান কিন্তু উন্নাসিকভাবে উড়িয়ে দেননি তিনি। বলেছিলেন, আমার ছবি সর্বসাধরণের জন্য নয় ও শুধু মুষ্টিমেয় বোদ্ধার জন্য এই ভাবে কখনও আমি পরিচিত হতে চাইনি। দর্শক সমাজের কথা মনে রেখেই ছবি করতে হবে।

মৃণাল সেনের মতো প্রসিদ্ধ পরিচালক এই 'অপরাজিত'কে সত্যজিতের শুধু নয় বিশ্বেরও অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের তালিকায় রেখেছেন। এখানেই অনেকে 'অপূর্ব' চরিত্রের মধ্যে সত্যজিতের আংশিক ছায়া খুঁজে পান। সত্যজিৎ চাকরির নিশ্চিন্ততা যা তাঁর মায়েরও স্বাভাবিক অভিপ্রেত ছিল সে সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রেসিডেন্সিতে ট্রিগোনামেট্রি, ফিজিক্স -এর দাপট সহ্য করে আমার কলেজ জীবনের প্রথম দুটো বছর কোনোরকমে কাটিয়ে দিই। বিখ্যাত রাশি বিজ্ঞানী পিতৃবন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন, ইকনমিক্স নিয়ে যদি পড়ি তো বি-এ পাশ করলেই তাঁর অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। চাকরি পাওয়া তখন যাদুর কাজ করত। তাতেই ভুলে ইকনমিক্স একটুও ভালো না লাগলেও স্রেফ মুখস্থবিদ্যায় আমি সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পাশ করি।'

বাপ ঠাকুর্দা যারা ছবি পেন্টিং ইলাস্ট্রেসন সবেরই কাজ করেছেন তিনি সেদিকেই ঝুঁকলেন। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল, বিনোদবিহারীর ট্রেনিং পাওয়া সত্ত্বেও চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে ৬৫ টাকা মাইনে ও পনেরো টাকা মাগ্গিভাতা সহ ৪৩ সালে জে ডি কিমার কোম্পানিতে ভিসুয়ালাইসারের কাজে যোগ দিই।'

বিজ্ঞাপন লে-আউট, প্রচ্ছদ অলংকরণ সংক্রান্ত এই কাজটির মধ্যে কিছু সৃষ্টিশীলতা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু রেসের ঘোড়া যেমন

জ্যাকপট জেতার উপযুক্ত, যে ২০০ মিটার দৌড়ে কতটুকু উৎকর্ষ দেখাবে? তবু এর মধ্যেই রুপালি রেখার ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন সত্যজিৎ। ১০৪৯ সালে বেনারস, কলকাতায় বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জুঁ রেনোয়া 'দি রিভার' ছবির শ্যুটিং করতে আসেন। সত্যজিৎ তাঁর স্বপ্নের নায়কের সন্ধান পেয়ে যান। অফিস ছুটি নিয়ে নিয়মিত শ্যুটিং দেখতে ছুটতেন। এইবার এসে গেল তাঁর জীবনের অন্যতম নির্ণায়ক মুহূর্তটি। তাঁর অফিস তাঁকে বিলেতে আধুনিক প্রশিক্ষণ নিতে মাস ছয়েকের জন্য পাঠাতে চায়।

ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বড় মামার ছোট মেয়ে বিজয়াকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন। এসময়ে এই ধরনের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে নিয়ে তুমুল হট্টগোল হলেও তাঁরা গভীর প্রেমের চিরাচরিত ধর্ম অনুযায়ী পালিয়ে বিয়ে করেন। পরে অবশ্য পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিবাহ সিদ্ধ হয়। দেশবন্ধু ছিলেন বিজয়ার মেসোমশাই। ১৯৫০ সালের এপ্রিলে দুজনকে নিয়েই জাহাজ রওনা হলো। ১৬ দিন পরে ইউরোপের বাঘা বাঘা চলচ্চিত্রকারদের ছবি দেখে ইউরোপে বসে যত খুশি শেখবার আযৌবন লালিত অভিলাষ সত্যি হলো। ১৯৪৭ সালে অপর্ণা সেনের বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও বন্ধু হরিসাধনকে নিয়ে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করে বিদেশি দূতাবাসগুলির কাছ থেকে তাদের মর্জিমতো কিছু কিছু ছবি দেখেই অতৃপ্তিটা জাগিয়ে রাখতেন। বিলেতে অফিসের কাজ সেরে নিত্যদিন চলল আকণ্ঠ চলচ্চিত্র পান। কলকাতায় তাঁর অফিসকর্তা ইতিমধ্যেই পথের পাঁচালির (আম আঁটির ভেঁপু) নামে একটি কিশোর পদ্য সংকলনের পরিকল্পনা সত্যজিতের মাথায় দিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায় ভারত তথা বাঙ্গালির চলচ্চিত্র ইতিহাসের যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ সমাগত হলো। সত্যজিৎ দেখলেন ইটালীয় পরিচালক ভিটরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিফ'। আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্ত্রী বিজয়াকে বললেন, এই বাস্তব লোকেশনে স্বাভাবিক আলোতেই তোলা হবে 'পথের পাঁচালি'। ইউরোপের অন্য কিছু দেশ ঘুরে ফিরতি জাহাজে চেপেই লিখতে বসলেন পথের পাঁচালির চিত্রনাট্য। বহুবার লিখেছেন, বদলেছেন তাঁর এই মানসপুত্রকে। শুধু চিত্রনাট্য তো বীজ রোপণ। সত্যজিৎ মনে প্রাণে তৈরি ভিন্ন ধারার চলচ্চিত্রকার হতে। সেই প্রথমে বলা গোলাপের অনুষঙ্গ।

মনে রাখতে হবে, সত্যজিৎ ইউরোপ হাতড়ে বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্তিপুরে বিভোর হয়ে আছেন। আর সেই সময়ের এমপি, নিউ থিয়েটার্স-এর মতো দাপুটে প্রতিষ্ঠানগুলি দিদি, জীবনমরণ, রজতজয়ন্তী, ডাক্তার, নার্স পিসির মতো বহু ছবিতে হলিউডের বাহ্যিক পালিশ লাগিয়ে (যেমন, নায়ক নায়িকার পাশ্চাত্য অনুকরণের পোশাক, বাধ্যতামূলক পিয়ানোয় বসে গান, নায়কের বিলেত ফেরত হওয়া আবশ্যিক শর্ত) দর্শকমন মাতিয়ে রাখতেন। ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া স্থবির গ্রামীণ বাঙ্গলার কোনো প্রামাণ্য বিকল্প ভাবনা সংবলিত ছবি করার সাহস কেউই দেখাতে পারেননি।

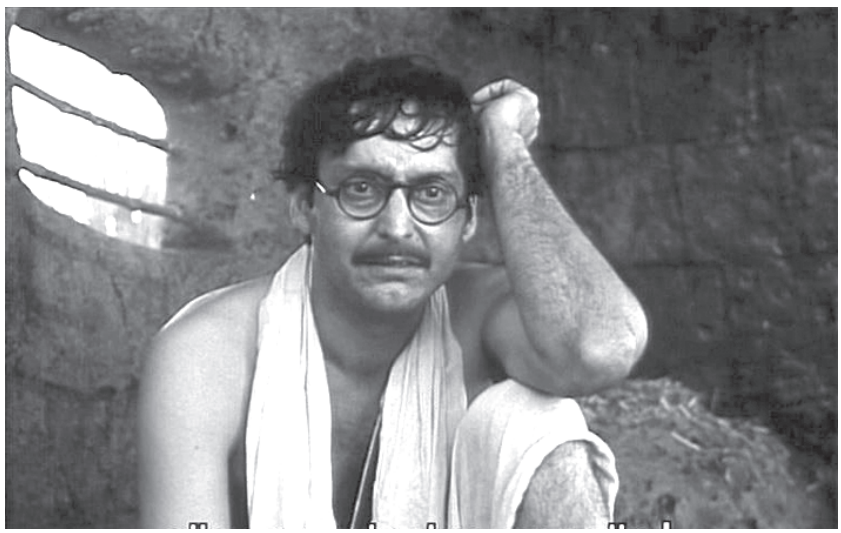

অশনি সংকেত ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

এই পরিমণ্ডলেই সত্যজিৎ বোড়ালে মাটির বাড়ি ভাড়া করে সেট ফেললেন। কিছুটা শ্যুটিংয়ের পর অনিবার্য যা হবার তাই হলো। টাকা নেই। প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী তাঁকে না জানিয়ে ছবি বাঁচাতে শ্রীমতী বিজয়া রায়কে তাঁর কিছু গয়না বাঁধা দিতে বলেন। শ্রীমতী রায় দিয়েও দেন। এ টাকা নিঃশেষ হলে ভদ্রলোক শেষ রাস্তা হিসেবে মরিয়া হয়ে ধর্মকে বেছে নেন। অনিলবাবুর বক্তব্য, সত্যজিৎয়ের ভাষায় 'ডা: বিধান চন্দ্র রায় ভারতের নামজাদা চিকিৎসক। তিনি গান্ধীজীর চিকিৎসাও করেছেন। বিধানবাবু ব্রাহ্ম আমিও (সত্যজিৎ) ব্রাহ্ম... এই কথার সময় আমার মা-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মা বললেন, কর্নেল জে এল সেনের স্ত্রীর ডাক্তার রায়ের ওপর বেশ কিছুটা প্রভাব আছে। ডাক্তার রায় অকৃতদার পুরুষ। মা তাঁর (বেলা সেনের) সঙ্গে দেখা করলেন। দু-এক দিনের মধ্যেই ডাক্তার রায়ের দপ্তর থেকে ডাক এল। ছবির সারাংশ ডাক্তার রায়কে জানিয়ে দিলুম। শুনে তিনি বললেন, পরিবারটি তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কাশী চলে যাচ্ছে। এটা কেন হবে? গাঁয়ের লোকেরা কি তাদের ওখানেই

থেকে যেতে বলতে পারে না? আমরা তো সমষ্টি উন্নয়নের কাজ চালাচ্ছি। তার পক্ষে ভালো কিছু কথা তোমার এই ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারো না তুমি? আমি বলি, শেষটাতো নাড়া দেওয়ার মতো উপসংহার। আর, সবাই তা জানে। ওটা পালটালে পাঠকের তরফ থেকে ছাড়াও লেখকের পরিবার থেকেও আপত্তি উঠবে। তিনি বললেন, তা তো হলো, তবে কমিউনিটি উন্নয়নের প্রকল্পের খাতেই টাকাটা ঢালতে হবে। ফিচার ফিল্মের পেছনে অর্থব্যয়ের কোনো ব্যবস্থাই আমাদের নেই। পি ডব্লিউ ডি-র পক্ষে ছবির নাম পথের পাঁচালি হওয়ায় একটু বাড়তি সুবিধাও হয়'। শেষমেশ সমষ্টি উন্নয়ন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ছবিটি প্রযোজিত হয়।

রসদ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেও মালমশলা বিশেষ করে বিভূতিভূষণের ৭৫ বছরের ইন্দির ঠাকরুণকে তো চাই। অতীতে ছুটকো ছাটকা অভিনয় করেছিলেন এখন প্রায় অথর্ব হয়ে পড়া চুনীবালা দেবীর সন্ধান ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলেন সত্যজিৎ। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে...' শীর্ষক হৃদয় মোচড়ানো প্রচলিত গানটি ৮০ বছরের কুঞ্চিত মুখ কিন্তু অটুট স্মরণশক্তির চুনীবালা তাৎক্ষণিক গেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু দৃশ্যে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'আজ আপনাকে ঘাটে চড়াবো।' জাত অভিনেত্রী চুনীবালার উত্তর ছিল, 'বেশ তো, এ অভিজ্ঞতা কজনের হয়।' এখানে আর একটি ঘটনার কথা না বললে নয়। ইন্দির ঠাকরুণের শবযাত্রায় হরিধ্বনির বদলে ঐ গানটিই নেপথ্যে ব্যবহৃত হয়ে প্রেক্ষাগৃহ বিষাদাক্রান্ত করে তুলত। সত্যজিতের কথায়, 'দর্শকের মধ্যে কেউ কেউ থাকেন, যারা বলহরি শুনেই হরিবোল বলার লোভ সামলাতে পারেন না। এ কারণেই হরিধ্বনি বর্জন করা হয়েছিল।'

বাঙ্গালি চরিত্রের আচার আচরণ, স্বভাবের কী নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলেই না এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আমরা দেখেছি, বহু কষ্টে টাকা জোগাড় হলেও অমিতব্যয়িতার কোনো সুযোগ ছিল না। অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে ফিল্ম ব্যবহার করতে হতো। এক শটের জায়গায় এন-জি অর্থাৎ নন গুড বলে বাতিল হলে দ্বিতীয় শট মানেই বাড়তি খরচ। অনেক সময় কোনো বিশেষ সংলাপে অভিনেতা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে পরিচালক শব্দ এদিক ওদিক করে নেন। একে প্রথম ছবি তায় বিভূতিভূষণের সংলাপ। সত্যজিৎ কোনো বদলে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু বিধি বাম, হরিহর রূপী কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এক দৃশ্যে লুচি মোহনভোগ বলতে ৮ বার শট নষ্ট করেন, 'লুচি মোহনবাগান' বলে। হয়তো পাঁড় মোহনবাগান সমর্থক হওয়ায় এই বিপত্তি।

দুর্গা নাম করে ছবি শেষ হলেও সংগীত যোজনা বাকি। ডেকে আনলেন সেতার কিংবদন্তী রবিশঙ্করকে। তিনি তখনই অতি ব্যস্ত, দেশবিদেশে টহল করা মানুষ। হাতে সময় খুব কম। আজ ভাবাই যায় না, এখন রবীন্দ্র সরোবর মেট্রোর উলটো দিকে জরাজীর্ণ যে 'ভবানী' সিনেমা 'শ্বশুরোয়া পইসাওয়ালা' প্রভৃতি নামের ভোজপুরী সিনেমা দেখিয়ে টিকে আছে, সেখানেই ১৯৫৬ সালের এক গ্রীষ্ম রাতে ৮টা থেকে ভোর ৪টা অবধি একনাগাড়ে পথের পাঁচালির সংগীত সৃষ্টিতে বসেছিলেন দুই কালজয়ী বাঙ্গালি রবিশঙ্কর চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়।

অনেক পরে শর্মিলা ঠাকুরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সরাসরি বলেছিলেন, "I consider myself as the pioneer to reach Bengali Cinema to the world. In fact I built a bridge between world cinema and Bengal"।

এইরকমই ছিল তাঁর বাঙ্গলা নিয়ে গর্ব। তিনি কিন্তু বাস্তবে ভারতবর্ষেরই অঙ্গরাজ্যের প্রত্যন্ত একটি গ্রামকে সত্যনিষ্ঠভাবে ও চলচ্চিত্রের ন্যূনতম কারিগরি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নান্দনিক আধুনিকতম চলচ্চিত্রের রূপ দেন। যুগ যুগ ধরে যা হয়ে ওঠে সে সময়কার গ্রামীণ জীবনের দর্পণ। প্রায় ৫ বছর ধরে এই ছবি নিয়ে টানাপোড়েন ও অর্থসংকটের মোকাবিলা করে তিনি মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই উচ্চ রক্তচাপের শিকার হন, বলেছেন বিজয়া রায়।

এরপরই শুরু হলো ইউরোপীয় আদবকায়দা, সংগীত সাহিত্য, আর অবশ্যই বিশ্ব সিনেমার বিদগ্ধ পণ্ডিত সত্যজিতের বাংলা ও বাঙ্গালির দৈনন্দিন জীবনযাপন, ভাব ভালোবাসা, রাগ অনুরাগ সম ও অতীত সময় নিয়ে মর্মস্পর্শী সব চলচ্চিত্রীয় উন্মোচন। চলচ্চিত্র জীবনে কী অতীত কী সমসাময়িক বহু বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসকে তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় 'রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কী এক নতুন উত্তাপের দ্বারা সোনাকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।' (শরৎকাল)।

এই সোনা গলানোর প্রক্রিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও ছাড় পাননি। যেমন ছাড় পাননি তারাশঙ্কর থেকে তুমুল জনপ্রিয় লেখক শঙ্করও। সত্যজিতের মতে, তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ 'চারুলতা'য় রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত নষ্টনীড় গল্পে স্বামী ভূপতি চারুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে মহীশূর চলে যাচ্ছে। পরিচালক তাকে গৃহত্যাগী না করে শেষ দৃশ্যে চারু ও ভূপতিকে ঘরের একটি চৌকাঠে সংসারবিক্ষুব্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পর্দায় ফুটে উঠছে নষ্টনীড়। তারা এক অনিশ্চিত দাম্পত্যের পুনর্নির্মাণ করবে না কী ব্যর্থ হবে সে বিশ্লেষণ তিনি চিন্তার খোরাক হিসাবে দর্শককে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রউদ্দেশ্য তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, নান্দনিকতার শীর্ষ স্পর্শ করেছে। লক্ষণীয়, এ ছবিতেও ভূপতি ভাইকে বিয়ের পর বিলেত পাঠানোর স্বপ্নের সংলগ্ন করে দিয়েছেন বাঙ্গালিয়ানাকে। ভূপতি বলছে, ব্রিস্টলের রাস্তা দিয়ে ঠাণ্ডায়

দেবী ছবিতে ছবি বিশ্বাস এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সোপানে ধুতি-পাঞ্জাবি- শাল সোভিত সত্যজিতের গলায় ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান Legion the honour -এর পদক পরিয়ে দেন। অনেকে ভাবতে পারেন, ফরাসি দেশে সাম্যবাদী ভাবনা খুবই প্রভাবশালী ছিল, তবে কি এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক যোগসূত্র আছে? আদৌ না। সত্যজিৎ আজীবন বিশ্বাস করেছেন "No matter who uses the film & how - a producer for financial profits, a political body for propaganda.... the cinema is basically the expression of a concept or concepts in acsthetic terms"।

কোনো ধারণার ভাবনার শিল্প সৌন্দর্যময় ভঙ্গিতে উপস্থাপনাই সিনেমার প্রধান লক্ষ্য। তরুণ মজুমদার এ সংক্রান্ত একটি আলোচনায় বলেছিলেন, সত্যজিতবাবু সর্বদা ছুরির ফলার ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন। কখনও উচ্ছ্বসিতভাবে কিছু গোচরে আনার চেষ্টা করেননি। গোটা প্রকাশভঙ্গিতেই থাকত নিপুণ পরিকল্পনার দীর্ঘ চর্চিত স্বাক্ষর।

বাঙ্গালির কালীভক্তি, তৎকালীন আকচার স্বপ্নাদেশ পাওয়া ইত্যাদিকে সত্যজিৎ তাঁর মতো করে বাতিল করেছিলেন দেবী বা কাপুরুষ মহাপুরুষ ছবিতে। সে সময় অনেকে তাঁকে ধর্মবিরোধী বলে অভিহিত করেন। দেবীতে অভিজাত বংশের শ্বশুরমশাই সদ্য পরিণীতা পুত্রবধূকে দেবীরূপে প্রণাম করে আরাধনা করছেন। তাকে কলির অবতার ঘোষণা করে কুসংস্কারের নাগপাশে নিজ বংশধরের মৃত্যুর কারণ হচ্ছেন। এ জিনিসের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ প্রায়ান্ধকার অসুস্থ পরিবেশে বড় বউমা করুণা ব্যানার্জির একমাত্র পুত্রকে বাঁচাতে চাপা আক্রোশ ও অসহায়তা, একইসঙ্গে প্রায় বালিকা দেবীরূপী শর্মিলার হতবুদ্ধিতা ও সৌমিত্রর অন্তিম প্রতিবাদকে পরিচালক চূড়ান্ত কুশলতায় তুলে ধরে দর্শককে নাড়িয়ে দেন। একই ভাবে মহাপুরুষ বেশী চারুপ্রকাশের বুজরুকি তৎকালীন নব্য বিজ্ঞান চর্চায় অভ্যস্ত বাঙ্গালি সপাটে সত্যজিতের মাধ্যমে উৎপাটিত করে।

এরই পাশাপাশি যদি নিম্নবিত্ত বাঙ্গালি কেরানির কোনো কার্বন কপি উত্তরকালের ইতিহাসবেত্তারা সংরক্ষণাগার থেকে বার করতে চান সেক্ষেত্রে তুলসী চক্রবর্তীর 'পরশ পাথর'-এ পরেশ দত্ত চরিত্রটি ব্যবচ্ছেদ করতে হবে।

তাঁর মৃত্যুতে সত্যজিৎ লিখেছিলেন, 'তুলসীবাবুর জায়গা নিতে ওভারকোট টুপি পরে হেঁটে যাচ্ছে এক বাঙ্গালি। বাবু অমল কুমার বসু 'ইয়ং বেঙ্গল'। তিনি নিজে ইংরেজ বিরোধী কাগজ বার করলেও তাঁর স্ত্রীর লেখা বাংলা 'বিশ্ববন্ধু'তে প্রকাশিত হওয়ায় সকলে উচ্ছ্বসিত। বাঙ্গালি, বাংলাভাষা এ নিয়ে ছিল তাঁর আজীবন খুঁতখুঁতানি। অপুর সংসারে সৌমিত্রকে প্রথম নির্বাচিত করার পর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার উচ্চতা, দেহসৌষ্ঠব এসব তো আছেই কিন্তু আরও একটা বড় বস্তু আছে যে জন্য তোমায় নিয়েছি,সেটা কি জানো? সৌমিত্র আমতা আমতা করতে তিনি বলেছিলেন, তুমি যখন বাংলাটা বল, তখন শব্দের বা বাক্যের অর্থ বুঝে সঠিক উচ্চারণে বলতে পারো। এই বিশেষ গুণটা যে তাকে সত্যজিতের ১৪টি ছবির প্রধান অভিনেতা হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল সন্দেহ নেই।

বাঙ্গালি মগ্নতার উদাহরণে তিনটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মাইলফলক হয়ে আছে জলসাঘর, পরশপাথর, দেবী। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের অস্তমিত রাজগরিমা দর্শককে বিষণ্ণ করেছে। সময়ের পরিবর্তন আভিজাত্যের দর্পে তাঁরা বুঝতে চাননি। ছবিতে কিন্তু সংগীত ও সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙ্গালি জমিদারের অপস্রিয়মাণ প্রতিনিধি হিসেবে ছবি বিশ্বাসের ওপরই সত্যজিতের প্রচ্ছন্ন সহমর্মিতা, যা অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে তিনি দর্শক মনেও সংক্রামিত করেছিলেন। ধ্রুপদী সংগীত ও নৃত্য আশানুরূপভাবে গৃহীত না হওয়ায় ছবিটি যথেষ্ট সাফল্য না পেলেও ফরাসি দেশে প্রদর্শনের সময় সেখানকার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে দর্শকরা যথেষ্ট সাযুজ্য খুঁজে পান। সত্যজিৎ হয়ে ওঠেন সে দেশে বরাবরের ফেবারিট। ১৯৮৭ সালে তদানীন্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরোঁ প্যারিস থেকে এসে

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY
HINDAL ALUMINIUM LIMITED

NALCO
Aluminium Sheet Coil

ALOM
Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

পারে এমন আর কেউ বাঙ্গলাদেশে নেই। তাঁর অভিনয়ে একটা উপরি পাওয়া যেত, গতযুগের বাঙ্গালিয়ানার অথেন্টিক চেহারা। এটা তো মানতেই হবে।' পরশ পাথর শেষ হওয়ার পর অভিনেতা বলেছিলেন, এরপর যদি আমি মরেও যাই আমার মনে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ থাকবে না। একজন পরিচালকের কাছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কিই-বা হতে পারে।

পরশ পাথর ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী।

৬০-এর দশকে বাঙ্গালি মেয়েদের চাকরি করা নিয়ে রক্ষণশীল পরিবারের দ্বিধাদ্বন্দ্বে জীবন্ত হয়ে আছে 'মহানগর' ছবির প্রতিটি ফ্রেম। আগে বলা ৫০-এর দশকের বাংলা ছবিগুলিতে ইঙ্গবঙ্গ সামাজিকতার যে ছাপ থাকত তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটালেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে। ১৯৬২ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৫ বছর পরও ইংরেজিয়ানার হ্যান্ডওভার আমাদের রায়বাহাদুর, রায়সায়েব খেতাবধারীদের ঘিরে রেখেছিল। যার পুরুষতান্ত্রিকতা, কৃতঘ্ন প্রবণতা অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিশেষ করে পারিবারিক আবহে এক ধরনের দমবন্ধ করা চাপ তৈরি করত। তা এই প্রাকৃতিক পরিবেশে, উদার পর্বতশ্রেণীর বিশালত্বে ম্রিয়মান হয়ে কেমন করে অপসারিত হতে বাধ্য হলো— এমন বিরল চিত্রভাবনা নিয়ে স্বাভাবিক আলোয় তোলা অভাবনীয় চলচ্চিত্রায়ণ কাঞ্চনজঙ্ঘা। ৭০ দশকের নকশাল আন্দোলন, বাঙ্গলার বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নাগরিক জীবনকে কীভাবে উত্তাল করে তুলেছিল, নির্মম বেকারত্ব গর্জে উঠেছিল প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধে তা তিনি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে অকপটে তুলে ধরেছিলেন, তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে। বাঙ্গলার আর্থ সামাজিক অবক্ষয়ের উপর্যুপরি প্রতিফলন পাওয়া যায় সীমাবদ্ধ ও জনঅরণ্য ছবিতে। এগুলি সবই কলকাতাকেন্দ্রিক। আর এই কলকাতারই এক অতি সাধারণ বাঙ্গালির রুপালি পর্দায় রাজপুত্র হয়ে ওঠা উত্তমের অভিযাত্রাকে তিনি ধ্রুপদী মাত্রায় পৌঁছে দেন 'নায়ক'-এ।

এই সত্তর দশক থেকেই তাঁর অফুরন্ত প্রতিভা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস, বিচিত্র সব গল্প, কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় অবাধ বিচরণ শুরু করে। তৈরি হয় সব বয়সের বাঙ্গালির চিরকালীন প্রিয় সব চরিত্র। হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন গড়পারের লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু। নির্ভিক বাঙ্গালি ডিটেকটিভ ফেলুদা তথা প্রদোষ মিত্র বিপুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে থাকেন। তাঁর সম্ভবত 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র একটি নিখাদ বাঙ্গালিয়ানায় ভরা কৌতুক মনে গেঁথে গিয়ে তোপশে লিখছে 'সমুদ্রের ধারে বসে আছি, হঠাৎ সটাসট আওয়াজ হতে আমি আর ফেলুদা চমকে উঠলুম। ঘুরে দেখি লালমোহনবাবুর হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। তাঁর হাতে হাওয়ায় উড়ে আসা একটা কাগজ লেখা রয়েছে এল এম জি অর্থাৎ লালমোহন গাঙ্গুলি। তিনি একটু আগে অজান্তে একটি খুনের সাক্ষী হয়ে পড়েছিলেন। সন্দেশের পাতায় দীর্ঘদিন লেখালিখি করলেও ১৯৭০ সাল থেকে আমৃত্যু যে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ফেলুদা বা শঙ্কু সিরিজ ও অন্যান্য সম্ভার তিনি দিয়ে গেছেন, তা সংস্কৃতিপ্রেমিক বাঙ্গালির পারিবারিক সম্পদ। সেসময় শোনা যেত উনি চলচ্চিত্রের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে লেখায় বেশ সফল। এপ্রসঙ্গে তাঁর 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' (১৯৬২) সন্দেশে লেখা গল্পটি নিয়ে অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য রয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালে তিনি গল্পের ভিত্তিতে The Alien নামে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য তৈরি করেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে অনেকেই তাঁর সঙ্গে সখ্য রাখতেন। প্রখ্যাত পরিচালক Arther Clarke যিনি Space Odyssey তৈরি করেছিলেন তাঁর মাধ্যমে Wilson নামে এক সাধারণ চলচ্চিত্রকার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে চিত্রনাট্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখান। ১৯৬৭ সালে সত্যজিৎকে হলিউডে আমন্ত্রণ জানান। তিনি পুরো চিত্রনাট্য নিয়ে সেখানে ৫ সপ্তাহ ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজক Colombia Pictures -এর তরফে ছবিটি করার কথা এগিয়ে যায়। সত্যজিৎ কিন্তু এটিকে ত্রিভাষিক অর্থাৎ অবশ্যই বাংলায় ও হিন্দিতে করার শর্ত দেন। মনে রাখা দরকার, সত্যজিতের ওই মহাকাশযান প্রেরিত ক্ষুদ্রাকার ভিনগ্রহের জীবটি বাংলাদেশেরই এক পানাপুকুরে পড়েছিল। সত্যজিৎ দেশে ফিরে আসেন। ওই ছবি নিয়ে কথা বিশেষ আর হয় না। ইতিমধ্যেই উইলসন সাহেব কিছুদিন সত্যজিতের বাড়িতেই ছিলেন। তারপর উধাও হয়ে যান। ১৯৮২ সালে বিশ্ববরেণ্য Stephen Speilbarg ET ছবি করে বিশ্বে

সোরগোল ফেলে দেন। সত্যজিৎ পূর্বোল্লেখিত ফরাসি গবেষককে ১৯৮৯ সালের এক সাক্ষাৎকারে সরাসরি Speilbarg-এর ওপর তাঁর চিত্রনাট্যের বহু 'সিন টু সিন' কপি করার অভিযোগ তোলেন। উইলসন ১০ হাজার ডলার পকেটস্থ করেছে। হলিউডের কিছু কাগজেও এই অভিযোগ নজরে আসে।

সত্যজিতের পাণ্ডুলিপির শতাধিক কপি তাঁর অজান্তে তিনি ওখানে থাকাকালীনই ফোটোকপি করে উৎসাহী মহলে বিতরিত হয়েছিল। সত্যজিৎ প্রতারিত না হলে আজ বিশ্ব চলচ্চিত্রে তাঁর অবস্থান আরও মহিমামণ্ডিত হতে পারত। এই তথ্য তাঁর নিজের দেওয়া।

চোরের বাড়ির ফলারে আর লোভ না করে তিনি তাঁর স্বভূমি ও স্বজাতির সমস্যা নিয়েই নিজেকে প্রস্ফুটিত করতে থাকেন। খাওয়ার সূত্রে বলা দরকার, ভীষণ ভালোবাসতেন ধোকার ডালনা, অড়হর ডাল আর পাঁঠার মাংস, যা ডাক্তারের নির্দেশে খুব তাড়াতাড়ি বর্জন করতে হয়।

চলচ্চিত্র নির্মাণে শারীরিক ও মানসিক ধকল একই সঙ্গে বহন জরুরি হয়ে পড়ে। পথের পাঁচালির সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'কে নিজের চিন্তাস্রোতে সুপ্ত রেখেছিলেন। ১৯৮৩ সালে তার আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা হয়। কিন্তু সত্যজিৎ বড়সড় হার্ট অ্যাটাকে পড়েন। পরবর্তীকালে তাঁর বাইপাস সার্জারিও করা হয়। কিন্তু বহির্দৃশ্য গ্রহণে দৌড়ঝাঁপে চিকিৎসকরা গণ্ডি টেনে দেন। তিনি পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাননি।

তাঁর শেষ তিনটি ছবি সবই মূলত ইন্ডোর শ্যুটিং— গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা ও আগন্তুকের মধ্যে গণশত্রু প্রখ্যাত Norwegion নাট্যকার Henrick Ibsen -এর Enemy of the people অবলম্বনে নির্মিত হলেও সত্যজিতের চিত্রকর্মে তা সেই ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে জনসমক্ষে আনারই সামাজিক তাগিদ। শাখাপ্রশাখার প্রথম প্রজন্ম হিসেবে বৃদ্ধ জীবনের অন্তিম লগ্নে উপলব্ধি করলেন তাঁর তিনটি সফল সন্তানই কর্মজীবনে দুর্নীতিগ্রস্ত। বাঙ্গালির মূল্যবোধের অবনমন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে গেছেন। শেষ ছবি 'আগন্তুক'এ এক নির্লোভ বাৎসল্যে ভরা মামাকে স্বার্থে আকীর্ণ আধুনিক জামাই ও পারিপার্শ্বিক সমাজ গভীর সন্দেহে নিরীক্ষণ করছে। সত্যজিৎ অননুকরণীয় মননশীলতা ও চিত্ররূপময়তায় পূর্ণ সামাজিক দায়বদ্ধতা সমেত বাংলা ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর তাঁর আজীবন ভালোবাসার পরিচয় চিহ্নগুলি রেখে গেছেন। চলচ্চিত্র পরিচালকের চির আরাধ্য 'অস্কার' একমাত্র ভারতীয় হিসাবে তিনি পেয়েছেন। হয়েছেন ভারতরত্ন। তাঁর প্রসিদ্ধি ও সম্মানের কোষাগার প্রাচুর্যময়। তাঁর চলচ্চিত্রীয় সম্মোহন ক্রমসম্প্রসারমান।

মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হলে চিকিৎসক উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে নিরাময়ের বিধান দেন। কোনোসময় বাংলা চলচ্চিত্র নিম্নগামিতায় আক্রান্ত হলে এই মহান স্রষ্টার শিল্পগর্মগুলি দেখা ও পর্যালোচনা করলে চলচ্চিত্র নির্মাতারা উত্তরণের সন্ধান পেতে পারেন।

এখন বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ চলচ্চিত্র নির্মাণ শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে তাঁর ছবিগুলি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়।

ভাবতে ভালো লাগে, পৃথিবীর কোণায় কোণায় অন্ধকার পর্দায় ভাস্বর হয়ে ওঠে বাঙ্গলার নদী, মাঠ, ফুল, পাখি, শহর ও তার গৃহকোণগুলি নিজস্ব গ্লানি ও আনন্দের উপাচার নিয়ে। আবহমান বাংলা ও বাঙ্গালি সত্যজিৎ-এর হাত ধরে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন।

সূত্র :—

১. Our film their film - Satyajit, Penguin।

২. বিষয় চলচিত্র — সংকলন, আনন্দ।

৩. অপুর পাঁচালি - সত্যজিৎ, আনন্দ।

৪. আমাদের কথা - বিজয়া রায়, আনন্দ।

৫. মানিকদার সঙ্গে - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আজকাল।

৬. Interview Anre Piere Boutang, Soumendra Roy, Mrinal Sen & others।

৭. Hundred great films - Soma Chatterjee, Rupa।

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.

'NAVEEN' brand tiles

REGENCY CERAMICES LTD.

BELLS CERAMICES LTD.

ORIENT TILES

Showroom :

32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53

Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :

3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)

Godown : 2403-4014

বন্ধু বিজন

রমানাথ রায়

ভালো নাম হৈমন্তী। আমি তাকে হিমু বলে ডাকি। হিমুর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। আমি কি হিমুকে ভালোবাসি? জানি না। হিমু কি আমাকে ভালোবাসে? জানি না। না জানলেও হিমুর সঙ্গে একবার দেখা করা যেতে পারে। কথাটা বলাও যায়। বলতেই হবে। কারণ, মা কয়েকমাস ধরে বলছে, আর একা থাকিস না। এবার বিয়ে কর। সংসারী হ। সংসারী তো হব। কিন্তু সংসারী হতে গেলে একটা বউ চাই। বউ ছাড়া সংসারী হওয়া যায় না। সমস্যা হলো, বউ কোথায় পাই? কে আমাকে বউ জোগাড় করে দেবে? অফিসে যেসব মেয়ে কাজ করে তাদের প্রায় সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। যে দু-তিনজন অবিবাহিতা আছে, তাদের কাউকে আমার পছন্দ নয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে পাত্রী বাছাই করতে মন চায় না। চিনি না জানি না, এমন মেয়েকে বিয়ে করার অনেক বিপদ। বিয়ের পর হয়তো দেখব, তার একজন প্রেমিকা আছে। কিংবা দেখব, সে একজন ডিভোর্সি। কিংবা দেখব সে একজন ঝগড়াটে মহিলা। উহ্! এসব ভাবতেও আতঙ্ক হয়। তাই সংসারী হওয়ার কথা মনে হতেই আমার প্রথমে হিমুর কথা মনে হলো। অবশ্য হিমু ছাড়া আরও অনেক মেয়ে আছে। আমি তাদের কাছেও যেতে পারি। তারা কেউ খারাপ নয়। ভালো, সবাই ভালো। তবে হিমুর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হব। কারণ, হিমু আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে। হিমুদের বাড়ি গেলে হিমু আমাকে ওমলেট করে খাওয়ায়। চা করে খাওয়ায়। বিয়ের পরেও হিমু নিশ্চয় আমাকে চা করে খাওয়াবে, ওমলেট করে খাওয়াবে। খাওয়াবে না? খাওয়াবে, নিশ্চয় খাওয়াবে। অতএব প্রথমে হিমুর কাছেই যাওয়া দরকার।

বসন্তের বিকেল। অফিস ছুটির পর বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকে ফুল ফুটেছে। কোথায় ফুল? ফুটপাথে বড় বড় গাছ। কোনো গাছে ফুল নেই। বুঝতে পারলাম ফুল আমার কল্পনায় ফুটেছে। হাঁটতে হাঁটতে কোকিলের ডাক শুনতে পেলাম। কিন্তু কোথায় কোকিল? তাহলে কোকিল কি আমার কল্পনায়? তাই হবে। আমি হেসে ফেললাম। আমার ভুল ভাঙল। কলকাতায় বসন্ত আসে না। আসে আমাদের মনে। আমার মনে এখন বসন্ত।

একটা ট্যাক্সি ধরে আমি হিমুদের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। হিমুদের চারতলায় ফ্ল্যাট। আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। তারপর লিফ্‌টে চড়ে চারতলায় এলাম। সামনের ফ্ল্যাটেই হিমুরা থাকে। ডোরবেল টিপলাম। টিপতেই হিমু দরজা খুলে দাঁড়াল। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুই!

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

— কী খবর তোর?

বললাম, ভালো।

— আয়, ভিতরে আয়।

আমি ভিতরে ঢুকে সোফায় বসলাম।

হিমু আমার সামনে বসল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কেমন আছিস?

— ভালো।

— মাসিমা-মেসোমশাই কোথায়?

— দিদির কাছে গেছে। দিদির শরীরটা ভালো নেই।

— ফ্ল্যাটে তুই এখন একা?

— হ্যাঁ।

— তাহলে ভালো হলো। — বলে বুঝতে পারলাম, কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি।

— হিমু জিজ্ঞেস করল, ভালো হলো কেন?

— আসলে আমি একটা কথা তোকে বলতে এসেছিলাম। সেটা শুধু তোকেই বলা যায়।

— ভালোবাসার কথা?

— না।

— বিয়ের কথা। আমি তোকে বিয়ে করতে চাই।

— কেন?

— আমি এবার সংসারী হব।

— ভালো কথা। কিন্তু সংসারী হবার জন্য তো অনেক মেয়ে আছে। আমাকে কেন?

— জানি না।

— তাহলে জেনে আয়।

— কবে আসব?

— যে কোনোদিন।

— সামনের রবিবার আসব?

— আয়।

— তাহলে আমি চলি।

— চা ওমলেট খেয়ে যা।— বলে হিমু রান্নাঘরে ঢুকল।

হিমু ঠিক কথাই বলেছে। এত মেয়ে থাকতে আমি কেন হিমুকে বিয়ে করতে চাই? কী আছে হিমুর মধ্যে?

হিমুর মতো রিংকিও আমার কলেজ জীবনের বান্ধবী। রিংকির সঙ্গে অনেকদিন অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিনেমা দেখেছি। রিংকিকে আমার কখনো খারাপ বলে মনে হয়নি। তাহলে রিংকির কাছে না গিয়ে হিমুর কাছে কেন গেলাম? কেন তাকে বিয়ের কথা বললাম? কথাটা তো রিংকিকেই বলতে পারতাম। আমি তো সংসারী হতে চাই। তার জন্য একটা মেয়ে চাই। সে মেয়ে যে কেউ হতে পারে। ঠিক আছে। আমি আজ রিংকির সঙ্গে দেখা করব। দেখা করে বিয়ের কথা বলব। দেখি রিংকি কী বলে।

অফিস ছুটির পর আমি রিংকিদের ফ্ল্যাটে গেলাম। রিংকি আমাকে সোফায় বসাল। রিংকির বাবা-মা ঘরে ছিলেন। তাঁরা আমাকে দেখে খুশি হলেন।

রিংকির বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

বললাম, ভালো।

রিংকির মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখন চাকরি করো?

বললাম, হ্যাঁ।

রিংকির বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

অফিসের নাম বললাম।

অফিসের নাম শুনে রিংকির বাবা খুশি হলেন। তারপর বললেন, রিংকির এখনও চাকরি হয়নি। তুমি তোমার অফিসে বা অন্য কোথাও ওর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

— চেষ্টা করব।

তারপর রিংকির মা বললেন, তোমরা এখন গল্প করো।— বলে চলে গেলেন। সেইসঙ্গে রিংকির বাবাও চলে গেলেন।

আমরা এখন দুজনে সোফায় মুখোমুখি বসে রইলাম।

রিংকি জিজ্ঞেস করল, কী খবর তোর?

বললাম, চলে যাচ্ছে। তবে একটা সমস্যায় পড়েছি।

রিংকি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, সমস্যাটা কী?

বললাম, আমি সংসারী হতে চাই।

— সে তো খুব ভালো কথা।

— কিন্তু একা একা তো সংসারী হওয়া যায় না। সংসারী হতে গেলে একটা মেয়ে চাই।

— সে তো চাই।

— তুই আমাকে বিয়ে করবি?

— তোকে? কেন? কী আছে তোর মধ্যে?

আমি রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোর মধ্যে কী আছে?

— আমাকে দেখতে সুন্দর। আমার পটলচেরা চোখ, ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু, ভ্রমরের মতো কালো চুল। আর নাকটা? প্রত্যেকে আমার নাকের কত প্রশংসা করে।

— আমাকেও দেখতে খুব সুন্দর।

— কে বলেছে? তোর খুদে খুদে চোখ, ছোট ভুরু। বিচ্ছিরি চুল, ছোট ভোঁতা নাক। এই চেহারা নিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাস?

— ঠিক আছে। আমাকে দেখতে খারাপ। তোকে দেখতে ভালো। কিন্তু রূপ ছাড়া কী গুণ তোর আছে?

— আমি গান গাইতে পারি।

— রান্না করতে পারিস?

— আমি নাচতে পারি।

— সেলাই করতে পারিস?

— আমি অভিনয় করতে পারি।

— ইস্ত্রি করতে পারিস?

— পারি না। পারার দরকারও নেই। কারণ, বাড়িতে কাজের লোক আছে। সেই এসব করে দেয়। কিন্তু তুই গান গাইতে পারিস না, নাচতে পারিস না, অভিনয় করতে পারিস না।

— মানলাম আমি এসব পারি না। কিন্তু আমার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যা কেউ জানে না।

— সেটা কী?

— বলব না।

— বলতে হবে।

— বলব না।

বিয়ে করতে হলে যে কোনো একটা মেয়ে চাই। রাস্তা থেকে একটা মেয়েকে ধরে আনতেই হবে। প্রশ্ন হল, সে আসবে কেন? সত্যি, সে নাও আসতে পারে। উল্টে সে আমাকে অপমান করতে পারে। গালে চড় কষাতে পারে। আবার এসব নাও করতে পারে। হাসিমুখে আমার প্রস্তাব মেনে নিতে পারে। একদিন আমি একটা পরীক্ষা করব। তবে তার আগে হিমুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

রবিবার সকালে আমি হিমুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। হিমুর বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন।

হিমুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, হিমুর কাছে শুনেছি তুমি আগে একদিন হিমুর কাছে এসেছিলে। আমরা সেদিন ছিলাম না। তা, হিমুর সঙ্গে কী কথা হল?

— বিশেষ কিছু কথা হয়নি।

— তুমি নাকি ওকে বিয়ে করতে চাও?

— সেরকম ইচ্ছে ছিল।

— হিমু কী বলেছে?

— সরাসরি হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি। আজ আবার কথা হবে।

— ঠিক আছে। তোমরা কথা বলো।— বলে হিমুর বাবা চলে গেলেন। তারপর হিমুর মা এলেন। তিনিও দুটো কথা বলে চলে গেলেন।

আমি আর হিমু মুখোমুখি রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে হিমু জিজ্ঞেস করল, কিছু ভেবেছিস?

— তেমন কিছু ভাবিনি। শুধু জেনেছি তুই একজন সাধারণ মেয়ে। সেটাই তোর গুণ। আর আমিও একজন সাধারণ ছেলে। সেই কারণেই তোকে বিয়ে করতে চাই। আমাদের বিয়ে হলে আমরা সুখি হব।

হিমু এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি একজন সাধারণ মেয়ে?

বললাম, হ্যাঁ।

হিমু তা শুনে জিজ্ঞেস করল, তুই বিজনকে চিনিস?

— চিনব না কেন? বিজন আমাদের বন্ধু।

— বিজন আমার মধ্যে অনেক কিছু

With Best Compliments From -

W&L

Willowood Chemicals Private Limited

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET, KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL
Architects Planners Interior Designer

A World-class (B+G+7 Stories) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

খুঁজে পেয়েছে।

— কী খুঁজে পেল?

— আমার চুলের মধ্যে দেখতে পেয়েছে একরাশ কালো মেঘ। চোখের মধ্যে দেখতে পেয়েছে দীঘির অতল রহস্য। আর আমার দাঁতগুলো নাকি মুক্তোর মালা।

— এসব বলেছে?

— হ্যাঁ।

— আর কী বলেছে?

— বলেছে, আমি যখন হাসি তখন নাকি ওর মোনালিসার হাসির কথা মনে পড়ে। আমার হাঁটার ছন্দে নাকি ও মন্দাক্রান্তা ছন্দ খুঁজে পায়। আর ওর পাশে বসলে ও চাঁপা ফুলের গন্ধ পায়। শুধু তাই নয়, আমার হাত ধরলে ওর নাকি উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়।— বলে একটু থেমে হিমু জিজ্ঞেস করে, আমাকে দেখে তোর কী এসব মনে হয়?

করুণ মুখে বললাম, না। এসব আমার কিছু মনে হয় না।

— তাহলে ওমলেট খা, চা খা। খেয়ে চলে যা। আমাকে বিয়ে করার কথা ভাববি না।

— সে না হয় ভাবব না। কিন্তু বিজন যা বলেছে সব মিথ্যে। সব বানানো। তুই ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না।

— করব। বিশ্বাস করব।

— তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

হিমু বাদ। হিমুর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখার দরকার নেই। বিজনকে নিয়ে হিমু থাক। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। বিজন এরকম মিথ্যে কথা হিমুকে বলতে গেল কেন? কী লাভ এতে? লাভ অবশ্য একটা হয়েছে। বিজনের কথা হিমু বিশ্বাস করেছে। কখনো বিজনকে তার সন্দেহ হয়নি। আমার কাছে হিমু অতি সাধারণ একটা মেয়ে। বিজন সেই সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলেছে। বিজনের এটা কৃতিত্ব। বিজনের সঙ্গে দেখা হলে বিজনকে একটা ধন্যবাদ দেব। তবে একটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। বিজন কি শুধু হিমুকেই অসাধারণ করে তুলেছে? নাকি আরও কোনো মেয়েকে এইসব মিথ্যে বলে তাকেও মুগ্ধ করেছে? রিংকি নয়তো? কারণ রিংকির সঙ্গেও বিজনের আলাপ আছে। একবার রিংকির কাছে যাওয়া দরকার।

একদিন হঠাৎ রিংকির ফোন এল।

— হ্যালো...

— কী খবর তোর?

— ভালো, তুই কেমন আছিস?

— ভালো। কিন্তু তুই আমার প্রশ্নের জবাব কবে দিবি?

— কোন প্রশ্নের?

— তোর মধ্যে এমন কী গুণ আছে, যা কেউ জানে না।

— বলব। একদিন বলব।

— সেই দিনটা কবে আসবে?

— আসবে, একদিন আসবে। তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

— কর।

— ফোনে সেসব প্রশ্ন করব না। সামনের রবিবার তোর বাড়ি যাব। সেখানেই প্রশ্নগুলো করব। আর সেদিনই আমি আমার বিশেষ গুণের কথা বলব।

— কিন্তু আমি যে অধৈর্য হয়ে পড়ছি। তবে আমি তোর কয়েকটা গুণের কথা অনুমান করছি।

— সেগুলো কী?

— তুই ম্যাজিক দেখাতে পারিস?

— না।

— দাবা খেলতে পারিস?

— না।

— সংস্কৃতে কথা বলতে পারিস?

— না।

— তাহলে?

— সামনের রবিবার বলব।

রবিবার সকালে রিংকিদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

রিংকি জিজ্ঞেস করল, চা খাবি?

বললাম, না।

— কেন?

— খেয়ে এসেছি।

— ঠিক আছে। এখন তাহলে বল তোর মধ্যে এমন কী গুণ আছে, যা কেউ জানে না।

— বলছি— বলে জিজ্ঞেস করলাম, তার আগে তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

— কর।

— তুই বলেছিস তোকে নাকি দেখতে সুন্দর। এই কথাটা তোকে কে বলেছে?

— বিজন।

— বিজন!

— হ্যাঁ।

— তোর চোখ নাকি পটলচেরা। কে বলেছে?

— বিজন।

— তোর নাকি ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু। কে বলেছে?

— বিজন।

— তোর ভ্রমরের মতো কালো চুল কে বলেছে?

— বিজন।

— আর তোর ওই নাকের কে প্রশংসা করেছে?

— বিজন।

— বিজন তো দেখছি জাদুকর। সে নিশ্চয় তোর গান-নাচ-অভিনয়েরও প্রশংসা করে?

— করে বই কী! কিন্তু তুই ওকে জাদুকর বললি কেন?

— কারণ, বিজন দেখছি তার

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

With Best Compliments From-

S. K. KAMANI

যদুবিদ্যায় তোদের একেবারে সম্মোহিত করে রেখেছে।

রিংকি একথায় চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, বিজন আর কাকে সম্মোহিত করেছে?

হেসে বললাম, হিমুকে করেছে। হিমুও তোর মতো সম্মোহিত।

রিংকি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, মানে?

বললাম, বিজন হিমুকে স্বর্গের পরী বানিয়ে দিয়েছে। হিমু তা বিশ্বাস করে। হিমু মনে করে ওর মতো সুন্দরী আর কেউ নেই।

— সত্যি?

— সত্যি।

— এখন বুঝতে পারছি বিজন আমাকে ঠকিয়েছে। বিজন শুধু আমাকে ভালোবাসে জানতাম। এখন দেখছি হিমুকেও ভালোবাসে— বলে রিংকি হিমুকে মোবাইলে ফোন করল। আমি দুজনের কথা শুনতে পেলাম।

— হ্যালো....

— আমি রিংকি বলছি, বিজন তোর কাছে যায়?

— হ্যাঁ। ও আমাকে খুব ভালোবাসে।

— আমাকেও তো খুব ভালোবাসে।

— মিথ্যে কথা। ও শুধু আমাকে ভালোবাসে।

— মিথ্যে কথা। ও শুধু আমাকে ভালোবাসে।

— তাহলে বিজনকে ডাকা যাক। তারপর ফয়সালা হবে। জানা যাবে ও আসলে কাকে ভালোবাসে।

— আমি এখনই বিজনকে ফোন করছি।

— আমি করছি।— বলে রিংকি বিজনকে ফোন করল।

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

রিংকি বলল, সুইচড্ অফ।

একটু পরে রিংকি আবার ফোন করল।

এবারেও সুইচড্ অফ।

একটু পরে রিংকি আবার ফোন করল।

এবারেও সুইচড্ অফ।

রিংকি বলল, এরকম তো কোনোদিন হয় না।

বললাম, ঠিক আছে। বিজনের ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। ওকে ফোনে না পেলে আমি ওর ফ্ল্যাটে যাব।

রিংকি তা শুনে বলল, তুই ওর ফ্ল্যাটে যা। জিজ্ঞেস কর আমাদের সঙ্গে ও এরকম করল কেন?— বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু একটা কথা জানা হলো না।

— কী কথা?

— তোর মধ্যে এমন কী গুণ আছে যা কেউ জানে না?

হেসে বললাম, আমি বিজন নই। আমি মিথ্যে কথা বলতে জানি না।

আমার কথা শুনে রিংকি চুপ করে রইল।

আমি এবার বললাম, তবে বিজনকে আমার চাই। বিজনকে আমার খুব দরকার।

পরপর কয়েকদিন বিজনকে ফোন করলাম। কিন্তু বিজনের মোবাইল সবসময় সুইচড্ অফ। কী ব্যাপার, তা আমার মাথায় ঢুকল না। একদিন ওর ফ্ল্যাটে যেতে হবে। ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করতে হবে। কীভাবে বিজন মেয়েদের সম্মোহিত করে তা জানতে হবে। জানতে হবে সাধারণ মেয়েদের কীভাবে অসাধারণ করে তোলে। আমি তা করতে পারি না। আমি সাধারণ মেয়েদের সাধারণ হিসেবেই দেখি। সেটা কি আমার দোষ? দোষ তো বটেই। নইলে হিমু কেন আমাকে চায় না? কেন চায় না রিংকি? আমি আসলে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। এখন বুঝতে পারছি, মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলাটাও একটা শিল্প। একটা জাদুবিদ্যা।

সময় করে একদিন বিজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দেওয়া। পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের ডেকে বিজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও কিছু বলতে পারল না। আমি ফিরে এলাম। তারপর আরও কয়েকবার বিজনের ফ্ল্যাটে গেলাম। গিয়ে লাভ হলো না। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দেওয়া।

বিজনকে কোথাও পাওয়া গেল না। হিমুকে জিজ্ঞেস করলাম। রিংকিকে জিজ্ঞেস করলাম। ওরাও কিছু বলতে পারল না। বিজন আর ওদের ফোন করে না। ওদের সঙ্গে দেখা করে না। ওদের অসাধারণ করে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বিজনকে আমার চাই। কোথায় পাব বিজনকে? এদিকে আমি আস্তে আস্তে বিজনের মুখটাও ভুলে যাচ্ছি।

একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একজনকে দেখে বিজন বলে মনে হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই মানে আপনি কী বিজন?

সে হেসে বলল, না। আমার নাম অমিয়।

আর একদিন একজনকে দেখে বিজন বলে মনে হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী বিজন?

সে হেসে বলল, না। আমার নাম সুনীল।

এইভাবে আর একদিন...

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net
www.saraogiudyog.com

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

অনুরাধাপুরার বুদ্ধমূর্তি

দারুচিনি দ্বীপের ভিতর

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কিশোর বয়সে যখন ডাকটিকিট সংগ্রহ করতাম সিংহলের ডাকটিকিটে সিংহ-মানব দেখে অবাক লাগত। সেই সঙ্গে ছোট্ট অশ্রুবিন্দুর মতো দেশটিতে যাওয়ার ইচ্ছে হত প্রবল। সেদিনের বন্দরনায়েকের সিংহল আজ শ্রীলঙ্কা।

দশ বছর আগে (২০১০) আমার প্রথম সে দেশে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। সেটা ছিল অনেকটাই অফিসিয়াল ট্যুর। সেদেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে পরিসংখ্যানে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ট্রেনিদের সাথে মিলিত হওয়াটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সেবার এমনই এক ছাত্রসম অফিসার নলিন্দা নিয়ে গিয়েছিলেন মাতালেতে তার গোলমরিচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি বাগানে ঘেরা বাড়িতে। ওর পরিবারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কান সেজে বিনা টিকিটে টুথ টেম্পল দর্শন ছাড়া তেমন কিছু বলার মত ছিল না। তবে পুনরায় সেই দেশ দর্শনের ইচ্ছে তীব্র হয়েছিল। সম্প্রতি সেই সাধ পুরণ হল। সঙ্গী ছিল দুই কন্যা।

কলকাতা যখন ক্যালকাটা ছিল, কলম্বো ছিল সরাসরি মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। বর্তমানে চেন্নাইতে বিমান বদল করে যেতে লাগল তের ঘণ্টা। পৌঁছলাম রাত দুটোতে। বন্দরনায়েক বিমান বন্দরের চলমান পথ যেখানে শেষ হয়ে প্রণিপাত করে সেখানকার গৌতম বুদ্ধের পদ্মাসনে বসা মূর্তিটি বড়ো চিত্তাকর্ষক। বোঝা যায় সত্তর শতাংশ বৌদ্ধের দেশ শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ করলাম। ভারতের মনন বুদ্ধকে টপকে রামে নিবিষ্ট হলেও শ্রীলঙ্কা বুদ্ধে বিভোর।

ভিসা, ইমিগ্রেসান প্রভৃতি কৃত্য সেরে বিমানবন্দরেই এক পর্যটন সংস্থার শরণাপন্ন হলাম। দৈনিক পঞ্চাশ ডলার হিসেবে পাঁচদিনের জন্য টাকা জমা দিয়ে বাইরে আসতেই কালো এ.সি. কার নিয়ে হাজির হল মাঝবয়সী মার্টিস। অত্যন্ত মার্জিত, স্বল্পভাষী, সদাহাস্যময় মানুষটি জাতিদাঙ্গায় রেডক্রশের গাড়ি চালিয়েছে। ইংরেজি জানা মার্টিস সামনের ক'দিন আমাদের ফ্রেন্ড-ফিলোসফার-গাইড।

কী বিচিত্র ভৌগোলিক বাস্তব আমার ভারতবর্ষের। নেক্সড ডোর নেবার দুটি দেশ চীন ও শ্রীলঙ্কা। অথচ আমরা ক'জন এই প্রতিবেশীদের অতিথি হই? শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে বড়ো সুবিধে হলো নিরাপত্তা। বিদেশি পর্যটকের কাছে মরিশাস বা মালদ্বীপের মতো এই দ্বীপরাষ্ট্রটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং আমাদের মতো ইংরেজ ঔপনিবেশিক অতীত থাকার দরুন সর্বত্র ইংরেজি ভাষা চালু। যদিও সাধারণ লোক বোঝে কম। অন্যদিকে চীনে ভাষার বাধা ছাড়া পথেঘাটে হকার, ব্রোকার, টাউটরা পর্যটকের কাছে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। 'উঠতি ধনী' সমাজে টিকে থাকার টেনশনে

আমজনতার মধ্যে তঞ্চকতা প্রবণতাও সেখানে প্রবল।

শেষ রাতের অন্ধকারে দু'ধারে ঘুমন্ত পল্লীকে রেখে চলে আমাদের যান। মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে কোনও চার্চ, বৌদ্ধস্তূপ কিংবা হাসপাতাল। সারা দিনের ক্লান্তি ও রাতজাগা জনিত জেটল্যাগ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। সকলেই যখন হাল্কা নিদ্রায় আচ্ছন্ন, গাড়ি থামল মুনেশ্বরমে। বাইরে এসে দেখি আকাশ সবে ফর্সা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। বিশাল বিশাল চারটি গোপুরের মধ্যে গর্ভমন্দির। বিশাল শিবলিঙ্গ। পুরো দক্ষিণ ভারতীয় পরিবেশ। জনবিরল চত্বরে আমরাই একমাত্র দর্শনার্থী।

প্রাচীন শিবতীর্থ এই মুনেশ্বরম। কথিত আছে রাবণ পূজিত এই তীর্থে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ খন্ডনের উদ্দেশে রামচন্দ্র এখানে শিবের পুজো করেছিলেন। দর্শন সেরে বাইরে আসতেই পুব আকাশে লাল টুকটুকে অমিতাভ সূর্য যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে এই লঙ্কাভূমিতে।

সুমসৃণ রাস্তার দু'পাশে জনবিরল পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য প্রকৃতি। পিঠে ব্যাগ ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের পথে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আমাদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকা এই ছোট্ট গোছানো দেশটি অনেকেরই নজর কেড়েছে। আমাদের দ্বিগুণ মাথাপিছু আয়ের শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ায় আয়ের নিরিখে দ্বিতীয় ও পূর্ণ সাক্ষর দেশ।

কলম্বোকে বাদ দিলে এখানে কোনও মহানগরী নেই বললেই চলে তবে প্রতিটি শহরই সাজানো গোছানো। অনুরাধাপুরা তার ব্যতিক্রম নয়। সব পর্যটকের মতোই আমরা ধাবিত ঐতিহাসিক ও পর্যটন গুরুত্বের অঞ্চলে। বিশাল এই ক্ষেত্রটি ইউনেস্কোর বিচারে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পাওয়ায় সবুজের সমারোহে নিখুঁত করে সাজানো।

অনুরাধাপুরা কেবল প্রাচীন রাজধানীই নয়, সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে লুম্বিনী ও বুদ্ধগয়ার মতো মর্যাদার আসনে আসীন। এখানেই মিহিনতলাতে সম্রাট অশোক প্রেরিত সন্ন্যাসী মাহিন্দা (মহেন্দ্র) এবং রাজা দেবনাম পিয়াতিস্যার সাক্ষাৎ হয় বলে লঙ্কাবাসীর বিশ্বাস। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের প্রভাবে প্রভাবিত সে দেশের রাজা মেঘবরণ (৩৫২-৩৭৯ খ্রিঃ) সমুদ্র গুপ্তর কাছে দূত পাঠিয়ে ভারতে সিংহলী ভিক্ষুদের জন্য একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলেন, তবে গোপনে। ফলে গয়ার কাছে এই মঠ নির্মিত হয়।

ঈশ্বরমুনিয়া মন্দির ও স্তূপ দিয়ে আমাদের অনুরাধাপুরা দর্শন শুরু হল। মাথাপিছু ৩০০ টাকার টিকিট। দ্রষ্টব্যর তুলনায় টাকার অঙ্কটা অনেকটাই বেশি। একটা ছোট্ট জলাশয় সংলগ্ন পবনদেবের মূর্তি। অতি প্রাচীন মন্দির এটি। রোমের ট্রেভি ফাউন্টেনের মতো মূর্তির কাছে ও জলে পর্যটকরা কয়েন ছুঁড়ছে। মার্টিস জানালো এই মন্দিরটি নাকি আসলে রাবণের পিতা বিশ্রভা ঋষির স্মৃতি বিজড়িত।

আমাদের দেশে বৌদ্ধমুক্ত যুগে বৌদ্ধগুহা, চৈত্য প্রভৃতি স্থানে শিব, গণপতি প্রভৃতি দেবদেবী স্থাপন করা হয়েছিল। পুনার কাছে অষ্টবিনায়কের অনেকগুলিই তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। শ্রীলঙ্কার এই অনুরাধাপুরাতে ঘটেছে তার বিপরীতমুখী ঘটনা। বিশ্বশ্রবা ঋষির স্মৃতি বিজড়িত বৈদিক উপাসনা ক্ষেত্রের পিছনে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধস্তূপ। তার মাথা থেকে সমগ্র অনুরাধাপুরার দৃশ্য ধরা পড়ে। একদিকে বিশাল নীল জলাশয় অন্যদিকে দূরে বেশ কয়েকটি অর্ধবৃত্তকার স্তূপ।

প্রত্নতাত্ত্বিক দপ্তর ধার্য করেছে মাত্রাতিরিক্ত প্রবেশমূল্য। উদার ভারতের তুলনায়তো অনেকটাই। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশ হিসেবে মূল্য অর্ধেক হলেও অনুরাধাপুরার বাকি দ্রষ্টব্য দেখতে মাথাপিছু সতেরশো শ্রীলঙ্কান রুপি দিয়ে টিকিট কাটতে হলো।

অনুরাধাপুরা মিউজিয়াম দর্শন করলে ইতিহাসমনস্ক পর্যটক মাত্রই এই দেশটির রহস্যাবৃত অতীত অনুধ্যানে মনযোগী হবে। এই দ্বীপটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আদি কবি বাল্মীকির অমর মহাকাব্য রামায়ণে। যেটি আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ঘটনা নিয়ে ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লেখা বলে ভাবা হয়।

শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক উপাদানের এক মূল্যবান উৎস হলো পালিতে লেখা 'মহাবংশ' গ্রন্থটি। এটি বৌদ্ধ রাজবংশগুলির এক ধারাবাহিক উপাখ্যান। প্রধানত চতুর্থ শতকে লেখা অসংশোধিত মহাকাব্য দ্বীপবংশের ওপর আধারিত এই মহাবংশ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে থেরাবেদা গোষ্ঠীর ধাতুসেনা রচনা করেন। পরবর্তীকালে কুলবংশ নামেও এক পুঁথির উদ্ভব হয়। মহাবংশের অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে বিজয় সিংহের নাম পাওয়া যায়, যাঁর নাম থেকেই সিংহল নামের পরিচিতি। যদিও ক্লাডিয়াশ টলেমির (খ্রিঃ ৯০-১৬০) মানচিত্রে এই দ্বীপের নাম তাপ্রবানা-র (Taprobana) উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিস ও (খ্রিঃপূঃ ২৯০) তা উল্লেখ করেছেন। তাম্রপার্ণি (সংস্কৃত) বা তাম্বপান্নি (পালি) যে শ্রীলঙ্কার প্রাচীন নাম তা স্বীকৃত। নাট্যকার ডি. এল. রায় তাঁর 'সিংহল বিজয়' নাটকে বিজয় সিংহের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়েছেন।

এই বিজয় ছিল নাকি বরেন্দ্র বা পৌন্ড্র (মতান্তরে রাঢ়) বঙ্গের এক রাজকন্যার পৌত্র। রাজকন্যাটি একদা এক যৌনোত্তেজিত পুরুষ সিংহের দ্বারা অপহৃত হয়। তাদের অজাচার জাত পুত্র সিংহবাহুর সন্তান এই বিজয়। সিংহবাহু ছিল অর্ধসিংহরূপী মানব। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনবাদে অ্যানিমাল কিংডমে হিংস্র জন্তুর সাথে মানুষের রহস্যময় সহবাসের তথ্য সুপ্রাচীন। হিরণ্যকশিপু থেকে অশ্বমানব নেসাসের রক্তে হারকিউলিসের মৃত্যু কিংবা কোনও বিশদ ছাড়া রামায়ণে কেবল পুত্রার্থে অশ্বমেধের ঘোড়ার সাথে কৌশল্যা নামক সংযমী নারীকে মিলিত হতে বাধ্য করার ঘটনাও স্মতর্ব্য। এছাড়া ঋষ্যশৃঙ্গ-র ঘটনাও রামায়ণে মেলে। এমনকী মহাভারতে সিংহ

অনুরাধাপুরার স্তূপ

ভরত সখ্য, কিপলিঙের মুগলি বা হাতের কাছে ব্রিটিশ আমলে দীন শনিচরের ঘটনাতেও বন্য বাৎসল্য বর্তমান। বিজ্ঞানীরা তো বলে অতীতে যখন মানুষ ও পশু সহাবস্থান করেছে তখন দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিটাও ছিল অনেক ব্যাপক ও রহস্যময়।

বিমাতার প্ররোচনায় বিতাড়িত বিজয় খ্রিঃপূঃ ৫৪৩-এ আটটি নৌযান ও সাতশো সৈন্য নিয়ে সিংহল অধিকার করেন এবং স্থানীয় রাক্ষস পুজারি সম্প্রদায়ের রাজকন্যা কুবেনিকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ করুণ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। তাম্বপন্নি দ্বীপের প্রথম বহিরাগত হিসেবে পরিচিত বিজয়কে বিবাহ করায় মূল নিবাসীরা কুবেনিকে হত্যা করে। তাঁর পুত্র কন্যা গভীর অরণ্যবেষ্ঠিত আদম পাহাড়ে চলে যায় বলে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

পরবর্তীকালে বিজয় ভারত ভূখন্ডের মাদুরাই সংলগ্ন পাণ্ড্যরাজকন্যাদের বিবাহ করেন। তাঁদেরই একজনের নামে অনুরাধাপুরা। এক হাজারেরও বেশি সময় এই অনুরাধাপুরা ছিল শ্রীলঙ্কার রাজধানী। ইউনেস্কোর বিচারে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মর্যাদা পেয়েছে অনুরাধাপুরা। প্রাচীনত্বের অহংকার ও সংরক্ষণের কৃতিত্ব তার মানায়। ইতিহাসকে এমন মমত্বে যত্নে ভক্তিতে বাৎসল্যে ধরে রাখার এহেন নিদর্শন আমাদের দেশে সাঁচী ছাড়া খুব কম স্থানে দেখা যায়। দু'হাজার বছরের বেশি সময়কালের এমন সুরক্ষিত ইতিহাস সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে বিরল।

গাড়ি থেকে একস্থানে নেমে পদব্রজে আবিষ্কার করতে হবে ইতিহাসকে। মাথার ওপর সূর্যদেবের কঠোর কিরণ। পুরো পথটাতেই পলিমার ম্যাট পাতা। নারকেলের দেশে কয়্যার কার্পেট এরা কেন যে ব্যবহার করে না বোঝা গেল না। প্রথমেই ডান হাতে পেলাম ১৪০ খ্রিঃপূর্বে রাজা দুতুজেমুনু নির্মিত শ্বেতশুভ্র বিশাল স্তূপ রুয়ান ওয়েলিশায়া। এটির অন্য একটি নাম হলো মহাথুপা বা স্বর্ণমালি চৈত্য। পালিতে সুবর্ণমালি দাগবা। বিশ্বের অন্যতম উচ্চ এই স্তূপটি চোল বংশের হিন্দুরাজাকে পরাজিত করে বানানো হয়। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপটি নতুন করে পুনর্নির্মিত হওয়ায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন তেমন নেই, যেটি মেলে পরবর্তী স্তূপ অভয়াগিরি বিহারে।

প্রায় পনেরো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, বারো ইঞ্চি প্রস্থ ও আড়াই ইঞ্চি পুরু পোড়ামাটির ইট দিয়ে বানানো এই বিশাল স্তূপটি সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে এক বিস্ময়। দ্বিতীয় খ্রিঃপূর্বে নির্মিত এই অভয়াগিরিতে বিশ্বের নানা দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমাবেশ ঘটত। মূল গবাক্ষে রয়েছে বিশাল শায়িত বুদ্ধের মূর্তি। সেটি খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। নগ্নপদে স্তূপটির পরিধি প্রদক্ষিণ করতে পায়ে ফোস্কা পড়ার অবস্থা। লে শহরের স্তূপে পাঁপড়ের মতো বরফ ও জল মাড়িয়ে পদব্রজে প্রদক্ষিণের সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতি। এত কষ্টের মধ্যেও একস্থানে সমাধিস্থ তথাগতের এক অসামান্য শান্ত সমাহিত পদ্মাসন মূর্তি যেন সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

অনুরাধাপুরার আঠেরোটির বেশি দ্রষ্টব্য আমাদের ১৭০০ টাকার টিকিটে দেখা যাবে তাদের মধ্যে এই অভয়গিরির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক বলা যায়। ফা হিয়েন ৪১২ খ্রিস্টাব্দে এখানে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেছিলেন।

এরপর আমাদের লক্ষ্য উজ্জয়িনীর রত্ন ও অশোক কন্যা সংঘমিত্রার আনা বুদ্ধগয়ার মহাবোধির অশ্বত্থ বৃক্ষের কাটিং করা

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

পবিত্র বোধিবৃক্ষটি। প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী তাকে ঘিরে। কেউ স্তোত্র পাঠরত, কেউ ধ্যানমগ্ন। বৃক্ষটির আকারে প্রাচীনত্বর লক্ষণ পাওয়া গেল না। তবুও তার পবিত্রতা এতটুকু কম নয়। বৃক্ষটি সোনা বাঁধানো রেলিং দিয়ে ঘেরা।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অনুরাধাপুরাকে আর নেওয়া যাচ্ছে না। ঠিক এমনই মুহূর্তে দুই স্থানীয় মহিলা নিজে থেকেই এসে নিজেদের ভাষায় জানালেন পাশেই নিঃশুল্ক লঙ্গরের ব্যবস্থা আছে। প্রাণভরে ভাত, ডাল, সবজি, ভাজা, চাটনি, পাঁপড় ও সব শেষে ছোট ক্যাডবেরি খেয়ে মনে হল যেন শাক্যমুণি স্বয়ং এর আয়োজন করলেন।

ভরপেট খেয়ে ও গাড়ির ঠাণ্ডায় ঢুকে প্রাণ পাই। অনুরাধাপুরার বিশাল জেতবনের মধ্য দিয়ে চলেছি। বুদ্ধ কেন্দ্রিক স্বর্ণযুগে এখানে কয়েক হাজার বৌদ্ধ শ্রমণের বসবাস ছিল। ইতিহাসে বুদ্ধচর্চার এহেন প্রাচীন তীর্থের সাথে সম্পৃক্ত হতে হলে এখানে দিনের পর দিন থাকতে হবে। দর্শন করি জেতবনারামায়া। একদা বিশ্বে বৃহত্তম ও উচ্চতম স্তূপ-উচ্চতায় চারশো ফুট (বর্তমানে ২৩৩ ফুট) এই স্তূপটি থেরাবাদা ও মহযান বৌদ্ধদের মধ্যেকার উত্তেজনার স্মৃতিবহন করে আছে। ২৭৩-৩০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সাড়ে পাঁচ হেক্টর জমির ওপর এটির ভূমি সংলগ্ন আয়তন (base area) ২.৫ মিলিয়ন বর্গফুট। প্রায় ৯৩ মিলিয়ন পোড়া ইটে নির্মিত এই স্তূপকে ঘিরে সেকালে দশ হাজার সন্ন্যাসী বসবাস করতেন। তাঁদের বাসস্থান, ভোজনশালা প্রভৃতির চিহ্ন আজও বিদ্যমান। শাসক মহাসেনার নাম এটির সাথে যুক্ত। কেবল শ্রীলঙ্কাই নয় সমগ্র বিশ্বে এটির নির্মাণ কৌশল বিশেষজ্ঞের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সিংহলের প্রযুক্তি ও উৎসারকে ভারতের আর্যশক্তি যে সমীহ করত একথা রামায়ণে তথা ইতিহাসে স্বীকৃত। গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে সাত আটতলা বাড়ি প্রথম সিংহল দ্বীপেই সিংহ বংশীয় রাজারা নির্মাণ করতে সমর্থ হন। সারি সারি স্তম্ভ জেতবনে নীরব থেকে যখন জানায় এমন ১৬০০ স্তম্ভের ওপর নির্মিত ছিল অতীতের ন'তলা চৈত্যগুলি তখন বিস্ময়াবিষ্ট হতেই হয়।

মনেশ্বরম্ মন্দির

অনুরাধাপুরাকে বিদায় জানিয়ে এসে যাই সিগিরিয়া। অরণ্য মধ্যে সিগিরিয়া। পথে চোখে পড়ছে কেবলই শ্বেতাঙ্গ বিদেশি নর-নারী। কোলাহল নেই। কেউ ব্যস্ত হস্তীপৃষ্ঠের বিনোদনে। কেউ ঘুরছে স্যুভেনির শপে। কেমন যেন পণ্ডিচেরীর অরোভিলের স্বাদ। সেখানে যেমন দূর থেকে অনেকে মাতৃমন্দির দর্শন করে, এখানেও তেমন দ্রষ্টব্য সিঙ্গল মোস্ট লায়ন, Lion's Rock.

প্যাশন রে ভিলা কাম ট্রি হাটে অন লাইনে আস্তানা বুক করা ছিল। তিনজনের ব্রেকফাস্ট সমেত দিনপিছু এক হাজার ভারতীয় টাকা। এসে বোঝা গেল প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি অনেকটাই বেশি। ছোট্ট সাজানো ঘর। সোফায় সাজানো লম্বা বারান্দা, একপ্রান্তে ডাইনিং টেবলে রাখা চা ও কুকিস। সদ্য কিশোরী মেয়েটি ঘর খুলে দেয়।

যে কোনও অপরিচিত স্থানে রাতের আঁধারে প্রবেশ করলে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করে। জঙ্গল মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই সিগিরিয়া তার ব্যতিক্রম নয়। হোম স্টে-র মালিককে নৈশভোজের কথা বলায় জানালেন, এখানে ডিনার করলে খরচ অনেক বেশি। তাই নিজের টুকটুক বার করে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে হোটেলে নিয়ে গেলেন এবং নিয়ে এলেন একদম বিনাভাড়ায়। সকলেরই তখন শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ।

ঘুম ভেঙেছিল অনেক সকালে। বাইরে এসে মনে হলো গ্রাম বাঙ্গলার এক খামার বাড়ি। নিখুঁত সাজানো ট্রি হাউস। তলায় কটন রোপের হ্যামক ঝুলছে। শুয়ে দোল খাওয়ার তোফা আয়োজন।

নারকেল কলা আমগাছে ঘেরা পারিপার্শ্ব। আছে লাল জবা, হলুদ কলকে। কন্যাদের আনন্দ লাগামছাড়া।

যথা সময়ে মার্টিস হাজির। ভরপেট চালের রুটি, আলুর দম, পাটিসাপটা, কলা, ব্রেড, মিষ্টি, কফি, চা, কেক, কুকিস সহযোগে ব্রেকফাস্ট সেরে লায়ন্স রকের অমোঘ আকর্ষণে রওনা হই।

রেনেসাঁজাত অনুযন্ধিৎসার সাথে দুর্দমনীয় রোমাঞ্চপ্রিয়তা যুক্ত হলে আবিষ্কার প্রবণতা জন্ম নেয়। এই ভারত উপমহাদেশের মানুষজনের মধ্যে এই তিনটি গুণেরই বিলক্ষণ ঘাটতি প্রকট। অজন্তা, আবু, খাজুরাহো, বুদ্ধগয়ার সঙ্গে সিগিরিয়ার মতো স্থানগুলিতে এলে সেটা বোঝা যায়। হাজার হাজার বছর আগে আমাদেরই পূর্বজদের গড়ে যাওয়া অমূল্য সম্পদগুলো প্রায় প্রত্যেকটি আবিষ্কার করেছে ইয়োরোপ থেকে আসা মানুষজন।

২০০X২০০X৬৫০ ফুটের একটি আয়তঘন প্রস্তরখণ্ড যে কত বড় পর্যটন চুম্বক হতে পারে তা চাক্ষুষ না করলে বিশ্বাস করা কঠিন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহলের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক কমিশনার হ্যারি চার্লস পারভিস বেল গভীর অরণ্য মাঝে আবিষ্কার করে এই আশ্চর্য সম্পদটিকে। এটি আজ এই দ্বীপরাষ্ট্রে পর্যটক আকর্ষণের দিক দিয়ে প্রায় প্রথম স্থান দখল করেছে বলা যায়। নারায়ণ সান্যাল মহাশয় বোধ হয় এখানে আসেননি। এলে 'অজন্তা অপরূপার' মতো হয়তো 'সিগিরিয়ার সম্পদ' সৃষ্টি করতেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এই প্রস্তরখন্ড কেন্দ্রীয় প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের অনেক ইঙ্গিত মেলে। মহাবংশের সুবাদে এবং ইংরেজ বেল এর কল্যাণে জানা যায় ধাতু সেনার (৪৫৯-৪৭৭ খ্রিঃ) 'ভরত' অর্থাৎ দ্বিতীয়া ভার্যার পুত্র কশ্যপ (৪৭৭-৪৯৫ খ্রিঃ) এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা হলেও পিতার অস্বাভাবিক মত্যু ঘটলে এই সিগিরিয়াতে তাঁর রাজভবন বানিয়ে আঠেরো বছর রাজত্ব করেন। তারই ফলস্বরূপ কয়েকশো একর জুড়ে তিনস্তরে জলাশয় এবং উদ্যান গড়ে তোলেন, যার কেন্দ্রে এই অতিকায় প্রস্তরখণ্ডটি অবস্থিত।

জলাশয় বেষ্টিত উদ্যান ধরে পূর্বমুখে অর্ধেক উঠলে বাঁ দিকে বিস্তৃত বিহঙ্গদৃশ্য মন কাড়ে। ঠিক তখনই ডান দিকে গুহামধ্যে ঢুকে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয় অজন্তারীতির দেওয়াল চিত্রে অপ্সরা, নাগ, যক্ষ-র চিত্রগুলি দেখে। অনেক চিত্রই নষ্ট হয়ে গেলেও যা আছে তার যৌন আবেদনে স্বর্গীয়ভাব অটুট। সমগ্র পশ্চিম দেওয়াল জুড়ে চিত্র এবং মিরর ওয়ালের লিপি (যা অনেকটাই নষ্ট হয়েছে) উদ্ধার করে পণ্ডিতেরা এখানে রাজা কশ্যপের হারেমের উল্লেখ করেছেন।

এরপর সামান্য কিছুটা উঠে এক প্রশস্ত অঙ্গণে উত্তরমুখে আর এক বিস্ময়। বিশালাকার পাথর কেটে বানানো সিংহের দুটি নখর থাবা। তার মধ্যিখান দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। সব শেষে সমতল শীর্ষ দেশে। এখানে নাকি সিংহের মাথাটি ছিল।

আর একপ্রস্থ আশ্চর্য হওয়ার পালা। সিংহাসন, দুটি জলাশয় কী নেই। রয়েছে বাগানের আয়োজন। যদিও কিছু মাঝারি আকারের গাছ আর টলটলে নীল জলের ছোট্ট সরোবর ছাড়া (অন্যটির জল শুকিয়ে গেছে) বাকি সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রচণ্ড গরমে বিধ্বস্ত হয়ে আরও অনেক পর্যটকের মত রাজা কশ্যপের পাথরে বাঁধানো কৃত্রিম পুষ্করিণীর শীতল জল মুখে চোখে দিয়ে আরাম হই। আমরা যারা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ছি তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে কবে কোন যুগে এই রাজা কশ্যপ।

একে একে বোল্ডার গার্ডেন, স্তুপ, ইমেজ কেভ, কোবরাহুড কেভ, আসন কেভ, রাজার 'দেওয়ান-ই-আম', সামার প্যালেস দেখতে দেখতে নেমে আসি মার্টিসের পার্ক করানো গাড়িতে। তিনজনের জন্য পাঁচ হাজার শ্রীলঙ্কান রুপির টিকিট কাটতে হলেও মনে মনে নিজেকে সমৃদ্ধ বলেই মনে হল।

স্বল্পস্থায়ী কশ্যপ অধ্যায়ের পর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী মুগলান এই সিগিরিয়াকে রাজধানী হিসেবে ব্যবহার না করে এখানে বৌদ্ধবিহার গড়ে তোলেন, যেগুলো দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবন্ত থাকার পর কালের করাল গ্রাসে গভীর জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায়। মার্টিস জানালো সিগিরিয়ার কিছুটা উত্তরে একটু ছোট পিড়ুরাঙ্গালা রক থেকে লায়নস রকেরও সূর্যাস্তের সৌন্দর্য নাকি অসাধারণ।

আমাদের এই সফরে আজকের অর্থাৎ দ্বিতীয় রাত্রিবাসের কোনও আগাম ব্যবস্থা করিনি। তাই গাড়িতে বসেই গুগল সার্চ করে হাভারানাতে ব্যবস্থা করলাম। অনুরাধাপুরা-পোলানারুয়া বাত্তিকালোয়া জাতীয় সড়কে আসা পর্যন্ত পুরো পথটাই যেন জঙ্গলের মধ্যে। এখানে নাকি হাতির সংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক। রয়েছে কিছু এলিফ্যান্ট অর্ফানেজ। এই হস্তী অনাথাশ্রমে দলছুট বাপ-মা হারা হস্তীশাবক রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাটা এই লঙ্কাভূমির নিজস্ব। কোনও হাতির দর্শন না পেলেও একটি পুরুষ ময়ূর অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিল।

চালক মার্টিস নিয়ে এল এক ম্যাসেজ সেন্টারে। গভীর অরণ্যমধ্যে এক চিত্তাকর্ষক তপোবন যেন। আয়ুর্বেদের জনকের চতুর্ভুজ মর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছে। প্রতিষ্ঠান প্রধান চিত্রসহ যত্ন সহকারে বোঝালো কোন ম্যাসেজে কোন রোগের উপশম হয়। এক অদ্ভুত নীরবতা গাছগাছালিতে সাজানো সমগ্র পরিমণ্ডল জুড়ে। এখানে এমন কেন্দ্র পর পর। প্রতিটিই যেন অরণ্যের ঘোমটায় আত্মগোপন করে আছে। এক এক ধরনের অঙ্গমর্দনের অর্থমূল্য ভিন্ন ভিন্ন যা নেহাৎ কম নয়। কন্যাদের আবদার ও সঙ্গী মাল্টি কারেন্সি কার্ডের প্ররোচনা উপেক্ষা করা কঠিন। সুতরাং ..... কোথাও

কোন জনপ্রাণী নেই, অথচ অঙ্গমর্দন কক্ষে শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর নীরব উপস্থিতি। ইউনিফরমড মার্জনকারীর কাছে হাঁড়ি থেকে কপালে গরম জলের ফোঁটা, জড়িবুটির গন্ধমাখা তেল মালিশ, মায় নিমপাতা ভরা কাঠের ঘরে এম.আর.আই এর রুগির মতো স্টিমবাথ কিছুই বাদ গেল না। প্রায় দু'ঘণ্টার এই আয়ুর্বেদীয় আরাম কেনা এক নতুন অভিজ্ঞতা।

রাতের অন্ধকারে মার্টিস জানায় দু'ধারে পর পর হোম স্টে-র অবস্থানের কথা যেগুলোর অস্তিত্ব বাইরে থেকে সাইনবোর্ড ব্যতীত বোঝা কঠিন। মনে মনে ভাবি কী অসাধারণ পর্যটন পরিকল্পনাই এরা করেছে। প্রকৃতির পুষ্টি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকৃতির বাণিজ্যীকরণ। গাড়ি ঢুকলো এক বিশাল বাগান বাড়িতে। এখানেও শ্রীলঙ্কীয় যুবতীর আপ্যায়ন। নৈশভোজের স্থান শয়নকক্ষ থেকে দশকদম দূরে, হেঁশেল ঘেঁষা। নানান পদে ডালের সঙ্গে কন্যার বিচিত্র আবদার পাতিলেবু। তাই শুনে একটি ছেলে অন্ধকার বাগানে গিয়ে গাছ থেকে পেড়ে আনলো সুগন্ধী লেবু। ভোজন শেষে উঠবার মুখে থালাভরা এল গাছপাকা পেঁপে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাগানবাড়ির এই হাভারানার আস্তানাটি তার দিব্যকান্তি প্রকাশ করল। নানা পদে সাজানো প্রাতঃরাশ সেরে আজ আমাদের লক্ষ্য এদেশের শৈলাবাস নুয়ারা এলিয়া।

জলপ্রপাত, লেকপুরা

পথে পড়ে ডাম্বুলা। গুহা ও তার ফেস্কোর জন্য বিখ্যাত। আমরা বিশাল গোল্ডেন বুদ্ধর মর্তি দেখে এগিয়ে গেলাম আলুবিহারার পথে। এই তীর্থটিতে আমার দ্বিতীয়বার পদার্পণ হলো। মাতালে ডাম্বুলা রোডের উপর এক অনুচ্চ পাহাড়ের গুহাতে এই আলুবিহারাতে বৌদ্ধধর্মের এক স্বর্ণঅধ্যায় রচিত হয়েছিল। প্রথম খ্রিঃপূর্বাব্দে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু রাজাদের আক্রমণ ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে বহু বৌদ্ধভিক্ষু এই গুহাগুলিতে বসবাস ও একই সঙ্গে ত্রিপিটকের পালি অনুবাদের কাজে রত হন। বুদ্ধভদ্রর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশো ভিক্ষু বৃক্ষপত্রে এই ঐতিহাসিক কৃত্যটি সম্পন্ন করেন। দেশ, বিদেশের ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের কাছে এই স্থানটি তাই পরম পবিত্র। সংলগ্ন মিউজিয়ামে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধচর্চা কেন্দ্র। কোরিয়া থেকে আসা ভিক্ষু তায় হিও এবং লায় -এর উপহার স্বরূপ এক বিশালাকার ঘণ্টা রাখা। এসেছেন কাম্পুচিয়ার প্রেসিডেন্ট নরোদম সিহানুকও।

এসে যাই ক্যান্ডি। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও গর্বের শহর। কেবল বুদ্ধের দন্ত মন্দিরই নয় দেশের বৃহত্তম নদী মহাবলী গঙ্গার তীরে ও বিশাল দর্শনীয় কৃত্রিম লেক শোভিত এই জনবহুল শহরটির মধ্যে কেমন যেন শিলং, নৈনিতালের ছোঁয়া। শহরটির প্রতিটি অংশের সৌন্দর্যায়ন দর্শনীয়। এখানকার বহু নদীর নামের সঙ্গে গঙ্গা যুক্ত। যেমন মহাবলী গঙ্গা, কেলানী গঙ্গা, কালু গঙ্গা, জিন গঙ্গা। এদের মধ্যে কালু গঙ্গার উৎপত্তি শ্রীপদ তথা আদম পাহাড় থেকে।

ধীরে ধীরে আমরা উঠতে থাকি শ্রীলঙ্কার পহেলা নাম্বার শৈলশহর নুয়ারা এলিয়াতে। ইংরেজ শাসকদের মনের মাধুরী দিয়ে বানানো এক মনোরম শহর। বৌদ্ধ লঙ্কার আবহ ছেড়ে একেবারে ভিন্ন আকর্ষণ ও মাদকতায় মোহিত হওয়ার মতো পরিবেশ। এ যেন যোগ-এর লঙ্কা থেকে ভোগ-এর লঙ্কায় আসা। একদিকে বিশাল লেকের স্থায়ী অনুষঙ্গ ও চতুর্দিকে চা বাগানের সান্নিধ্য নুয়ারা এলিয়াকে এক রাজকীয় রূপ দিয়েছে। সুলেখক ও অগ্রজ বন্ধু বিজয় দত্ত এই দেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সুন্দর বলেছেন, 'দ্বীপরাষ্ট্র, তাই চারপাশেই সমুদ্র উপকূল, লোনা জল, অঢেল রোদ, হাওয়া, নারকেল, মশলা আর মৎস্যমুখী জীবনযাত্রা। চারদিক থেকেই ভূপ্রকৃতি ক্রমশ উঁচু হয়ে মাঝখানে পাহাড়ি অঞ্চল।'

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA)
PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

চলার পথে অপরাহ্নে চা পানের বিরতিতে মার্টিস গাড়ি ঢোকায় এক টি ফ্যাক্টরির বিলাসবহুল অঙ্গনে। বিশাল চা-পান কক্ষ। ওপেন এয়ারে অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য। এঁকেবেঁকে নেমে গেছে মোটর পথ। দূরে নিঃশব্দ ঝরনা। এসে গেল তিন চার রকমের চা। শ্রীলঙ্কান টি এদের গর্ব। কিন্তু আমাদের মতো দুর্জয়লিঙ্গ (দার্জিলিং) প্রেমিক মুখে কোনোটাই খুশি করলো না। বিশেষ ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ বলে যে চা টি লঙ্কাবালা পরিবেশন করলেন সেটা সজিনাপাতা সিদ্ধর জল বলে মনে হল, যেটা পেট খারাপ হলে অনেকে খায়।

লাফিং লেপার্ড হোস্টেলের ডরমিটরিতে আগাম বন্দোবস্ত করেছি। এসে দেখি ইয়োরোপীয় যুবক-যুবতীদের উদ্দাম পার্টি চলছে। যতোই অসহ্য লাগুক ভালো লাগাতেই হবে। ইজরায়েল থেকে আসা একটি ছেলের কণ্ঠের গিটার অনুষঙ্গে ওঁ মহাদেবা ওঁ মহাদেবা শুনে ও আড্ডা দিয়ে রাতে ঘুম হলো না বললেই চলে।

ভ্রমণ খুব হেকটিক হয়ে যাচ্ছে। সকাল সকাল রওনা দিলাম। লক্ষ্য আদম পাহাড়ের পাদদেশে ডালহৌসি নামের ছোট্ট লোকালয়ের আস্তানা। পথে গাড়ি থামলো সীতাকটুয়া তথা আমাদের অতিপরিচিত অশোক বনে। পাহাড়ি অঞ্চলটিতে পাশেই বয়ে চলেছে ক্ষীণাঙ্গী এক স্বচ্ছতোয়া শ্রোতস্বিনী। রাবণ রাজার রুচির প্রশংসা করতে হয়। এখানেই পবনপুত্র মহাবীর মা জানকীকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয় দেন। হনুমানের আগমনের সংবাদ পেয়ে দশানন সীতাকে নিজ প্রসাদ থেকে প্রথমে ইস্তিরিপুরা (স্ত্রীপুরা) আজকের ওয়ালেডিমাডাতে এনেছিলেন। রাবণের এই পলিশড হারেমকে বাল্মীকি বলেছেন মহিলা বন। সেখানে মদ্যাসক্ত কামাচ্ছন্ন মহিলাদের দেখে হনুমান বিস্মিত ও লজ্জিত হন। সীতা সেখানে সম্পূর্ণ বেমানান বলেই অশোকবনের পরিকল্পনা।

মার্টিস বেশ কিছু অশোক ফুলের গাছ দেখালো। এখন ফুলের সময় নয়, তাই ফুল দেখার সৌভাগ্য হলো না। সে জানায় পঞ্চমুখি জবার আকারে লাল টুকটুকে সুগন্ধী অশোকের কথা।

পথ বেশ উঁচুতে উঠছে। দু'ধারে কনিফারের প্রাচুর্য। হিমালয়ের মতো পরিচিত ভূপ্রকৃতি। নীরব স্তব্ধ মধ্যাহ্নে জনহীন পথ। পথিপার্শ্বস্থ ইটারিতে ক্ষণিক বিরাম ও সেই সাথে অখাদ্য মেনুসহ অর্থের অপচয়।

ডালহৌসির প্যারাডাইস এন্ট্রান্স-এ আসতে আসতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। বৈষ্ণোদেবীর কাটরার মতো এই ডালহৌসির গুরুত্ব। খুবই ছোট গঞ্জ শহর। রাত দেড়টা নাগাদ পাহাড়ে ওঠা শুরু হবে। তাই যতটা পারা যায় ঘুমিয়ে নেওয়া।

আগে বেশ কয়েকবার সারা রাত বৈষ্ণোদেবীতে ওঠার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই নতুনত্ব কম লাগলেও কন্যারা যারপর নাই উত্তেজিত। দুটো নাগাদ শুরু হলো আদম্স পিক সামিট যাত্রা। ব্রিটিশরা এই দ্বীপটিতে সর্বত্রই আদমকে যোগ করেছে। তালাইমান্নারে রামসেতুকে তারা আদম ব্রিজ বলেছে। এখানেও সেই আদম। বৌদ্ধভক্তরা পাহাড় শীর্ষে প্রায় দু'মিটার লম্বা তথাগত-র পায়ের ছাপ দর্শন করে বিষ্ণুপাদ পদ্মের মতো। মুসলিমরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? তাদের কাছেও এই পাহাড় পবিত্র।

জোনাকির মতো দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড় শীর্ষে আলোর রেখা। পার হলাম দুটি ঝরনা। একটার জলে পুণ্যার্থীরা স্নান করছে। হতে পারে এটাই হয়তো কালুগঙ্গা। পর্যটকের স্রোতে মিশে যাই। একটা বড়ো অংশই বিদেশী। ঈর্ষণীয় তাদের শারীরিক সক্ষমতা। আইসল্যান্ড থেকে আসা এক মহিলার সাথে আলাপ জমিয়েছে কন্যারা। আমাকে আপন করে নিয়েছে একদল স্থানীয় যাত্রী। কারণ বোধ হয় মুরলীধরণ ও সনৎ জয়সূর্য-র আমি ফ্যান একথা বলা। ঘর থেকে বানিয়ে আনা তেঁতুল আর নারকেলের আমসত্তের মতো খাবার আমাকে ওদের সাথে খেতে হলো। ভাষা দুর্বোধ্য হলেও 'অতিথি দেব ভব' দর্শনের বাস্তবায়ন।

ক্লান্ত যাত্রার শেষ অংশে শ'খানেক সিঁড়ির আগেই থামতে হলো ভিড়ের জন্য। ঠাসা ভিড়ে সকলেই বসে অপেক্ষারত সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য। অবশেষে জবাকুসুমের আবির্ভাব। আগামী পরশু পূর্ণিমা। শ্রীলঙ্কার পয়া দিবস। প্রতি পূর্ণিমাই এদেশে ছুটির দিন। তাই শুক্লপক্ষের রাতে যাত্রীভিড় বেশি। দিনের আলোতে নামার পথে শারীরিক কষ্টের জন্য অপরূপ বন্য প্রকৃতি দর্শনের আনন্দ পদে পদে ব্যহত হয়।

মার্কোপোলো ১২৯৪ সালে এই শ্রীপদ তথা আদমস পিকে উঠেছিলেন। ইবনবতুতা উঠেছিলেন ১৩৪৪ সনে। ১৮১৭ তে উঠেছিলেন বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভির ভাই জন ডেভি। তিনি ছিলেন এখানকার অন্যতম প্রশাসকও।

বেশ ক'বছর হয়েছে বরিষ্ঠ নাগরিক হয়েছি। তাই আস্তানায় ফিরে নিজেকে হলদিঘাটের যুদ্ধজয়ী সৈনিক ভেবে ফেলি।

মাতিস গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। লক্ষ্য আজ আমাদের গল।

গলকে ইবন বতুতা কালি (Qali) নামে সম্বোধন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে এই শহরটি দ্বীপ রাষ্ট্রের প্রধান বন্দরের মর্যাদা লাভ করেছিল। গলের সাথে আমাদের কোচি-র অনেক মিল। মালাবার উপকুলের মাত্তেনচেরির মতো এখানেও মধ্যযুগের পর্তুগাল ও হল্যান্ড হাত ধরাধরি করে অবস্থান করছে। আমাদের কোচি-র বাড়তি ঐশ্বর্য সেখানকার সিনাগোগ।

কলম্বো বা ক্যান্ডির মতো গল ও এক সুন্দর সাজানো আধুনিক শহর। শহরের আয়তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বানানো ক্রিকেট স্টেডিয়াম। পথে এক সুপার মার্কেট থেকে খাদ্যবস্তু কিছু কিনে

হোটেলে উঠি। যে সূর্যকে শ্রীপদ-র মাথা থেকে উঠতে দেখেছি সে তখন ভারত মহাসাগরে ডুবন্ত ডিমের কুসুম। বেলাভূমি লাগোয়া স্ট্র্যান্ড এর উপর লাকি ব্রিজ হোটেলটি মনের মতো।

গলের অন্যতম সেরা দ্রষ্টব্য এখানকার ফোর্ট। চারদিকে মহাসাগর ঘেঁষা যেমন তার অবস্থান, তেমনটাই তার সংরক্ষণ। ঢুকলেই মনে হয় অষ্টদশ শতকে প্রবেশ করলাম। ইউরোপেও দেখেছি বড় বড় আধুনিক শহরে রোমান সাম্রাজ্যর স্মৃতিকে ধরে রাখার নিরন্তর প্রয়াস। কষ্টলাগে যখন দেখি ডাচদের স্মৃতিবাহী গঙ্গাতীরের ডাচকুঠিকে গুড়িয়ে দিয়ে বহুতল গড়ে তোলা হলো আমাদের বরানগরে।

এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থল হলো উনাওয়াটুনা নামের এক হিলকের উপর অবস্থিত রামাস্সালা। এখানে জাপানের বানানো বুদ্ধ মন্দিরটি দেখার মতো। পাশেই হনুমানের মূর্তি সমেত একটি ছোট মন্দির। নতুন চোখ ধাঁধানো বৌদ্ধ দাগবার পাশে এই হিন্দু মন্দিরটিকে অনেকটাই দীন মনে হয়। বীর হনুমান নাকি পাহাড় নিয়ে এখানেই প্রথম এসেছিলেন।

গল্-এর ঝাঁকিদর্শন স্বল্পস্থায়ী করে পরিকল্পনা করেছিলাম রেলযোগে কলম্বো যাবো। কারণ রেলপথ গেছে সমুদ্র-র তীর বরাবর। মার্টিস আমাদের কলম্বোতে পিক-আপ করবে। শেষ মুহূর্তে এই পরিকল্পনা বাতিল করে নব নির্মিত শ্রীলঙ্কার দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ধরে চললাম শেষ গন্তব্যের লক্ষ্যে। আজ পূর্ণিমা। তাই পয়া দিবসের ছুটি। সমগ্র কলম্বোতে বনধের চেহারা। বোঝার উপায়ই নেই কাজের দিন কী ভিড় আর যানজটই না হয় এই রাজধানী শহরে। যেটা পর্যটক মাত্রই এখানে চোখে পড়ে তাহল সৌন্দর্য ও অভিন্নতা রক্ষা করে এতটুকু বাড়তি স্থান দখল না করা সুশৃঙ্খল হকারদের উপস্থিতি। কলকাতার মতো পরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞাপন, নোংরা ফ্লেক্স, ভাঙা টিন, ছেঁড়া পলিথিনে নরক বানানোর কোনও প্রয়াস নেই এখানে। স্ট্রিটফুড বা চায়ের দোকানের অভাব যেমন এই চায়ের দেশে খুবই চোখে পড়ে, তেমনই চোখে পড়ে সর্বত্র সুদৃশ্য প্লাস্টিক, পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহর খাঁচা। বাংলাদেশের গণভবনের মতো বিশাল জলাভূমির মাঝে শ্রীলঙ্কান পার্লামেন্ট ভবন, বন্ধ মিউজিয়াম, সাজানো লম্বা পেভমেন্ট জুড়ে শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে নগরী ছাড়িয়ে এসে গেলাম আবার হাইওয়েতে। বাঁহাতে পড়ল ম্যানগ্রোভ ঢাকা সামুদ্রিক ব্যাক ওয়াটারের জলাভূমি। সেখান থেকে উড়ে এসে পথের পোস্টে বসছে সদলবলে জলজ বিহঙ্গের দল। এসে যাই ব্যাক ওয়াটার ফিস মার্কেট আর মনোহারিণী বেলাভূমিতে সাজানো শ্রীলঙ্কা তথা এশিয়ার অন্যতম সেরা সৈকত শহর নিগাম্বো। এখানকার বেশিরভাগ লোকই ধর্মে ক্যাথলিক খ্রিস্টান।

শেষ রাত্রি অবস্থানের জন্য এক তাক লাগানো বাগানে ঘেরা বাংলোর ব্যবস্থা করেছে মার্টিস। নাগলিঙ্গম ফলের গন্ধে সুরভিত সমগ্র পরিমণ্ডল। মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে জামরুল। গাছে কচি আম। সামনেই সাগরের সমান্তরালে বিচ রোডে পর্যটকের প্রবাহ। কোলাহল নেই, সর্বত্র এক শান্তির বাতাবরণ। বিশ্বাসই হয় না মাত্র ক'মাস আগে ইস্টার সানডের সমাবেশে এখানকার সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ-এ এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩০০ জনের মৃত্যু হয়। একই সঙ্গে বিস্ফোরণ হয় কলম্বোর সেন্ট অ্যানথনি এবং বাত্তিকালোয়ার জিয়ন চার্চেও। আমাদের গৃহকর্ত্রীর স্বামী জাতি দাঙ্গায় নৌকো নিয়ে তালাইমান্নারে গিয়ে নিখোঁজ হয়। পেশায় ধীবর পরিবারটি বাড়ির এক অংশে হোম-স্টে বানিয়েছে।

সকালে সকলেই এখানে স্থানীয় চার্চে রবিবারের প্রেয়ারে অংশ নিতে গেল। একই সঙ্গে সঙ্গী হলাম আমরাও। সেখান থেকে ফিশ মার্কেট। দেখার মতো দৃশ্য। টুনা, কাঁকড়া, গলদা কী নেই। কলকাতায় পাঁচশো টাকা কিলো কাঁকড়া খাইনি, সস্তায় এখানে খাবো বলে। এসে দেখছি স্থানীয় মুদ্রায় আড়াই হাজার টাকা কিলো গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া দু'হাজার।

অগত্যা বাসে উঠে রওনা দিই সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চের উদ্দেশে। শহর থেকে বেশ খানিকটা বাইরে এক পরিচ্ছন্ন পল্লীতে গড়ে ওঠা মাঝারি আকারের ক্যাথলিক চার্চ। নেই তেমন প্রাচীন ইতিহাস তবু বর্বর আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল নিরাপরাধ মানুষজনকে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার স্মৃতি। বাইরে এক জায়গায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বানানো স্মৃতিস্তম্ভে পাথরে লিখে রাখা সেই সকল ধর্মপ্রাণ মানুষজনের নামের তালিকা। মনে পড়ে যায় চেক রিপাবলিকের সিনাগোগে এমনটাই নিহত হতভাগ্য ইহুদিদের সমগ্র দেওয়াল জুড়ে লিখে রাখা নামের তালিকা। ভারাক্রান্ত মনে নীরব অশ্রুমোচন ছাড়া কিছুই করার থাকে না।

সমুদ্র শহর দর্শনের অভিজ্ঞতায় নিজের দেশে আন্দামানকে কখনোই ভোলার নয়। কিন্তু বিদেশের সৈকত শহরের মধ্যে এই নিগাম্বোকে অবশ্যই উপরে রাখবো। অনাদরে অবস্থান করা পর্তুগিজদের পরিত্যক্ত ফোর্ট, যা একদা জেলখানার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল, বর্ণময় ব্যাক ওয়াটার, মৎস্যমুখী ধীবরপল্লী, নানান বর্ণের একাধিক সৈকত, চার্চের ঘণ্টা, বুদ্ধমন্দিরের মন্ত্রধ্বনি, একাকার হয়ে নিগাম্বোকে এক বিরল বিচিত্র গৌরবে ভূষিত করেছে। সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে এক আশ্চর্য নীরবতা।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানমনস্ক লেখক স্যার আর্থার সি ক্লার্ক ১৯৫৬ সালে স্কুবা ডাইভিং করতে শ্রীলঙ্কা এসে এই দ্বীপের প্রেমে পড়ে যান। বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে ২০০৮-এ প্রয়াত হন। এই দ্বীপ সম্পর্কে তাঁর অন্যতম সেরা উক্তি— A land like no other. আমাদের এই ঝটিকা সফরের শেষে ক্লার্ককে সমর্থন করতেই হয়। অনেক বাকি থেকে গেল। পোলানারুয়া, বাত্তিকালোয়া দেখতে আবার আসার ইচ্ছে নিয়ে বিদায় নিই। □

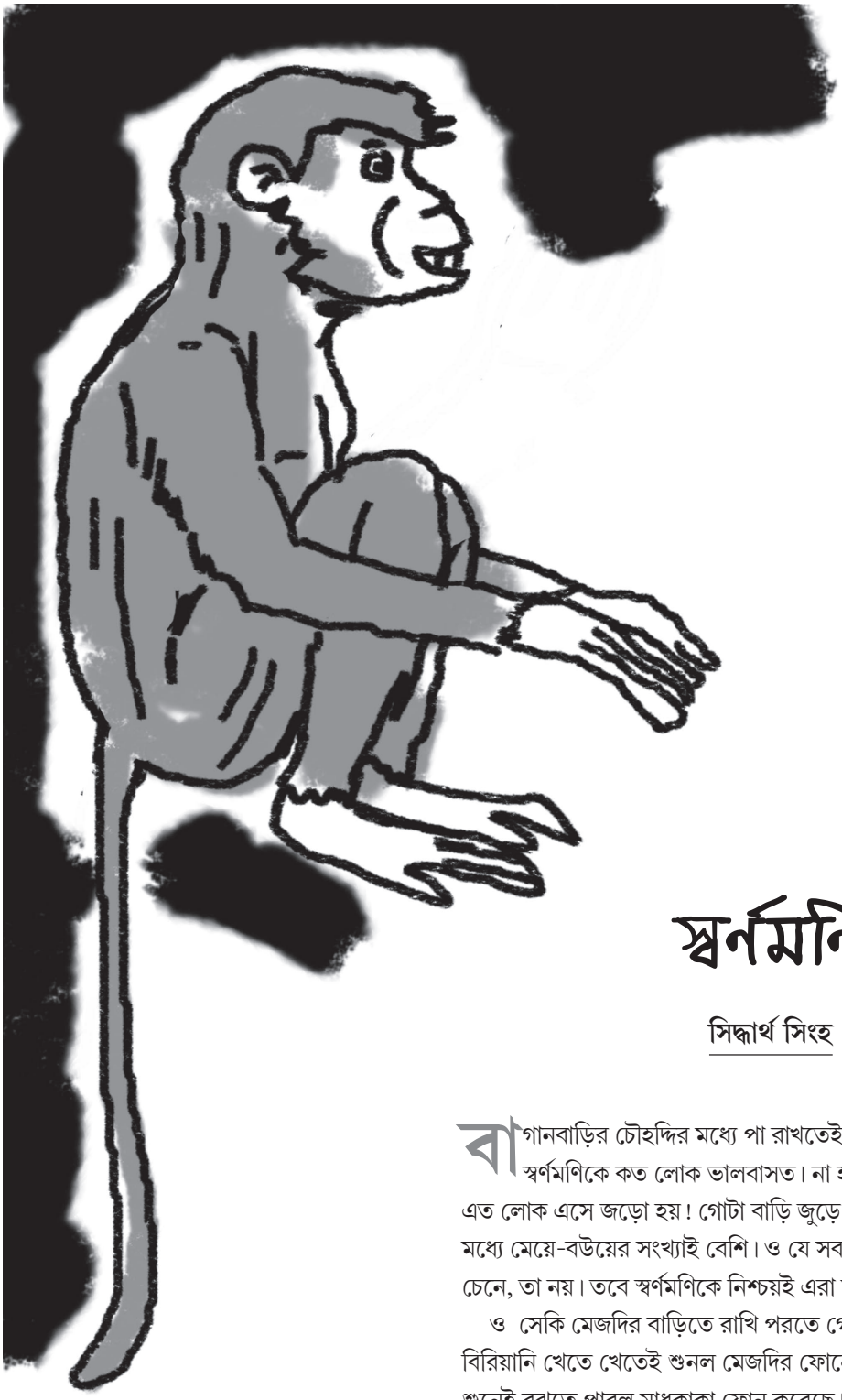

স্বর্ণমনি

সিদ্ধার্থ সিংহ

বাগানবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পা রাখতেই সৌম্য বুঝতে পারল, স্বর্ণমণিকে কত লোক ভালবাসত। না হলে এইটুকু সময়ের মধ্যে এত লোক এসে জড়ো হয়! গোটা বাড়ি জুড়ে থিকথিক করছে লোক। তার মধ্যে মেয়ে-বউয়ের সংখ্যাই বেশি। ও যে সবাইকে চেনে বা ওকে সবাই চেনে, তা নয়। তবে স্বর্ণমণিকে নিশ্চয়ই এরা সবাই চেনে।

ও সেকি মেজদির বাড়িতে রাখি পরতে গেছে। জামাইবাবুর আনা মটন বিরিয়ানি খেতে খেতেই শুনল মেজদির ফোনে রিং হচ্ছে। মেজদির কথা শুনেই বুঝতে পারল মাধুকাকা ফোন করেছে।

মা মারা যাওয়ার পর এই অকৃতদার কাকাই তাদের বারুইপুরের বাগানবাড়িতে থাকেন। পঁচাত্তর পেরিয়ে গেলেও শরীর এখনও যথেষ্ট সুঠাম। কিন্তু তিনি ওখানে একা থাকবেন কী করে! রান্নাবান্না কে করে

দেবে! তাই খুব ছোটবেলা থেকেই তাদের সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম যে দু'হাতে একাই সামলাচ্ছে, সেই স্বর্ণমণিকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওখানে।

খুব ছোটবেলায় বাপ-মা মরা পলাশীর এই মেয়েটিকে তার বৌদি এত অত্যাচার করত যে, সে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার ট্রেনে চেপে বসেছিল। সেই ট্রেনে ছিলেন সৌম্যর মা।

সে বহু যুগ আগের কথা। সৌম্য তখন ফাইভ কি সিক্সে পড়ে।

ওর মা উল্টো দিকের সিটে মেয়েটিকে ওভাবে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কোথায় যাবে?

ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা মেয়েটি কোনোরকমে বলেছিল, এই ট্রেনটা যেখানে যাবে সেখানে।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কোথায় থাকো?

ও বলেছিল, পলাশীতে।

— তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলেছিল, স্বর্ণ।

ওর মা জানতে চেয়েছিলেন, ওখানে কার কাছে যাবে?

মেয়েটির আমতা-আমতা করা দেখেই তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন, মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। দেখতে শুনতে জনজাতিদের মতো হলেও অল্প বয়স তো, চারিদিকে হাজার রকমের লোক ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কখন কোন বিপদে পড়ে যাবে, তাই তাকে নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন, এটা হচ্ছে তোদের একটা মণি। যেমন মাসিমণি, পিসিমণি, ঠিক তেমনই এটাও একটা মণি। তোরা ওকে মণি বলেই ডাকবি, বুঝেছিস?

কেউ কেউ মণি বললেও সৌম্য যেহেতু একটু পাকা ছিল, তাই মণি নয়, স্বর্ণকে স্বর্ণমণি বলেই ডাকত। আর স্বর্ণও তাদের এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে, আসার পরদিন থেকেই তাদের সংসারটাকে নিজের সংসার মনে করেই দু'হাতে সামলাতো।

সৌম্যরা সব ক'টা ভাইবোন পশুপাখি খুব ভালোবাসে। তাদের কলকাতার বাড়িতে কুকুর, বিড়াল, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, খরগোশের পাশাপাশি সৌম্যর ভাই দর্শন একটা ছোট্ট বাঁদরের বাচ্চা পুষতে শুরু করেছিল। আদর করে নাম রেখেছিল রাঞ্চো।

দেখতে দেখতে তার বয়সও সাত-আট বছর হয়ে গেল। এতদিন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু কিছু দিন আগে তাদের এলাকায় যখন বন দফতর থেকে ঘনঘন হানা দিতে শুরু করল, যেদিন তাদের পাড়া থেকে একজনের পোষা বাজপাখিটাকে জোর করে নিয়ে গেল, তখন ভয় পেয়ে পরদিনই ভোররাতে একটা ছোট্ট ম্যাটাডর ভাড়া করে খাঁচাসমেত রাঞ্চোকে নিয়ে বারুইপুরের বাগানবাড়িতে রেখে এসেছিল দর্শন।

না, এ বাঁদর, মানে রাঞ্চো কলা খায় না। দই খায়। শসা খায়। লিচুর সময় লিচু, আঁশফল, সন্দেশ, কড়াইশুঁটি, পেয়ারা খায়।

সেদিন নাকি ওকে কিছুতেই খাওয়ানো যায়নি। স্বর্ণকে মাধুকাকা বলেছিলেন, এই দুপুরবেলায় ও না খেয়ে থাকবে? যা, ওকে তাহলে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে আয়।

রাঞ্চো যখন কলকাতায় ছিল, ছাড়াই থাকত। দর্শনের বুক জড়িয়ে কিংবা কাঁধে চড়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। শুধু সৌম্যদের বাড়ির লোকেরাই নয়, ওকে ভালোবাসত পাড়ার প্রায় সকলেই।

দর্শনের খুব ন্যাওটা ছিল ও। খানিকক্ষণ না দেখলেই দর্শন যে যে জায়গায় আড্ডা দিত, হুটহাট করে সেসব জায়গায় চলে যেত।

একদিন খুব ভোলবেলায় পাঁচিল টপকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল।

ওদের পাড়ায় ছিল মাদার ডেয়ারির একটি দোকান। যাঁরা দুধ নিতে আসতেন, তাঁরা সবাই রাঞ্চোকে চিনতেন। কিন্তু সেদিন এসেছিলেন একদম নতুন একজন লোক। তিনি দুধের পাউচ ভর্তি ট্রে-টা মাটিতে ঘসটাতে ঘসটাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘর্ষণের সেই বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনে লোকটার দিকে তেড়ে গিয়েছিল রাঞ্চো।

বাঁদরটাকে ওইভাবে তেড়ে আসতে দেখে লোকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি কামড়ে দেয়। তাই আগের দিন রাস্তার ধারে খুলে রাখা প্যান্ডেলের একটা বাঁশ তুলে সজোরে মেরেছিল বাঁদরটাকে। একটা নয়, পর পর বেশ কয়েক ঘা।

সেই যে লোকটা ওকে মারল, সে তো ওকে মেরে চলে গেল। আর তারপর থেকে কোনো লোক দেখলেই হল, তাকে কামড়ানোর জন্য তেড়ে যেতে লাগল। বাধা দিতে গিয়ে কামড় খেল দর্শনও। কামড়ে দিল বেশ কয়েকজন পথচলতি মানুষকেও।

বাঁদর পোষার জন্য তখন প্রচুর কথা শুনতে হয়েছে দর্শনকে। পাশাপাশি দিতে হয়েছে তাদের যাবতীয় চিকিৎসার খরচ। তখনই ঠিক করা হয়, আবার কখন কাকে কামড়াবে, তখন হয়তো শুধু ভর্তুকি দিলেই হবে না, এই নিয়ে থানা-পুলিশও হবে, তার চেয়ে বরং ওর জন্য একটা খাঁচার ব্যবস্থা করি।

তখন ওদের মাথাটা কাজ করেনি, একবারও মনে হয়নি আর কিছু দিন পরে সে যখন আরও বড় হবে, তখন এই খাঁচাটা ওর তুলনায় ছোট হয়ে যাবে। তাই বারুইপুরে নিয়ে আসার পরে একটা পুরো ঘরের সমান খাঁচা বানানো হয়

রাঞ্চোর জন্য। যাতে সে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারে। তখনই ভাবনাচিন্তা করা হয়, খাঁচাটা যখন এত বড় করাই হচ্ছে, তখন একটা মেয়ে বাঁদর আনলে কেমন হয়!

তখনই ঠিক হয়, এখন যেখানে খাঁচাটা আছে, সেখানেই বড় খাঁচাটা রাখা হবে। কিন্তু একবার বড় খাঁচাটা তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে টেনে হিঁচড়ে ওখানে নিয়ে যাওয়াটা খুব মুশকিল হবে। তাই রাঞ্চোর খাঁচাটাকে একটু দূরে সরিয়ে সেখানেই পাকাপাকি ভাবে তৈরি করা শুরু হয় বড় খাঁচাটি।

এতদিন যেখানে ছিল সেখান থেকে খাঁচাটি সরানোর জন্যই বুঝি সে খুব রেগে ছিল। তাই মাধুকাকা যখন বলল যা ওকে তাহলে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে আয়।

সেটা খাওয়াতে গিয়েই এই বিপত্তি। স্বর্ণ যখন রসগোল্লা খাওয়ানোর জন্য খাঁচাটার সামনে গেল, দেখল, না খাওয়ার জন্য খাঁচার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে সে ছুটোছুটি করছে। মাঝেমাঝেই ওপরে উঠে রড ধরে বসে থাকছে। হাজার ডাকলেও নামছে না।

স্বর্ণ তখন ওকে খাওয়ানোর জন্য ঘুরে ঘুরে খাঁচার ওদিকে ওদিকে গিয়ে ওর মুখের সামনে রসগোল্লা ধরছে। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝট করে ওর হাতটা টেনে নিয়ে রাঞ্চো এমন মারণ কামড় দিল যে, সেই যে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোনো শুরু হলো, একটা গোটা কোলগেট পেস্ট দিয়েও সেই রক্ত বন্ধ করা গেল না। শেষে পাশের বাড়ির যে ভদ্রমহিলা সারাদিনে পঞ্চাশ বার পান সেজে খান, তাঁর কাছ থেকে একগাদা চুন এনে কোনোরকমে বন্ধ করা হয় রক্ত।

স্বর্ণকে যখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, ও কিন্তু ডাক্তারকে একবারও বলেনি বাঁদরে কামড়েছে। যাদের ভয়ে ওকে কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, জানাজানি হলে যদি সেই বন দফতরের লোকেরা এসে ওকে নিয়ে যায়, তখন? তাই স্বর্ণ বলেছিল, বঁড়শি গেঁথে গেছে।

ডাক্তার সেই হিসেবেই ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন। খাবার ট্যাবলেটও দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঁদর কামড়ালে যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, ওকে তো সেটা দেওয়া হয়নি। রাত

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

থেকেই শুরু হয়েছিল যন্ত্রণা। কাটা পাঁঠার মতো দপাদপি করেছে সারা রাত।

স্বর্ণর অবস্থা বেগতিক দেখে দর্শনকে বারবার ফোন করেছিল মাধুকাকা। দর্শনকে না পেয়ে বাধ্য হয়েই ফোন করেছিল মেজদিকে।

আজ রাখিপূর্ণিমা। নিশ্চয় ওরা দু-ভাই তাদের মেজদির বাড়িতে প্রতিবারের মতো রাখি পরতে যাবে। ওখানে যাওয়া মাত্র দর্শন যাতে খবরটা পায় সেজন্যই উনি ফোন করেছিলেন।

ফোন রেখেই সৌম্যর দিকে তাকিয়ে মেজদি বলেছিলেন, স্বর্ণর অবস্থা খুব খারাপ রে। গোটা শরীর নাকি বেঁকে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওর চিৎকারে আশপাশের লোকজন সব জড়ো হয়ে গেছে। দর্শনকে ফোনে পাচ্ছে না। ও তো এইমাত্র রাখি পরে গেল। ফোন কর তো, ফোন কর, ফোন কর। এক্ষুনি ফোন কর।

সৌম্য যখন শুনল স্বর্ণমণির শরীর বেঁকে গেছে, তার মানে ওর ধনুষ্টংকার হয়েছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না গেলে ওকে বাঁচানো মুশকিল। তাই খাওয়া থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দর্শনকে ফোন করল সৌম্য। কিন্তু ফোন বেজে গেল, বেজেই গেল। আবার। আবার। অনেকবার চেষ্টা করেও ওকে না পেয়ে ফোন করল মিঠুকে।

মিঠু দর্শনের ছেলে। সে বলল, হ্যাঁ, বাবাকে না পেয়ে দাদু আমাকে ফোন করেছিল। আমিও বাবাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু পাইনি। তাই আমি একটা বন্ধুর বাইকে করে এক্ষুনি বারুইপুর যাচ্ছি।

সত্যিই খুব খারাপ অবস্থা স্বর্ণর। আর ভাবতে পারল না সৌম্য। সেই কোন ছোটবেলা থেকে তাদের সংসারটা সে সামলাচ্ছে। আজ তার এই অবস্থা। ফোন করল বড়দিকে— শুনেছিস? স্বর্ণমণির কী হয়েছে?

— কী হয়েছে? দিদি জিজ্ঞেস করতেও ও বলল, মাধুকাকা যা বলল, তাতে ও বাঁচবে কিনা সন্দেহ আছে।

সৌম্যদের বাড়ির উল্টোদিকেই থাকে সৌম্যর ছোটবোন। বারান্দার গ্রিলের ওপারে দেখতে পেয়ে তাকে বলল, স্বর্ণমণি বোধহয় আর বাঁচবে না রে!

খানিক পরেই ফোন করল মিঠুকে। তার বন্ধু এত জোরে বাইক চালিয়ে নিয়ে গেছে যে, পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই তারা কসবা থেকে বারুইপুর পৌঁছে গেছে।

সৌম্য জিজ্ঞেস করল, স্বর্ণমণি এখন কেমন আছে? মিঠু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নেই।

সৌম্য এই ভয়টাই পাচ্ছিল। ও যে কেন প্রথমেই ডাক্তারকে বলল না বাঁদর কামড়েছে, তা হলে তো ঠিকঠাক ইঞ্জেকশনটা পড়ত। এভাবে অঘোরে প্রাণ দিতে হতো না। এই দুঃসংবাদ ও কাউকে বলবে কী করে! কিন্তু এ সংবাদ তো চেপে রাখারও নয়। জানাজানি হবেই। তাই মেজদিকে ফোন করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মেজদি, স্বর্ণ আর নেই রে...

— কী বলছিস? আঁতকে উঠল মেজদি।

ফোন করল বড়দিকে। বড়দি স্তম্ভিত। সে কী রে! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। এই তো শেতলা পুজোর সময় যখন বারুইপুর থেকে আসছি, জোর করে একগাদা গোটা ফল আমার ব্যাগের মধ্যে ভরে দিল। বলল, নিয়া যান। পরে খাইতে পারবেন। এখানে তো খাওনের লোক নাই। পইড়া থাইকা থাইকা নষ্ট হইব— তুই কখন খবর পেলি?

— এই তো একটু আগে। মিঠু বলল।

— আমি ভাবতে পারছি না রে, মেয়েটার কী হলো! আমার হাত-পা কেমন যেন কাঁপছে। এ কী খবর শোনালি তুই...

ফোন করল ছোটবোনকে। সে বলল, আমাদের তো ওখানে যাওয়া দরকার। কী করে যাই বল তো? বডি কি বাড়িতেই আছে, না হাসপাতালে?

— আমি এখনও ঠিক পুরোটা জানি না।

— না, ওখানে তো মাধুকাকা ছাড়া কেউ নেই। সবাই তো এদিকেই থাকে। ওর বডিটা যদি এখানে আনা যায়, দ্যাখ না। তাহলে শেষ চোখের দেখাটা একবার দেখতে পাই।

বারুইপুরে দাহ করার জায়গা বলতে ওই একটাই। জোড়া মন্দির। তাহলে কী ও মাধুকাকাকে ফোন করে একবার বলবে, আমাদের ফ্যামিলির যারা মারা যায় তাদের সবাইকে তো কেওড়াতলাতেই দাহ করা হয়, ও তো আমাদের পরিবারেরই একজন। ওকে এখানে দাহ করলে হয় না?

কিন্তু না, বেশ কয়েকবার ফোন করেও মাধুকাকাকে না পেয়ে ও সোজা রওনা হয়ে গিয়েছিল বারুইপুরে। যে তাদের জন্য সারাটা জীবন দিয়েছে, শেষকৃত্যে তার পাশে না থাকলে হয়! লোকে কী বলবে!

বাগানবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পা রাখতেই সৌম্য বুঝতে পারল, স্বর্ণমণিকে কত লোক ভালোবাসত।

বাড়ির উঠোন জুড়ে এদিকে ওদিকে জটলা। ওকে দেখেই সবাই সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিল।

ও ঘরে ঢুকেই একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দেখল, মাধুকাকা খাটের উপরে বসে আছেন। আর তার ঠিক উল্টো দিকের সোফায় স্বর্ণমণি।

ওদে দেখেই স্বর্ণ বলল, আপনে?

— তুই?

— এই তো ডাক্তার দেখাইয়া আইলাম।

— ডাক্তার দেখিয়ে! বলেই ওর মনে পড়ে গেল মিঠুই তো তাকে বলেছিল, ও নেই। তার মানে? তাই সৌম্য জিজ্ঞেস করল, মিঠু কোথায়?

মাধুকাকা বললেন, এই তো ছিল, এখানে তো টাওয়ার পাওয়া যায় না, ফোন করার জন্য মনে হয় বাইরে গেছে, দ্যাগ না। উঠোনে গিয়ে দ্যাখ, ওখানে আছে মনে হয়।

মাধুকাকা এইভাবে কখনো ওর সঙ্গে কথা বলে না। তার মানে স্বর্ণমণিকে নিয়ে উনি খুব টেনশনে ছিলেন। সেই রেশ এখনও কাটেনি। তার ওপর কে যে রটিয়েছে ও মারা গেছে, সেই নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে আছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে সৌম্য দেখল, উঠোনের ওদিকে পায়চারি করতে করতে কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে মিঠু। ও সঙ্গে সঙ্গে মিঠুর কাছে গিয়ে প্রচণ্ড রেগে বলল, তুই আমাকে কী বলেছিলি?

জেঠুর কথা বলার এই টোন সে চেনে। তাই ফোনের ও প্রান্তে যে আছে তাকে বলল, এই একটু পরে ফোন করছি। বলেই লাইনটা কেটে দিয়ে জেঠুকে বলল, কী বলেছি?

— তুই যে বললি স্বর্ণমণি নেই!

— ছিল না তো, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। আমি এসে দেখলাম নেই। তাই তুমি জিজ্ঞেস করতেই বললাম, নেই। কেন, কী হয়েছে?

— ও তো ঠিকই আছে দেখছি।

— হ্যাঁ, ডাক্তার দেখিয়ে এল তো।

— না, মাধুকাকা যে মেজদিকে বলল, ওর শরীর বেঁকে গেছে?

— তাই নাকি? বেঁকে গেছে বলেছে? তাহলে যাও দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। ঘরে আছে তো।

সৌম্যরও মনে হল এটা জিজ্ঞেস করা দরকার। তাই ঘরে গিয়ে মাধুকাকাকে ও জিজ্ঞেস করল, আপনি মেজদিকে ফোন করে বলেছিলেন ও বেঁকে গেছে। কোথায়? ও তো দিব্যি আছে।

— বেঁকে গেছে? কে বলল? আমি তো ওকে বললাম পেকে গেছে। বাঁদরটা যেখানে কামড়েছিল সেই জায়গাটা পেকে গেছে।

তার মানে মেজদি পেকে-টাকে বেঁকে শুনেছিল। আর বেঁকে গেছে শুনেই মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই ধনুষ্টংকার হয়ে গেছে। আর ধনুষ্টংকার মানেই... তার ওপর মিঠু বলল নেই, তখন তার মনে হয়েছিল নেই মানে স্বর্ণ আর বেঁচে নেই। আর বেঁচে নেই ভেবেই, সে নিজেই সবাইকে ফোন করতে শুরু করেছিল।

সামান্য ভুল শোনা, আর সেই শোনার ওপর ভিত্তি করে অনেক কিছু ভেবে নেওয়ার জন্যই এই বিপত্তি।

যাক বাবা, যতই ভুল বোঝাবুঝি হোক, ও তো বেঁচে আছে, থুড়ি ভালো আছে, সেটাই অনেক। এবার আবার তাকে একের পর এক ফোন করতে হবে। মেজদিকে, বড়দিকে এবং ছোট বোনকে। বলতে হবে। গুছিয়ে বলতে হবে। এমন ভাবে বলতে হবে, সেটা নিয়ে যাতে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। কিন্তু কী বলবে সে। কী? □

With Best Compliments from :-

A

Well

Wisher

ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক মহর্ষি বেদব্যাস

গোপাল চক্রবর্তী

সদাহাস্যময় রসিক ধীবররাজের মনে ইদানীং শান্তি নেই। কারণ, আদরিণী কন্যা মৎস্যগন্ধা। এই কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে, কিন্তু উপযুক্ত বর জুটছে না। কন্যা অসামান্যা রূপবতী, ধীবর বংশে এই রূপ কদাপি দেখা যায়নি, কিন্তু তবুও কন্যার বিবাহে সংকট। কারণ এই অসামান্যা রূপবতী কন্যার দেহের উৎকট মৎস্য গন্ধ। জন্ম থেকে কন্যার দেহে মাছের গন্ধ, বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধ যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এই কন্যার জন্ম বৃত্তান্তও অলৌকিক। পরিচর নামে এক রাজার মনে হঠাৎ বৈরাগ্য এল, তিনি রাজ্যপাট ছেড়ে যৌবনে সন্ন্যাস নিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে বহু অনুনয়ে তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করেন এবং চেদি নামে এক রাজ্যে অভিসিক্ত করে এক সর্বসুলক্ষণা অযোনিসম্ভূতা কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। পত্নীনিষ্ঠ নৃপতি স্ত্রীসঙ্গে নিমগ্ন, এই সময় তাঁর পিতৃলোক মৃগ মাংসে শ্রদ্ধা করার জন্য আদেশ করেন। পিতৃলোকের আদেশে নৃপতি মৃগমাংস সংগ্রহের জন্য অরণ্যে মৃগয়ার উদ্দেশে গমন করলেন। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ বিচ্ছিন্ন নৃপতির মনে সর্বদা স্ত্রীর কথা মনে হতে থাকে। অবচেতন মনে তাঁর বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য একটি পাতায় বদ্ধ করে সঙ্গে স্থিত সঞ্চান পক্ষীর দ্বারা পত্নীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু দৈবাৎ সেই বীর্য যমুনার জলে পতিত হয় আর খাদ্য ভেবে এক বিরাটকায় মৎস্য সেই বীর্য গলাধঃকরণ করে। ঘটনাচক্রে দশমাস পর সেই মৎস্য ধরা পড়ে ধীবরের জালে। যমুনার তীরে সেই মৎস্য যমজ সন্তান প্রসব করে। সেই মৎস্য ছিল এক শাপভ্রষ্ট অপ্সরা। সন্তান প্রসবের পর তার শাপমুক্তি ঘটে। দিব্য দেহ ধারণ করে সেই অপ্সরা স্বস্থানে গমন করে। যমজ সন্তানের মধ্যে এক পুত্র আর এক কন্যা। চেদিরাজ পুত্রসন্তানটি নিয়ে কন্যাটি ধীবররাজকে দিলেন। চেদিরাজ পুত্রের নামকরণ করলেন মৎস্যরাজ। আর দেহের মৎস্যগন্ধ হেতু কন্যার নাম হলো মৎস্যগন্ধা।

ধীবররাজের বয়স হয়েছে, যমুনায় জাল পেতে মাছ ধরা, খেয়া পারাপার করা, আবার ধীবরপল্লীর মানুষদের ভালোমন্দ দেখা, ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা— সব দায়িত্ব তার ওপর। কন্যা মৎস্যগন্ধার উপর ধীবররাজ খেয়া পারাপারের দায়িত্ব দিয়েছে। মনে একটা

ক্ষীণ আশাও ছিল। এই পথে যাতায়াতকারী কোনো মহাত্মার সংস্পর্শে যদি তার দেহের মৎস্যগন্ধ দূর হয়। সারাদিন খেয়া পারাপার করে ধীবরকন্যা। পার হন মুনিঋষি, তপস্বী, বণিক-শ্রেষ্ঠী, চাষি, সৈন্য। কেউ নাসিকা কুঞ্চিত করে, কেউ বা উপেক্ষা করে। একদিন ঘাটে এলেন মহামুনি পরাশর। ওপারে যাবেন তিনি। ধীবরকন্যা তরণী ঘাটে নিয়ে এল।

কন্যার রূপ দেখে মোহিত হলেন মহামুনি পরাশর। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে তিনি কন্যার সঙ্গ প্রার্থনা করলেন। ধীবরকন্যা বিনীতভাবে বলল— আপনি ঋষিশ্রেষ্ঠ আর আমি ধীবরকন্যা। নীচ জাতি। আমি কুমারী আপনার ইচ্ছাপূরণ আমি কীভাবে করতে পারি? আর দেখুন, আমার দেহে মৎস্যগন্ধ, এই হেতু আমার নাম মৎস্যগন্ধা। কন্যার কথা শুনে মহর্ষি বললেন—

আমার সঙ্গে মিলনে তোমার কৌমার্য নষ্ট হবে না। আর তোমার দেহের মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হয়ে পদ্মগন্ধময় হবে। তুমি ধীবরকন্যা হলেও রাজরানি হবে।

সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার জন্য মুনিবর যমুনার মধ্যে এক দ্বীপ সৃষ্টি করে চতুর্দিকে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি করলেন। সেই দ্বীপে মুনি পরাশর মৎস্যগন্ধাকে আলিঙ্গন করলেন। তাতে কন্যার গর্ভসঞ্চার হয় এবং যথাসময়ে এক দেবোপম পুত্রের জন্ম হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই শিশুর পরিচর্যা করেন মা। দ্বীপে জন্মহেতু এই শিশুর নাম হয় দ্বৈপায়ন। সর্ব সুলক্ষণ হলেও শিশুর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, তাই নাম কৃষ্ণ, আর এই শিশু উত্তরকালে বেদ বিভাগ করলেন তাই নাম বেদব্যাস। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে এই শিশুর জন্ম। পরবর্তীকালে জগতে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে পরিচিত হলেন।

অতি শৈশবে মাতৃআজ্ঞা নিয়ে তিনি গঙ্গাতীরে কর্ণভদ্র তীর্থে পিতা মহর্ষি পরাশরের তপোবনে চলে আসেন। বিদায়কালে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, যেখানেই থাকুন, মায়ের আহ্বানে তিনি মাতৃসকাশে আগমন করবেন এবং নির্বিচারে মায়ের আজ্ঞা পালন করবেন। পিতা পরাশরের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য মেধাবী দ্বৈপায়ন, অল্প বয়সেই বেদবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে সমাধান করতে পারেন। পিতা পরাশর তাঁর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট, তাঁর ইচ্ছা এবার দ্বৈপায়ন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে দার পরিগ্রহ করুক। কিন্তু দ্বৈপায়ন সমগ্র বেদশাস্ত্র অধিগত হওয়ার আগে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে সম্মত নন। কিন্তু সমগ্র বেদবিদ্যা অধিগত করা সাধারণের সাধ্যাতীত। পিতা পরাশর ব্যাখ্যা করলেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ জম্বুদ্বীপের গহন অরণ্যে, দুর্গম প্রান্তরে বেদচর্চায় রত আছেন। সম্ভবত, জম্বুদ্বীপে এমন কোনো ঋষি নেই যিনি সমগ্র বেদ অবগত হয়েছেন। ইতিপূর্বে কয়েকজন ঋষি কিছু কিছু বেদমন্ত্র সংগ্রহ এবং বিন্যাস করে 'বেদব্যাস' উপাধি লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপে কোনো ঋষি সমগ্র বেদ অবগত নন জেনে দ্বৈপায়নের খুব আক্ষেপ হলো। তিনি চিন্তা করলেন, সমগ্র বেদ তাঁকে অধিগত করতেই হবে। কিন্তু পিতা পরাশরের মন সায় দিল না কিশোরপুত্রকে বেদমন্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপদসংকুল পথে ঠেলে দিতে। কিন্তু দ্বৈপায়ন অনড়। অবশেষে পিতা তাঁকে স্বীয় অভিষ্ট সাধনের জন্য নৈমিষারণ্যে গমনের সম্মতি দিলেন।

কর্ণভদ্র থেকে নৈমিষারণ্য অনেক দূরের পথ। কিশোর দ্বৈপায়ন একা যাত্রী। শ্বাপদসংকুল অরণ্য, পদে পদে বিপদ। অকুতোভয় দ্বৈপায়ন এগিয়ে চলেছেন। ফলমূল আহার আর স্রোতস্বিনীর জল পান। অবশেষে দীর্ঘ দিবস আর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দ্বৈপায়ন পৌঁছে গেলেন পরম কাঙ্ক্ষিত নৈমিষারণ্যে। এ যেন দ্বিতীয় নন্দন কানন। অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা, সুদৃশ্য কুটীর, পাশে পুণ্যসলিলা তটিনী, হোমানলে উজ্জ্বল ঋষিদের মুখে সমবেত বেদধ্বনি। ঋষি পরাম্পরায় তপস্যার ফলে পরম পবিত্র এই স্থান। তথাকার ঋষিকুল এই কিশোর পরিব্রাজকের ভক্তি-বিনম্র স্বভাব এবং জ্ঞানার্জনের পরিচয় পেয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করলেন এবং তাঁর মহৎ সংকল্পের কথা অবগত হয়ে সবিশেষ প্রীত হলেন। ঋষিকুল তাঁদের আহরিত বেদমন্ত্র এই নবীন তপস্বীকে শোনালেন। দ্বৈপায়ন অল্পদিনের মধ্যেই এইসব বেদমন্ত্র আয়ত্ত করলেন। বেশ কিছুদিন তপস্যা এবং বেদমন্ত্র সংগ্রহে নৈমিষারণ্যে অতিবাহিত করলেন দ্বৈপায়ন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের কাছে সন্ধান পেলেন জম্বুদ্বীপের নানা স্থানে অবস্থানরত অনেক বেদজ্ঞ ঋষির। উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে দ্বৈপায়নের আবার নতুন পথে যাত্রা শুরু। এবার খাণ্ডবপ্রস্থ এবং দণ্ডকারণ্য। খাণ্ডবপ্রস্থ মনোরম ঋষিনিবাস হলেও দণ্ডকারণ্য ঋষিদের বসবাসের পক্ষে সুখপ্রদ নয়। হয়তো তাই এখানে ঋষিদের সংখ্যাও সীমিত। দ্বৈপায়নের কিন্তু বেদমন্ত্র সংগ্রহের বিরাম নেই। ক্রমে তিনি পৌঁছে গেলেন জম্বুদ্বীপের শেষ প্রান্তে কুমারিকায়। সেখান থেকে পূর্ব সমুদ্রের তীরবর্তী ঋষিদের আশ্রম দর্শন করলেন। ক্রমে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। তারপর মহর্ষি গৌতমের আশ্রম, মহর্ষি তখন হিমালয়ে অবস্থান করছেন। গৌতমমুনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, দ্বৈপায়নের ইচ্ছা তিনিও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করবেন। একসময়ে তিনি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর হরিদ্বারে গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র রচনা করছেন তখন। দ্বৈপায়নের মতো জ্ঞানপিপাসু, বুদ্ধিদীপ্ত, অধ্যাবসায়ী যুবাকে শিষ্যরূপে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন গৌতম। গৌতমের আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করে দ্বৈপায়ন সাগ্রহে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনচর্চা এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন। দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের পর দ্বৈপায়ন আবার শুরু করলেন পরিক্রমা। এবার লক্ষ্য আরও বেদমন্ত্র সংগ্রহ করা। জম্বুদ্বীপের দুর্গম গিরিঅরণ্য, জনপদ ঘুরে ঘুরে দ্বৈপায়ন বেদজ্ঞ ঋষি মুনিদের কাছ থেকে বেদমন্ত্র সংগ্রহ করেছেন। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তিনি তখন বদরিকা আশ্রমে। হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হস্তিনাপুরের রাজদূত। এই হস্তিনাপুরেরই রাজ্ঞী তাঁর জন্মদাত্রী। মৎস্যগন্ধা যদিও এখন তাঁর নাম সত্যবতী। হ্যাঁ, দূত এসেছে সত্যবতীর কাছ থেকে।

সত্যবাদী ঋষি পরাশরের কাছে দ্বৈপায়ন তাঁর মাতৃপরিচয় পেয়েছেন। এই প্রথম মায়ের কথা তাঁর মনে পড়ল। মাতৃদর্শনের জন্য চিত্ত উন্মুখ হলো।

দ্বৈপায়নের জন্মের পর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর জীবনে। একদিন যমুনাতীরে হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু দেখলেন, ধীবরকন্যা অনুপমা সুন্দরী পদ্মগন্ধা সত্যবতীকে। দেখে বিমোহিত হলেন তিনি, ধীবরাজের কাছে সত্যবতীর পাণিপ্রার্থনা করলেন। ধীবররাজ শর্ত আরোপ করলেন, কন্যাদান তিনি করতে পারেন, তবে কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্যের অধিকার দিতে হবে। শান্তনু বীরপুত্র যুবরাজ ভীষ্মকে বঞ্চিত করে ধীবরকন্যাকে বিবাহের অভিলাষ পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু শান্তনু এখন যেন অন্য মানুষ, সর্বদা অন্যমনস্ক, রাজকার্যে অনীহা। ভোজন, শয়ন অনিয়মিত, চিন্তিত প্রজাবর্গ। পিতার এহেন পরিবর্তন দেখে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভীষ্ম গেলেন ধীবররাজের কাছে। সবিশেষ অবগত হয়ে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দাবি করবেন না। ধীবররাজের আশঙ্কা অনুযায়ী তাঁর পুত্র যাতে সিংহাসনের দাবি না করতে পারে সেই কারণে তিনি বিবাহও করবেন না।

সত্যবতী হস্তিনাপুরের রানি হলেন। যথাসময়ে তিনি চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম দেন। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে কাশীরাজের দুই কন্যার বিবাহ দিলেন ভীষ্ম নিজে। কিন্তু অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা বয়সে নবীনা কিন্তু নিঃসন্তান। কুরুকুল নির্বংশ হবে, চিন্তান্বিতা রাজ্ঞী সত্যবতী ভীষ্মকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবেন না। ক্ষত্রকুলের বহু ঘটনার উল্লেখ করে ঋষি নির্দিষ্ট ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাতেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কাজেই ভীষ্ম রাজি হলেন না। অগত্যা ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্ঞী সত্যবতী কানীনপুত্র দ্বৈপায়নকে আহ্বান করলেন কুরুবংশ রক্ষার জন্য।

কখনো পদব্রজে, কখনো বা রাজকীয় রথে আরোহণ করে দ্বৈপায়ন উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে রাজ্ঞী সত্যবতী এবং যুবরাজ ভীষ্ম সাদর অভ্যর্থনা করলেন তপস্বী দ্বৈপায়নকে। দ্বৈপায়নের বয়স তখন একত্রিংশ বছর। স্নেহময়ী জননীর অশ্রুজলে সিক্ত হলেন যুবক তপস্বী। অভ্যর্থনাপর্ব সমাধা হলে দ্বৈপায়ন জননীর কাছে জানতে চাইলেন তাঁকে আহ্বানের হেতু কী? সত্যবতী সবিস্তারে তাঁর কাছে সব ঘটনা বিবৃত করলেন এবং একথাও জানালেন যে, কুরু বংশ রক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। দ্বৈপায়ন যাতে মাতৃবাক্য অস্বীকার করতে না পারেন তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন বিদায় বেলায় শিশু দ্বৈপায়নের শেষ বাক্য যা সত্যবতী মাতৃহৃদয়ে সুদীর্ঘ বছর সযত্নে লালন করেছেন। শিশু দ্বৈপায়ন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন মায়ের আহ্বানে তিনি যেখানেই থাকবেন মাতৃসকাশে আসবেন এবং নির্দ্বিধায় মাতৃআজ্ঞা পালন করবেন। সবিশেষ অবগত হয়ে ব্রহ্মচর্যের পরিপন্থী হলেও মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করলেন দ্বৈপায়ন। কুরুবংশ রক্ষায় তিনি সম্মত হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে বধূদের পবিত্র হয়ে উত্তমশয্যায় শয়ন করার আদেশ দিলেন এবং সতর্ক করলেন তাঁর ভয়ংকর মূর্তি দেখে যেন বধূরা ভয় না পায়। রজনী সমাগতা হলে বধূ অম্বিকার ঘরে প্রবেশ করলেন দ্বৈপায়ন। তাঁর ভয়ংকর মূর্তি দর্শন করে অম্বিকা চক্ষুমুদ্রিত করল। দ্বৈপায়ন প্রমাদ গুনলেন। রাত্রি যাপনের পর সকালে রাজ্ঞী সত্যবতী এলেন দ্বৈপায়নের কাছে। ব্যাস বললেন, তিনি মাতৃআজ্ঞা পালন করেছেন। অম্বিকা এক মহাবলবন্ত সুদর্শন পুত্র লাভ করবেন, কিন্তু মায়ের দোষে সেই পুত্র হবে জন্মান্ধ। দশমাসে অম্বিকা এক অন্ধ সন্তান প্রসব করলেন। কুরুবংশের নৃপতি হবেন এক অন্ধ! সত্যবতী পুনর্বার পুত্র দ্বৈপায়নকে আহ্বান করলেন সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র উৎপাদনের জন্য। এবার কনিষ্ঠা বধূ অম্বালিকা পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে দ্বৈপায়নের আগমনে চক্ষু মুদ্রিত করলেন না। কিন্তু ভয়ে তাঁর মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। অম্বালিকা এক পাণ্ডু বর্ণ পুত্রের জন্ম দিলেন। রাজ্ঞী সত্যবতী এবার দ্বৈপায়নকে এক নিখুঁত জ্ঞানী পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করলেন। দ্বৈপায়ন মাতৃআদেশ পালনে আবার সম্মত হলেন। এবার কিন্তু অম্বিকা বা অম্বালিকা কেউ এলেন না। তাঁরা দ্বৈপায়নের কাছে এক সুলক্ষণা সুন্দরী শূদ্রাণী দাসীকে পাঠালেন। সেই দাসী ঋষিকে যথার্থ ভজনা করে এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত জ্ঞানবান পুত্র লাভ করেন। এইভাবে ঋষি দ্বৈপায়নের ঔরসে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুবর্ণ পাণ্ডু এবং জ্ঞানবান বিদুরের জন্ম হলো।

এবার বিদায়ের পালা। অশ্রুসিক্তা, স্নেহময়ী জননীর কাছে দ্বৈপায়ন প্রতিজ্ঞা করলেন, কুরুবংশের সংকটকালে তিনি উপস্থিত হবেন। আবার পথে নামলেন দ্বৈপায়ন, মাঝখানে কতিপয় দিবস যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল। রাজকীয় শকট তাঁকে কুরুরাজ্যের সীমানা অবধি পৌঁছে দিল। তারপর পদব্রজে বহু দিন পরে তিনি আবার বদরিকা আশ্রমে উপস্থিত হলেন। এখানে অনেক বেদজ্ঞ ঋষি, তাঁদের কাছ থেকে অনেক জ্ঞানমন্ত্র প্রাপ্ত হলেন। প্রাজ্ঞ প্রবীণ ঋষিরা বেদমন্ত্র রক্ষার জন্য চিন্তিত। তাঁরাও উপযুক্ত ধারক শ্রোতা শিষ্যের অনুসন্ধান করছিলেন। দ্বৈপায়নের মতো উপযুক্ত পাত্র পেয়ে তাঁরা উজাড় করে দিলেন। বহু ঋক্‌মন্ত্রে সমৃদ্ধ দ্বৈপায়নের আগ্রহ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তিনি আবার পরিক্রমা শুরু করলেন। এবার গন্তব্য যোগীবর মহর্ষি পতঞ্জলির আশ্রম। মহর্ষি পাতঞ্জলির বয়স হলেও জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। দ্বৈপায়ন তাঁর অভীষ্ট সম্পর্কে সম্যক জানালেন মহর্ষিকে। এবং ব্যক্ত করলেন বর্তমানে তিনি পতঞ্জলির কাছে অষ্টাঙ্গযোগ চর্চায় সবিশেষ আগ্রহী। পতঞ্জলি

তপোবনের নিভৃত কুটীরে অবস্থান করেন, শিষ্যদেরও দর্শন দেন না। কিন্তু দ্বৈপায়নের সম্যক পরিচয় পেয়ে মহর্ষি সবিশেষ প্রীত হলেন এবং সাগ্রহে দ্বৈপায়নকে যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দ্বৈপায়ন মহর্ষি পতঞ্জলির কাছ থেকে যোগ পক্রিয়ার বিশেষ পাঠ আত্মস্থ করলেন। পতঞ্জলি ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন, সমস্ত বেদ অধিগত করার সঙ্গে সঙ্গে যোগীরূপেও দ্বৈপায়ন খ্যাতিমান হবেন।

মহর্ষির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বৈপায়ন আবার পথ পরিক্রমা শুরু করলেন। এবার গিরিরাজ হিমালয়, হিমালয়ের নানা তীর্থে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে গুহাবাসী বেদজ্ঞ ঋষিদের সান্নিধ্যে এলেন দ্বৈপায়ন। ওই সময়ে লিপিবিদ্যার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু তা সহজসাধ্য ছিল না। বেদজ্ঞ ঋষিগণ তাঁদের অধিগত মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। দ্বৈপায়নও তাঁদের কাছ থেকে আহরিত মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করলেন। দ্বৈপায়ন অনুসন্ধান করে দেখলেন জম্বুদ্বীপে বর্তমানে আর কোনো বেদজ্ঞ ঋষি নেই। অতএব তাঁর সংকল্প সম্পূর্ণ। এবার তিনি পিতৃ সান্নিধ্যে যেতে পারেন। মহর্ষি পরাশরের এখন যথেষ্ট বয়স, এবার তাঁর কাছে অবস্থান করা সমীচীন। মহর্ষি পরাশরের গঙ্গাতীরস্থ কর্ণভদ্র তীর্থের আশ্রম এবার দ্বৈপায়নের গন্তব্য। অনেক দূরের পথ, সারাদিন পথ চলার পর কোনো আশ্রমে, দেবালয়ে কিংবা কোনো গুহা বা বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। জপতপ আর অধীত বেদমন্ত্র উচ্চারণের পর কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার, জলপানের পর বিশ্রাম। কতিপয় দিবস পরে দ্বৈপায়ন উপস্থিত হলেন পিতৃসকাশে কর্ণভদ্র আশ্রমে। দীর্ঘকাল পর পুত্রমুখ দর্শনে মহর্ষি পরাশর পরম প্রীতিলাভ করলেন। পরাশর এবার পুত্রকে দার পরিগ্রহ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তাব করলেন। দ্বৈপায়ন সবিনয়ে পিতাকে জানালেন, এখনও তাঁর দুটো প্রধান কাজ বাকি। প্রথমত, যে বেদমন্ত্র তিনি বহু ক্লেশ সহ্য করে সংগ্রহ করেছেন, তা রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ কালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন জনপদগুলি অজ্ঞানতা এবং মূর্খতায় পরিপূর্ণ। সেই অজ্ঞান মুর্খ জনপদবাসীদের সামনে জ্ঞানের আলো প্রজ্জলিত করা।

কিছুদিন পিতৃসান্নিধ্যে অবস্থান, পিতার কাছে বেদমন্ত্র সংগ্রহের অনুপার্বিক বর্ণনা, পিতার পরামর্শ শ্রবণের পর পিতার অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়ে আবার যাত্রা শুরু। আবার সেই নৈমিষারণ্য। প্রথমবার নৈমিষারণ্যে এলেছিলেন যখন তখন দ্বৈপায়ন বয়সে নবীন। এখন তিনি পঞ্চাশোর্ধ। তাঁর কৃতিত্বের জন্য নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। সমবেত ঋষিমণ্ডলীর কাছে দ্বৈপায়ন নৈমিষারণ্যে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর খ্যাতি তখন ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। রাজন্যবর্গ ও বণিকশ্রেণীর বদান্যতায় শীঘ্রই এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো এক বেদবিদ্যালয়,অধ্যক্ষ স্বয়ং দ্বৈপায়ন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে বিদ্যার্থীর দল সমবেত হতে থাকে নৈমিষারণ্যে।

দ্বৈপায়ন ততদিনে বেদব্যাস উপাধিতে ভূষিত। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। নৈমিষারণ্যে তখন মহোৎসব। স্থানীয় রাজন্যবর্গ এবং বণিকেরা বেদবিদ্যালয়ের অন্ত্যেবাসীদের জন্য বাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কুলপতি। তাঁর তত্ত্বাবধানে অহর্নিশি চলছে বেদচর্চা। এটি যে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বয়ঃক্রম ভেদে ব্রহ্মচারীদের তিনটি ভাগ হলো। বালক ব্রহ্মচারী, যুবক ব্রহ্মচারী এবং বয়স্ক ব্রহ্মচারী। বয়স্কদের মধ্যে যাঁরা বেদচর্চায় কিঞ্চিত অগ্রসর যাঁদের মেধা এবং অধ্যাবসায় অসাধারণ এমন চারজনকে বেছে নিয়েছিলেন বেদব্যাস। তাঁরা হলেন বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, পৈল ও সুমন্ত। মহর্ষির বিশেষ যত্নে এঁরা অচিরেই বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তাঁর সুযোগ্য শিষ্য চতুষ্টয়ের সহায়তায় বিক্ষিপ্ত বেদমন্ত্রসমূহের সংকলনে আত্মনিবেদন করেন। বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ, জৈমিনি সামবেদ, পৈল ঋক্‌বেদ এবং সুমন্ত অথর্ববেদ সংকলনে ব্যাসদেবকে সাহায্য করেছিলেন। মহর্ষি বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং তাঁর প্রধান শিষ্য বহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সঙ্গে বিরোধ করে শুক্ল যজুর্বেদ সংকলন করেন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদমন্ত্রের স্রষ্টা নন দ্রষ্টা। তিনি বেদ চতুষ্টয়ের রচয়িতা নন, সংকলক। সর্বকল্পে বর্তমান বেদমন্ত্র সমূহ তাঁর পূর্বকালেও বিদ্যমান ছিল। বেদ সংকলনের জন্য তিনি বেদব্যাস নামে বিশ্বের চিরপূজ্য। নারায়ণেরও অবতারস্বরূপ। ভূমিগুণ এবং কালগুণ লাভ করে বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় বিস্তৃত হয়, তেমনভাবেই বেদবৃক্ষ তাঁকে লাভ করে বহু শাখায় বিভূষিত হয়েছিল। মহর্ষি বেদব্যাস বেদোদ্ধার করে বেদকে ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব— চারভাগে ভাগ করেও নিশ্চিত হতে পারলেন না। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করে, বেদবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই অনুশীলনের ফলে বেদ কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডে এবং কর্মকাণ্ড সংহিতা ও ব্রাহ্মণে, জ্ঞান কাণ্ড আরণ্যক, উপনিষদে বিভক্ত হলো। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষে মানুষের জীবন সাধনা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস— এই চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল। মহর্ষি বেদব্যাস তেমনই অধিকারী ভেদে সাধনার বিবর্তনের জন্য চার আশ্রমের উপযোগী করে বেদ বিভক্ত করলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের জন্য বেদের মন্ত্র অংশ সংহিতা ভাগ স্বাধ্যায় কণ্ঠস্থ করার জন্য নির্দিষ্ট করলেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে বেদের ব্রাহ্মণ বিধানে সস্ত্রীক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হলো। ভোগাবসানে বাণপ্রস্থ আশ্রমের আরণ্যকের নির্দেশে ব্রহ্মচিন্তায় সম্মোহিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রব্রজ্যায় বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়ে উপনিষদ বেদান্তের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সমীচীন সুব্যবস্থা করে মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন। বেদের শেষ বা অন্ত বেদান্ত উপনিষদের সার সংকলন করে মহর্ষি বেদব্যাস

মুমুক্ষুমানব সম্প্রদায়ের পরম ও চরম মঙ্গল বিধান আর অমৃতত্ত্ব প্রদানের জন্য ব্রহ্মনিরূপণের যে সূত্র সমষ্টি প্রণয়ন করলেন, তাই ব্রহ্মসূত্র।

এই সমস্ত কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি ভাবছেন অজ্ঞ লোকের মধ্যে কীরূপে ধর্মভাব জাগ্রত করা যেতে পারে। সেই সময়ে সমাজ বিকৃতি ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। সদুপদেশ তাদের কাছে রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী হবে না। তবে গল্প শুনতে আপামর সকলেরই অভিরুচি থাকে। যদি সাধারণের চিত্তাকর্ষক কতকগুলি গল্প রচনা করে তাতে কৌশলে ধর্মকথা নিবিষ্ট করা যায় এবং স্পষ্টভাবে উপদেশ না দিয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎকার্যের সুফল ও অসৎকার্যের কুফল জ্বলন্তরূপে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাতে মানব সমাজের হিত সাধিত হতে পারে। এরূপ চিন্তা করে মহর্ষি ক্রমে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করলেন। গল্পগুলি প্রায়শ পুরাতন ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে মহর্ষি এইগুলিকে 'পুরাণ' নামে আখ্যায়িত করলেন। সম্ভবত ব্যাসদেব প্রথম পাঁচখানি পুরাণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এগুলি হলো শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গণেশ পুরাণ, আদিত্য পুরাণ এবং দেবী পুরাণ।

অপরাহ্নে বৃক্ষতলে বসে বেদব্যাস পুরাণপাঠ ও ধর্ম আলোচনা করেন। তাঁর সুললিত পাঠ এবং সহজ সরল আলোচনা সাধারণ মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তাদের চরিত্র ক্রমে উন্নত হতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল শ্রোতার সংখ্যা, প্রথমে শত শত পরে সহস্র সহস্র। বেদব্যাস তাঁর শিষ্যদেরও পাঠে নিয়োজিত করলেন। ক্রমে পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকে পাঠের আহ্বান আসছে। তাতে সাড়া দিয়ে ব্যাসদেব সশিষ্য বিভিন্ন জনপদে গিয়ে পুরাণকথা শোনাতে লাগলেন। শত শত শিষ্য নিয়ে মহর্ষি সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা শুরু করলেন। ভারতবর্ষের মানুষ ব্যাকুল, কখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁদের জনপদে পদার্পণ করবেন। বহু শিষ্য বেদব্যাসের অনুগামী। হঠাৎ কোনো জনপদে গেলে জলকষ্ট দেখা দেয় তাই ব্যাসের আগমনের পূর্বাভাস পেলেই নৃপতি বা শ্রেষ্ঠীরা নগরের উন্মুক্তস্থানে গভীর জলাশয় খনন করিয়ে রাখতেন। এগুলিকে বলা হতো ব্যাসকুণ্ড। নদী বা সমুদ্রে নির্মাণ করানো ঘাট, এগুলি ব্যাসঘাট নামে আখ্যায়িত। উন্মুক্ত প্রান্তরকে সশিষ্য ব্যাসের বসবাসের উপযোগী করে রাখতেন। সহস্র সহস্র বছর অতিক্রান্ত, অদ্যাপি সেই আখ্যান স্মৃতি বহন করছে এই কুণ্ড আর ঘাট। ভারতের পূর্বপ্রান্তে পর্বতবেষ্টিত চট্টগ্রাম (বর্তমান বাংলাদেশে) আর পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্র তীরবর্তী দ্বারকা। চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সীতাকুণ্ড তীর্থে ব্যাসকুণ্ড এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকায় ব্যাসঘাট অদ্যাপি বর্তমান।

সেই দ্বাপর যুগেও যে সর্ববর্ণ সমন্বয়ে এবং বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করার প্রথম প্রচেষ্টা মহর্ষি ব্যাসদেবের মধ্যে দেখতে পাই। মহর্ষি যখন নৈমিষারণ্যে পুরাণপাঠ আরম্ভ করেন, তখন সুত জাতীয় এক ব্যক্তি দূরত্ব বজায় রেখে একপাশে বসে নিবিষ্ট মনে পাঠ এবং ব্যাখ্যা শ্রবণ করতেন। সেই সময়ে সুত জাতি প্রতিলোম বলে সমাজে নিন্দিত ছিল। এই ব্যক্তি অন্য কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। দীর্ঘকাল পাঠ শ্রবণের পর তাঁর ইচ্ছা হলো মহর্ষিকে তিনি পুরাণ পাঠ করে শোনাবেন। একদা নিভৃতে মহর্ষির কাছে সুত এই প্রস্তাব দিলেন। মহর্ষি রাজি হলেন। সুত পুরাণ পাঠ করলেন। মহর্ষি সুতের সুললিত কণ্ঠ এবং সরস ব্যাখ্যায় পরম তৃপ্ত হলেন। সুতকে মহর্ষি তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মতো পুরাণপাঠ এবং ব্যাখ্যার জন্য অনুমতি দিলেন। অন্যান্য শিষ্যেরা এতে আপত্তি করলে মহর্ষি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, ধর্ম কথা যে কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে শোনা যেতে পারে। আর যে ব্যক্তি ধর্মকথা শোনাবে, সে ব্যাসাসনেও বসতে পারে। বৃক্ষমূলে বসে সুত পুরাণ পাঠ আরম্ভ করলেন। ক্রমে দেখা গেল, ব্যাসের অন্যান্য শিষ্যদের থেকে সুত-এর পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুনতে জনসমাগম বেশি হচ্ছে। পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের রচনা বলে যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক পুরাণের বক্তা হিসাবেও সুতকে পাওয়া যায়। যেমন কোনো কোনো পুরাণে উল্লেখ আছে, 'বৈশম্পায়ন উবাচ', তেমনি কোনো কোনো পুরাণে উল্লেখ আছে 'সুত উবাচ'।

নৈমিষারণ্যকে কেন্দ্র করে আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমিকে ব্যাসদেব জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করেছিলেন। দীর্ঘ সময় এই কার্যে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। শিষ্যদের ওপর সেই ভারত অর্পণ করে এবার তিনি বদরিকা আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। অতি সুরম্য সেই আশ্রম।

মহর্ষি বসে বসে ভাবছেন, জীবনের অনেক সময় পেরিয়ে এসেছেন আর বাকি কত? এভাবেই দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন মহর্ষির দৃষ্টিগোচর হলো এক চটক দম্পতি তাদের শাবকদের সযত্নে আহার করাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে মহর্ষির মনে অপত্য স্নেহ জাগ্রত হলো। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হলো পিতৃ আদেশ এখনও তিনি পালন করেননি। এই সময়ে তিনি ঘৃতাচী নামে এক গন্ধর্ব দুহিতার পাণি গ্রহণ করলেন। এই বিবাহের ফলে শুকদেব নামে তাঁদের এক মহাজ্ঞানী পুত্র লাভ হয়। শেষ জীবনে বদরিকা আশ্রমে বসবাসের জন্য মহর্ষি বদরায়ণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। আসলে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং মহর্ষি বাদরায়ণ একই শরীর।

তিনি ছিলেন হস্তিনার কুরুবংশের পুনঃস্থাপক। এই বংশের বিপদকালে তাঁকে আমরা বিপদগ্রস্তদের পাশে দেখতে পাই। বারণাবতে জতুগৃহ দহনের প্রাক্কালে আমরা ব্যাসদেবকে দেখি পাণ্ডবদের হিতোপদেশ দিতে। বনপর্বে দেখা যায়, শকুনি এবং কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে কাম্যকবনে পঞ্চপাণ্ডবকে নিধন করার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন, তখন মহর্ষি ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে তাদের নিবৃত্ত করেন এবং ঈদৃশ হঠকারিতায় প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দেন।

বনপর্বে একচক্রানগরে বকরাক্ষস বধের পর স্বয়ং ব্যাসদেব পঞ্চপাণ্ডব সকাশে উপস্থিত হয়ে তাদের পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হবার নির্দেশ দেন। বনপর্বের শেষ ভাগে আমরা আবার ব্যাসদেবের দর্শন লাভ করি। পঞ্চপাণ্ডব সকাশে উপস্থিত হয়ে মহর্ষি তাদের জয়ের বার্তা শুনিয়ে গেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে এই যুদ্ধ নিবারণের জন্য ব্যাসদেব অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধবিধির বিধান, তাই অনিবার্য, ব্যাসদেব নিশ্চেষ্ট হলেন। মাতা সত্যবতীকে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বাণপ্রস্থ গমনের অনুরোধ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ দর্শনের জন্য ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। সঞ্জয় সমগ্র যুদ্ধের ঘটনাবলী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তিনি স্থানেশ্বরের কাছে এক অস্থায়ী আশ্রম নির্মাণ করে বাস করেছিলেন। সেই স্থানটির নাম হয়েছিল ব্যাসস্থলী, অধুনা অপভ্রংশে বাস্থলী। যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ তিনি এই আশ্রমে বসেই সংগ্রহ করতেন।

যুদ্ধাবসানে জয়ী যুধিষ্ঠিরের আত্মীয়বধ ও নরহত্যার জন্য অনুশোচনা নিরসনার্থে ব্যাসদেব সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন। এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মহাভারতের শান্তিপর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ব্যাসের উপদেশে যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, ব্যাসদেব ছিলেন তার অধ্যক্ষ। পাণ্ডবরা সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ব্যাসদেব সেই অস্থায়ী আশ্রম ছেড়ে পুনরায় বদরিকা তীর্থে গমন করেন এবং সেখানে বসেই নিবিষ্ট চিত্তে মহাভারত রচনা করেছিলেন। মহাভারত রচনা শেষ হলে মহর্ষি উৎসুক শ্রোতাদের তা পাঠ করে শোনাতেন। বেদচর্চায় যেসব বর্ণের মানুষদের অধিকার নেই, তাদের জন্য মহাভারত পঞ্চমবেদ রূপে আবির্ভূত হলো। এরই সারৎসার ভগবদ্‌গীতা।

এত গ্রন্থ রচনা করেও ব্যাসের মনে তৃপ্তি ছিল না। কোথায় যেন একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। ব্যাসের মনোভাব বুঝতে পেরে ব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি ব্যাসকে বললেন, 'ভগবানের যশ বর্ণনা ছাড়া তাঁর পরিতোষ হয় না। সেহেতু মনোহর পদাবলী সংবলিত বাক্য রচনা বৃথা, যদি তাতে শ্রীহরির গুণকীর্তন না হয়। যে গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে ভগবানের গুণকীর্তন আছে সেই গ্রন্থই মানুষের পাপ নাশে সমর্থ। সেই গ্রন্থপাঠে সাধুগণ ভগবানের নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্তন করার অবসর পেয়ে থাকেন।'

ব্যাসদেব নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ভগবানের গুণকীর্তন আছে সেই 'শ্রীমদ্‌ভাগবদ' রচনায় ব্রতী হলেন। এই মহাগ্রন্থ রচনা শেষ হলে সুযোগ্য শ্রোতা হিসাবে তিনি পুত্র শুকদেবকে মনোনীত করলেন। দ্বাদশ স্কন্ধ বিশিষ্ট শ্রীমদ্‌ভাগবদ শ্রবণ করালেন পুত্র শুকদেবকে। যে মহাজ্ঞানী শুকদেব সর্বদা মৌন থাকতেন, তিনি মনুষ্যলোকে শ্রীহরির গুণকীর্তনে আনন্দধারা সিঞ্চনের জন্য মুখর হলেন।

মহর্ষি গৌতমের কাছে শিষ্য রূপে দ্বৈপায়ন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র রচনার সময় শিষ্য বেদব্যাস গুরু গৌতমের ন্যায়দর্শনের মতগুলি কোথাও আংশিক বা কোথাও সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করেছিলেন। শিষ্যের এহেন আচরণে গুরু গৌতম প্রচণ্ড রুষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এহেন অকৃতজ্ঞ শিষ্যের মুখদর্শন করবেন না। ঘটনাক্রমে নাসিকের মহামেলায় গুরুশিষ্য উভয়ে উপস্থিত হলেন। গুরু গৌতম উপস্থিত হয়েছেন জেনে শিষ্য বেদব্যাস গুরু প্রণামের জন্য অগ্রসর হতে মহর্ষি গৌতম দীর্ঘবস্ত্রখণ্ড দিয়ে চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করলেন, যাতে অকৃতজ্ঞ শিষ্যের মুখ দর্শন করতে না হয়। গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভুলুণ্ঠিত বেদব্যাস তাৎক্ষণিক ভাবে এক গুরু প্রশস্তি রচনা করে আবৃত্তি করলেন। এই সুললিত প্রশস্তি শুনে গুরুর সমস্ত ক্ষোভ প্রশামিত হলো। তিনি চক্ষুর আচ্ছাদন উন্মোচিত করে শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। গুরু শিষ্যের মিলন হলো। মেলায় উপস্থিত মুনিঋষি থেকে সাধারণ মানুষ সবাই ধন্য ধন্য করলেন। ব্যাস পাণিনির বহু পূর্বে আবির্ভূত হলেও ব্যাসের ভাষা ছিল ব্যাকরণগত দিক থকে বিশুদ্ধ এবং অতুলনীয় কাব্যময়।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনপদে জনপদে বেদব্যাস শ্রদ্ধেয় এবং অতি পরিচিত নাম। ব্যাস রচিত অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনি তখন লোকের মুখে মুখে। সত্যের জয় এবং পাপের বিনাশ। এই আদর্শ ব্যাসদেব মানুষের অন্তরে স্থাপন করতে পেরেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারা ভারতের মানুষ তার প্রমাণও পেয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে ব্যাসদেবের মূল মহাভারতও তখন রচিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাপর যুগের শেষ এবং কলির সূচনা হয়। সর্প যজ্ঞে বহু নিরপরাধ সর্পের বিনাশের কারণে পাপবোধ থেকে জন্মেঞ্জয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হবার পরিকল্পনা করেন। শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ মহারাজ জন্মেঞ্জয়কে কলিযুগে 'অশ্বমেধযজ্ঞ' নিষিদ্ধ বলে তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু জন্মেঞ্জয় ঋষিদের পরামর্শ উপেক্ষা করে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হন। এই যজ্ঞ সমাপন কালে বিভিন্ন অমঙ্গলের সূচনা হতে থাকে। পূর্বাপর কুরুবংশীয়দের সংকটকালে ব্যাসদেব যেমন তাঁদের পাশে সংকটমোচন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবারেও জন্মেঞ্জয়কে উদ্ধারের জন্য ব্যাসদেব অগ্রসর হলেন। ব্যাসের পরামর্শে মহারাজ জন্মেঞ্জয় কুরুবংশীয়দের গৌরবগাথা মহাভারত শ্রবণ করে অশ্বমেধ জনিত পাপ থেকে মুক্ত হলেন। ব্যাসের নির্দেশে ব্যাসশিষ্য ঋষি বৈশ্বাম্পায়ন এই সভায় মহাভারত পাঠ করেন। সুত পুত্র সৌতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাভারত লিপিবদ্ধ করেন। তবে পরবর্তীকালে মহাভারতে প্রচুর অংশ প্রক্ষিপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়েছে। তেমনই ব্যাসের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণেও যুগে যুগে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষময় ব্যাসের নামে প্রচলিত সহস্র সহস্র স্তবস্তুতি সবগুলি মূলত ব্যাস

রচিত কিনা সন্দেহের অবকাশ থাকে। কারণ কিছু কিছু রচনার মান ব্যাসের মূল রচনার সমমানের নয়। তবে ব্যাস সর্বকালের এমন এক জনপ্রিয় নাম তাঁর নামে প্রচলিত যে কোনো রচনাই জনপ্রিয় হয়েছে। পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাসের নামের সঙ্গেও বহু নিম্নমানের রচনা সংযুক্ত হয়েছিল,সেগুলি যথাসময়ে চিহ্নিত হয়েছে।

ত্রিশত বর্ষেও জরা মহর্ষিকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর অভিলাষ আর একবার ভারতবর্ষ পরিক্রমা করা। কতিপয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। জনপদের পরিবর্তন হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, ধর্মবিমুখ মানুষ ধর্মমুখী হয়েছে দেখে ব্যাস তৃপ্ত হলেন। স্থানে স্থানে নতুন দেবালয় গড়ে উঠেছে। বহু নগর, তীর্থ পরিক্রমা করে সশিষ্য ব্যাসদেব উপস্থিত হলেন ভারতের অন্যতম প্রাচীন তীর্থ কাশিধামে। কাশিধামে ব্যাসদেব আগেও এসেছেন, তবে এবারে দেখলেন কাশির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ব্যাসের আগমন সংবাদে নগরবারী উল্লসিত। বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে ব্যাসদেব তাৎক্ষণিক ভাবে শিবস্তুতি রচনা করে সর্বসমক্ষে পাঠ করলেন। কাশিধামের প্রবীণ ও নবীন পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে মহর্ষি অনুধাবন করলেন, কাশিধাম সম্পূর্ণরূপে শৈব সম্প্রদায়ের করতলগত। অন্য চার সম্প্রদায় বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গানপত্যরা এখানে ব্রাত্য। শৈবরা অন্য চার সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন। স্বয়ং ব্রহ্মবাদী হয়েও মহর্ষি' বিষ্ণু, শিব, দেবী, সূর্য ও গণপতির নামে পঞ্চপুরাণ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত উদারপন্থী। কাশিধামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মহর্ষির হৃদয়কে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করলেন, এই সাম্প্রদায়িকতা একদিন ভারতবর্ষের আর্য ধর্মকে বিপন্ন করবে।

গঙ্গার অপর তীরে জনহীন প্রান্তরে যদি উদার মতাবলম্বী আর একটি তীর্থ স্থাপিত হয়, তবে সাম্প্রদায়িক ধর্মের যে ত্রুটি তা বহুলাংশে প্রকাশিত হতে পারে। তীর্থযাত্রীরা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সঙ্গে উদারপন্থী ধর্মমতের সহাবস্থান দেখতে পাবেন। মহর্ষির মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদারপন্থী ধনাঢ্য ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠী সাধারণ মানুষ সকলেই নতুন নগর নির্মাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষমতায় সচেষ্ট হলেন। অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠল ভবন, মার্গ, পুষ্করিণী, বিপণী। গড়ে উঠল দেবালয়, স্থাপিত হলো নতুন বসতি। কাশির সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ প্রমাদ গুনলেন। ব্যাসের কাশী প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বনাথের কাশীর গুরুত্ব কমে যাবে। কাজেই ব্যাসকাশী যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তার জন্য সচেষ্ট হলেন তাঁরা। তাঁরা প্রচার করতে শুরু করলেন, শিবের কাশীতে মৃত্যু হলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়, আর ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হলে গর্দভ হয়। ইদৃশ কুবাক্য ইতরজনের মুখে মুখে ঘুরছে। মহর্ষি মানুষের এহেন নীচতায় ব্যথিত হলেন। যে মানুষের মানসিক উন্নতির জন্য মহর্ষি জীবনপাত করেছেন, সেই মানুষের নীচতায় বিচলিত হলেন দূরদর্শী মহর্ষি। আর্যধর্মের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন তিনি। নিশ্চিত হলেন এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা একদিন ভারতের সার্বিক ঐক্য বিনষ্ট করে দেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবে। ভগ্নমনোরথ হয়ে কাশী থেকে বদরিকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন মহর্ষি। কথিত আছে, প্রায় চারশত বছর বেঁচে ছিলেন ব্যাসদেব। আবার কারও মতে, তিনি অমর।

মহর্ষি ব্যাসদেবের পুরাণ প্রচার আপামর ভারতবাসীর মনে ধর্মাধর্মের বিচারবোধ জাগ্রত করেছে। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছে, সর্বোপরি নির্মল আনন্দ দিয়েছে। এরই পরম্পরা হিসাবে পরবর্তীকালে সমাজে যাত্রা, কীর্তন, কথকতা এসব শিক্ষা তথা বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকার পথও সুগম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিশেষত বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে পুরাণাশ্রিত অসংখ্য যাত্রা, নাটক এবং সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মপথে ব্যাসদেব ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তাঁর ধর্মমত ছিল সম্পূর্ণ এবং সর্বতোমুখী। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরমেশ্বরের কাছে তিনি তিনটি বিষয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন—

'রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং।
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তা খিলওরোদূরীকৃতা যন্ময়া।।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যতীর্থরোর্দূরীকৃতাযন্ময়া।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং।।'

—অর্থাৎ, হে জগদীশ তোমার রূপ না থাকা সত্ত্বেও আমি যে ধ্যানাদি দ্বারা রূপ কল্পনা করিয়াছি এবং স্তুতি রচনা করিয়া তোমার যে অনির্বচনীয়তাকে দূরীকৃত করিয়াছি, তুমি সর্বব্যাপী হইলেও তীর্থযাত্রাদিদ্বারা যে তোমাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছি, আমার এই তিনটি অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

সম্ভবত এটাই ছিল পরমেশ্বরের কাছে মহর্ষির শেষ প্রার্থনা। যা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভারতবাসীর জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন, যুগধর্মের নিরিখে তা অতুলনীয়। ভারতবাসী তাঁকে গুরুর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাই তাঁর জন্মতিথি আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিকে 'গুরুপূর্ণিমা' রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

'ত্বাং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং।
চর্মাবিরং কৃষ্ণতাত্বিষং মুনিভিঃ পূজিতং।।
কনক-পিঙ্গল-জটা-কলাপংকবীন্দ্রং।
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং ঋষিণাং।।

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE ULTRA
RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : scibwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : scical@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scidel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

নন্দনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

লাগাতার গাড়ি যাচ্ছে। ধুলো উড়ছে। সন্ত্রস্ত পথচারিরা রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে, গাড়ির স্রোত কমে এলে ওপারে যাবে। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে শিঞ্জিনী ভাবছিল, সেও একদিন গাড়ি চেপে গন্তব্যে যাবে। কিন্তু সেদিনও সে আজকের মতোই ভালোবাসবে সাধারণ মানুষকে। নইলে আর কীসের জন্য রাজনীতিতে যাওয়া?

মেঘনা বলে— বোলপুরও যে দিন-দিন কলকাতা হয়ে যাচ্ছে রে!

শিঞ্জিনী কপালে উড়ে আসা চুল সরাতে সরাতে বলে— শান্তিনিকেতনে কিন্তু এত ভিড় হয় না। পৌষমেলা আর বসন্তোৎসবে ভিড় হয় বটে, কিন্তু এরকম লাগে না।

— তার কারণ শান্তিনিকেতনের রাস্তায় এত বাস, লরি যায় না। ট্রাফিক থেমেছে। চল ওপারে যাই।

দ্রুত রাস্তা পেরোয় দু'জন। সারি সারি টোটো।

— শান্তিনিকেতন যাবেন?

মেঘনার প্রশ্নে টোটোচালক মাথা নাড়ে।

টোটোয় মুখোমুখি বসে দুজন।

শিঞ্জিনীর গলায় আফশোসের সুর— ধুস! শেষ পিরিয়ডটা হলো না!

মেঘনা হাসছে— তোর আর কী? সিলেবাসের সব গল্প, কবিতা, নাটক তো প্রায় মুখস্থ। সবাই তোর মতো পড়ে না। রিনি সেদিন বলছিল, হার্ডির অত মোটা উপন্যাসটা পড়ব কখন, আর পড়বোই বা কেন? নোট মুখস্থ করেই কাজ চলে যাচ্ছে। তুই যে কীভাবে এত পড়িস! সাহিত্য এত ভালোবাসিস, তবু তুই রাজনীতিতে যেতে চাস কেন? রাজনীতি তোর ভালো লাগে? মির্চা এলিয়াদ অমৃতাকে লিখেছিল, 'আমি শিক্ষার জগতে দুর্নীতিকে দেখেছি, এখন ধর্মজগতের গোঁড়ামিকেও দেখছি। চারদিকে যত মিথ্যার বেসাতি দেখছি, আমার তত শান্তি হচ্ছে যে আমি দুঃখ পাচ্ছি, আমি সুখি হতে চাই না। সুখ চাই না।' এযুগে জন্মালে মির্চা নিশ্চয়ই বলতেন, আমি শিক্ষার জগতে দুর্নীতিকে দেখেছি, আর রাজনীতির জগতে ভণ্ডামিও দেখছি।

শিঞ্জিনী থমকায়। সে ধর্মজগতের গোঁড়ামি দেখেনি, রাজনীতির জগতের ভণ্ডামিও নয়। সে শুধু সংসার জীবনের ভণ্ডামি দেখেছে।

— তোর সুন্দর মুখটা অবশ্য প্লাসপয়েন্ট। মুখ দেখেই অনেকে জিতিয়ে দেবে।

— ধুস!

মেঘনা অনর্গল কথা বলে যায়— কেন তার রাজনীতি ভালো লাগে না। কোন কোন নেতার নামে কী কী অভিযোগ রয়েছে।

সব জানে শিঞ্জিনী। তবু সে স্নাতক স্তরের পড়াশুনা শেষ করে আইন পড়বে। তারপর রাজনীতি করবে, প্রচুর ক্ষমতা চাই তার। অনেক আইন সে পাল্টাবে। সেদিনও মানুষকে ভালোবাসবে সে। সেদিনও স্বপ্ন দেখবে। নাকি সব স্বপ্ন সেদিন তার হাতের মুঠোয়! স্বপ্ন চোখে বেশি সুন্দর, না মুঠোয়? নিশ্চয়ই মুঠোয়।

রাস্তার দু-ধারে সারি সারি সুন্দর বাড়ি। সব বাড়ির সামনে মনোরম বাগান।

— আজ বিকেলে সোনাঝুরির হাটে যাব, শিঞ্জিনী?

মেঘনার প্রশ্নে সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওর চোখে চোখ রাখে— কী কিনবি?

— পাটের সাইডব্যাগ। পৌষমেলায় কিনেছিলাম। বোনকে দিয়ে দিয়েছি। একেবারে খোয়াই দেখে, ডিয়ার পার্ক দেখে ফিরব।

— বেশ, যাব।

সামনে নাট্যঘর। ডানদিকে কলাভবন, রামকিঙ্কর নির্মিত অপরূপ মূর্তি, আশ্রম। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় লেখাপড়ায় মগ্ন। বাঁদিকে উত্তরায়ণ। কাঁচমন্দির, আনন্দ পাঠশালা পেরিয়ে টোটো এগিয়ে চলে।

— এখানে নামব।

মেঘনার কথায় টোটো থামাল চালক। ভাড়া মিটিয়ে ওরা নামে।

দোতলা বাড়ি। সামনে বাগান। তালা খুলে ঘরে ঢোকে দু'জন।

মেঝেয় কমলা টাইলস্, একটাই ঘর। লাগোয়া রান্নাঘর, রান্নার মাসি সকালে এসে রান্না করে গেছে।

ব্যস্ত হাতে পোশাক পাল্টায় শিঞ্জিনী। মেঘনাও। মুখ-হাত ধোয়।

তারা ডাইনিং টেবিলে। ভাত, বেগুন ভাজা, আলুপোস্ত, ডিমের ডালনা। খেয়ে মেঘনা মোবাইল নিয়ে খাটের এক কোণে বসে। শিঞ্জিনী টেবিল থেকে অ্যাডগার অ্যালান পো-র র‍্যাভেল তুলে নেয়, পড়তে শুরু করে।

অনেক পড়তে হবে তাকে। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, সব। নির্বোধ নেত্রী হতে চায় না সে।

সহসা সেদিনটা ভেসে এলো চোখের সামনে। গ্রামের মাটির বাড়ি, উঠোনের বুকে চরাচর জুড়ে গনগনে রোদ। বারান্দায় তারা দু'জন। সে আর মা।

মায়ের স্বরে বিরক্তি— সুহাস আমাদের বাড়িতে আসে কেন? কেন তুই রাজনীতি করছিস?

সে নীরব।

— মন দিয়ে পড়াশুনা কর। কলেজে পড়াবি, নয়তো স্কুলটিচার হবি।

মা জানে না, শিঞ্জিনীর স্বপ্ন অনেক বড়ো। সে আকাশ ছুঁতে চায়।

— নাট্যোৎসব কবে থেকে শুরু রে?

— আর তো এসে গেল, মহালয়ার পনেরদিন আগে।

— নাট্যঘরেই হবে তো?

— হ্যাঁ।

মোবাইল বাজছে। সঞ্জীবদা।

— বলো সঞ্জীবদা।

— তুমি কোথায় রয়েছে শিঞ্জিনী?

— বাড়িতে।

— একটা কাণ্ড হয়েছে। কলেজের দেওয়ালে কারা যেন নোংরা নোংরা কথা লিখেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বিকৃত করে লিখেছে।

— সে কী!

— শোন, এই সুযোগ। বিরোধীরা কিছু বলার আগেই প্রচার করতে হবে যে, ওরাই এসব লিখেছে।

— কিন্তু, আসলে কারা লিখেছে?

— জানি না। তুমি এক্ষুনি কলেজে এসো। তোমার কথা সবাই বিশ্বাস করবে। যদি বিশ্বাস করে বিরোধিরা এসব করেছে, তাহলে এবার ইলেকশনে আমাদের জয় অনিবার্য।

সঞ্জীবদা ফোন কেটে দেয়।

দ্রুত পোশাক বদলাচ্ছে শিঞ্জিনী। সবুজ দোপাট্টা জড়াচ্ছে গলায়।

— কোথায় যাবি?

মেঘনার প্রশ্নে সে সংক্ষেপে বলে— কলেজে।

— কেন?

— কাজ আছে।

— কী কাজ?

— পরে বলব।

বারান্দায় এসে থমকায় শিঞ্জিনী। এই কী জেতার একমাত্র পথ? নির্দোষ লোকের ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? সৎ পথে কি জেতা যায় না? বাগানের ফুলগুলো আকুল হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। যেন বলছে, মিথ্যা বলো না, মিথ্যা বলো না শিঞ্জিনী।

কিন্তু মিথ্যে বলে বলেই তো তাকে জিতে জিতে অনেক উপরে উঠতে হবে। কী যেন বলেছিল শেক্সপিয়রের ক্লাউন? "Virtue that transgresses is but patched with sin and sin that

amends is but patched with virtue"।

কিন্তু মা শুনলে কী বলবে? তার আজন্ম অন্যায় না-করা মা!

সে ঘরে আসে, ব্যস্ত হাতে দুটো সালোয়ার কামিজ ব্যাগে ভরে। মেঘনা বিস্মিত— এসব নিয়ে কলেজে যাবি?

— না, মায়ের কাছে যাব।

— এখন তো ছুটি নেই!

— দু'দিন পর ফিরব।

।। দুই।।

সূর্যাস্তের রাঙা আলো তেরছাভাবে পড়েছে ধানক্ষেতের বুকে। তারপর লোকালয়, কোথাও পাকা বাড়ি, কোথাও টালির। একটা বাড়ির সামনে থামে শিঞ্জিনী। দুধারে কল্কে গাছ। ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে আছে।

সে কড়া নাড়ে।

দরজা খুলে যায়। সামনে মা। তাকে দেখে বিস্মিত। শীর্ণ চেহারা, এই বয়সেও সুন্দরী। এই তার মা। তার গর্ব, পরনে সস্তা ছাপা শাড়ি। মায়ের নিজের রোজগারে কেনা। বৌভাতের দিন সকালে বাবা নিশ্চয়ই মায়ের হাতে শাড়ি দিয়ে সর্বসমক্ষে বলেছিল, আজ থেকে তোমার ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব আমার। অনুষ্ঠান করেই তো বিয়ে হয়েছিল ওদের! বিয়ের সময় নিশ্চয়ই বাবা বলেছিল—

'যদিদং হৃদয়ং তব,
তদিদং হৃদয়ং মম।
যদস্তু হৃদয়ং তব,
তদস্তু হৃদয়ং মম।'

তার জন্মের সময় মা এবাড়িতে আসে। দিদার কাছে। সাতমাস পর বাবার বাড়িতে যায়।

সূর্য প্রখর রোদ ছড়াচ্ছিল। সে রোদে ফুলেরা নুয়ে পড়েছিল, মা দেখেছিল বাবার ঘরে অন্য নারী। কাউকে দোষারোপ না করে মা ফিরে এসেছিল। আর যায়নি। দিদার কাছে সব শুনেছে শিঞ্জিনী।

— সকালে ফোন করলাম। বললি না তো আজ আসবি?

মাকে কী আপন মনে হচ্ছে তার। কেন এত সৎ হলে মা? আমাকেও এমনই সৎ করে গড়লে? একটু অন্যায় করলে, অন্যায় দেখলে বুক পুড়ে যায়। সে বড়ো হবে, টিভিতে তার সাক্ষাৎকার নেবেন কতজন! সে মায়ের কথা বলবে। আমার মা একা আমাকে বড়ো করেছে। কোনোদিন অন্যায় করেনি।

মিথ্যের সিঁড়ি বেয়ে বড়ো হয়ে কী হবে? সে মায়ের কাছে রাজনীতি শিখবে। মা বলে— আয়, ভিতরে আয়।

— মা, আমাকে রাজনীতি শেখাবে?

মা হকচকিয়ে যায়। তারপর হাসে— আমি রাজনীতির কী জানি?

— আমি তোমার কাছেই রাজনীতি শিখব। □

With Best Compliments from :

ITAG BUSINESS SOLUTIONS LTD.

INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS

Subham Plaza, Suit # 1C, 1st Floor
83/1, Dr. S. C. Banerjee Road,
Kolkata - 700 010
Ph: + 91 33 2363 3924 / 25
F: + 91 33 2372 0635
W: www.itagbs.com E: info@itagbs.com
CIN : U7414-0TG20-07PLC-053476

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

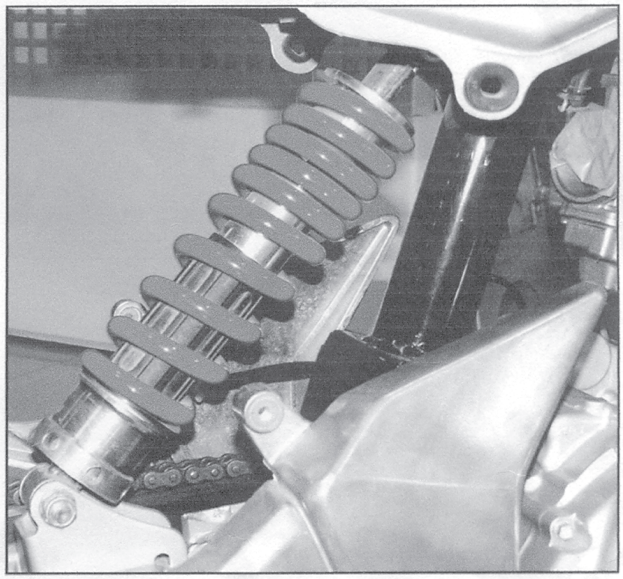

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

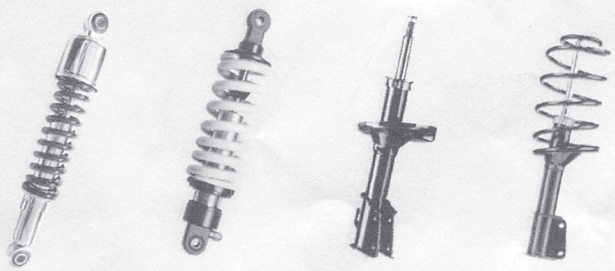

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

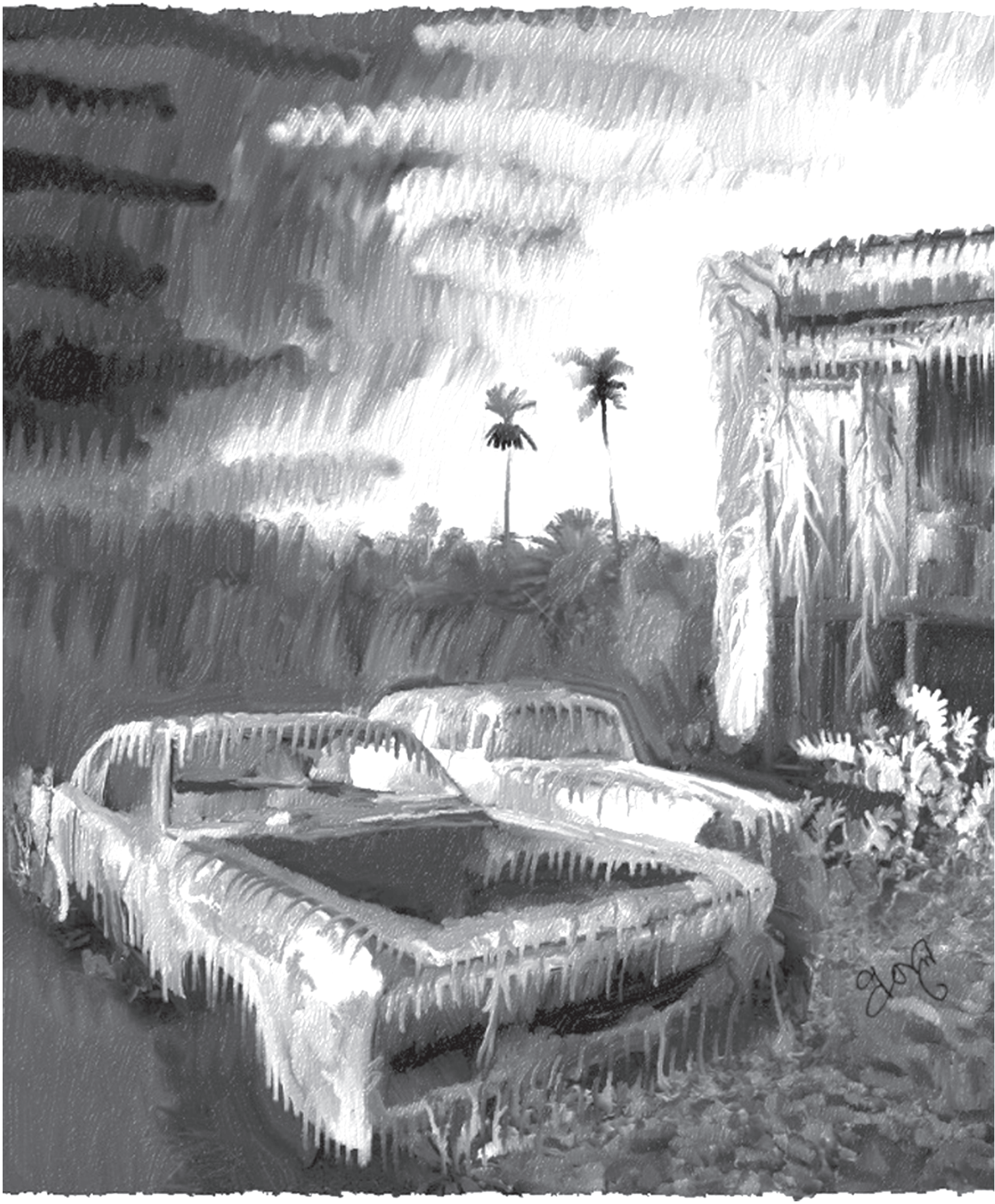

উপন্যাস

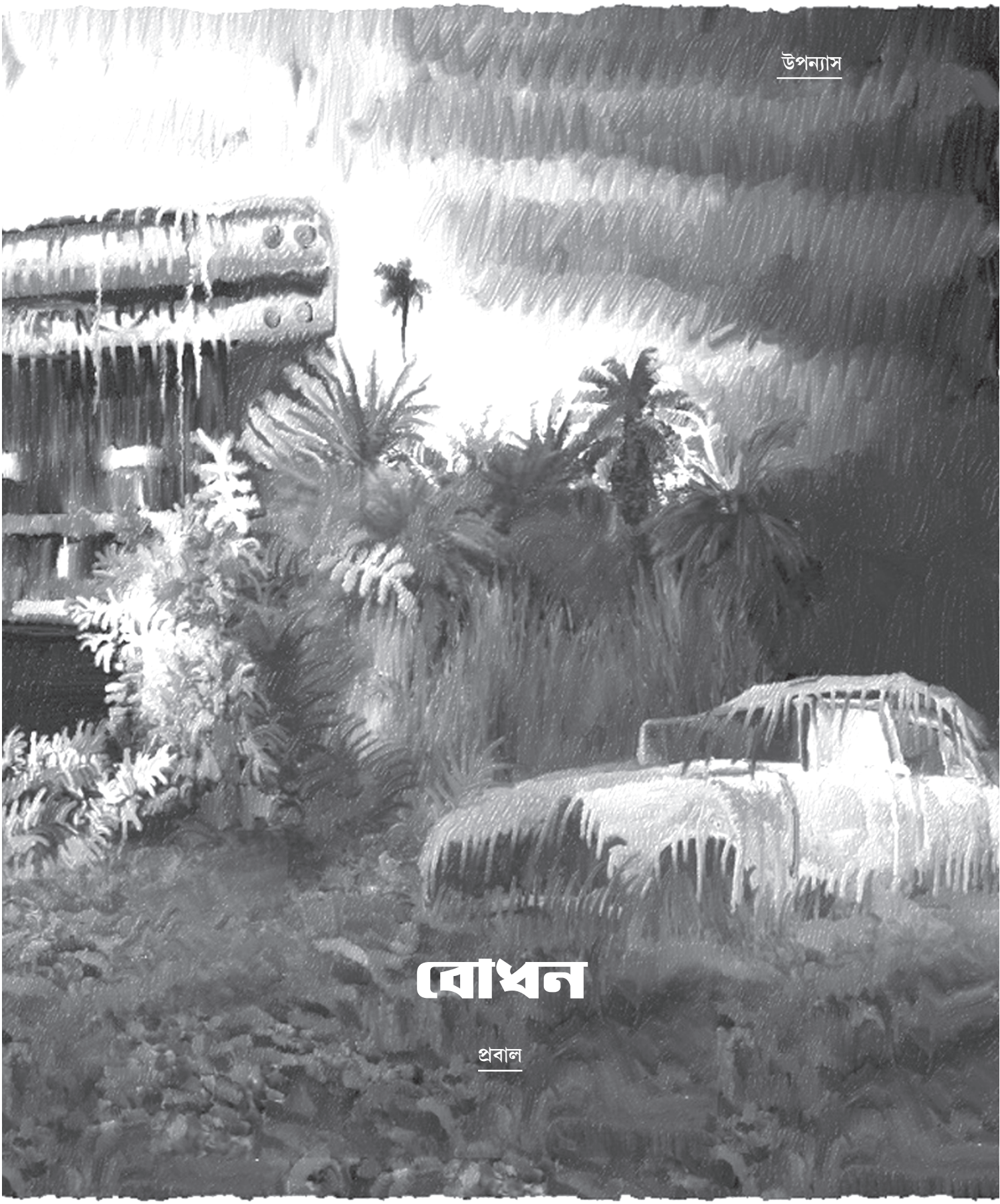

বোধন

প্রবাল

বড্ড গরম পড়েছে। চিটপিটে গরম। বৃষ্টি হবে নাকি?

দাওয়ার ওপর পড়ে থাকা কাশেম আলীর মৃতদেহটার ওপর ভালো করে একবার চোখ বোলালো ইন্সপেক্টর। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দুটো একসঙ্গে করে বাঁধা, লাল সুতো দিয়ে। শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে মুখ, যেন কেউ সব রক্ত শুষে নিয়েছে। হাত-পা জুড়ে নীলচে আভা। চোখ বিস্ফারিত। হাঁ-করা মুখে কী যেন গোঁজা রয়েছে। কাশেম আলী এ গ্রামের মাতব্বর লোক। অঢেল জমিজমা, ঘরে দুটো রাইফেল আছে। ফি বছর জাকাতে অনেক দান করে গ্রামের মসজিদে আর মাদ্রাসায়। তার এই অবস্থা করল কে? পাকানো গোঁফটা চুমড়ে আকাশের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর ইরফান মণ্ডল শুভ্র। কড়া রোদ ঝলসে দিচ্ছে। গায়ে জ্বালা ধরছে, ইউনিফর্মটা যেন কুটকুট করে কামড়াচ্ছে।

'এসব ইবলিশি কার্যকলাপ হুজুর'— ভিড়ের মধ্যে কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে লাশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ইন্সপেক্টর। লাশের কপালে হাত দিয়ে দেখল, ছাই-ছাই কী যেন লেগে আছে। নমাজ পড়তে গিয়ে লেগেছে? কিন্তু সেভাবে তো মাটি লাগতে পারে, ছাই কেন লাগবে?

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল শুভ্র। নাঃ, কুড়ি বছরের পুলিশি জীবনে অনেক শবদেহ দেখেছে, কিন্তু এরকমটি কখনো দেখেনি। দেহে তো ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না! খুনটা তবে হলো কী করে? সাবধানে লাশের মুখের ভেতর থেকে গুঁজে রাখা জিনিসটা বের করে আনলো। শুঁকে মুখ বিকৃত করল শুভ্র।

পোড়া শুটকি মাছ!

একী কোনো বিকৃতমনস্ক খুনির কাণ্ড! চেয়ারটা টেনে ধপ্ করে তার উপর বসে পড়ল ইরফান। পকেট থেকে রুমালটা বের করতে গিয়ে মনে পড়ল, রুমালটা গাড়িতে রয়ে গিয়েছে। দেশে এত পথঘাট, হাইওয়ে, ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে, এত উন্নতি হয়েছে, অথচ এই মাতঙ্গী গ্রামের পথঘাট সেই স্বাধীনতার আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনটিই রয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, কী যেন এক অভিশাপ আছে এ গ্রামের ওপর। জিপটা বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর ছেড়ে আসতে হয়েছিল। জামার হাতা দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল শুভ্র। গ্রামের অনেক লোক জড়ো হয়েছে বাড়ির উঠোনে। তাদের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল,

'লোকটাকে শেষ কে জ্যান্ত দেখেছে?'

কাশেম আলীর চতুর্থ বিবি মানোয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল সামনেই, বাড়ির বাইরেই রান্নাঘরের খুঁটি ধরে। দৃষ্টি মাটির দিকে। কথাটা শুনেও কোনো উত্তর দিল না। আগের মতোই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মেঝের মাটি খুঁড়তে লাগল। পরিবারের বাকি লোকেরাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেউই এগিয়ে এল না।

'কী হলো'— হুঙ্কার দিল শুভ্র। 'কথা কানে যাচ্ছে না নাকি? লোকটাকে শেষ কে জ্যান্ত দেখেছে?'

গামছা দিয়ে চোখের কোণ মুছতে মুছতে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল কাশেমের মেজ ছেলে ফজলু।

'আমি দেখেছি জনাব' — বলল ফজলু।

'কখন দেখেছ, কী দেখেছ, সব পরিষ্কার করে বলো'— ধমক দিয়ে বলল শুভ্র।

'জনাব,' গলা খাকারি দিয়ে বলল ফজলু, 'আমি রোজদিনের মতোই শীতলপাটি বিছাইয়া ছাদে শুইছিলাম। ক'দিন ধইরাই এই তল্লাটে কারেন নাই। গরম। ঘুমটা তাই পাতলা ছিল। মাঝরাতে দরজা খোলার শব্দে ঘুমটা ভাইঙ্গা গেল। উঁকি মাইরা দেখি, গায়ে শাল জড়াইয়া আব্বু বাড়ি থিকা বাইরইতাসে।'

'শাল জড়িয়ে ছিল বলছ', ভুরু কুঁচকে বলল শুভ্র, 'তাহলে কী করে জানলে ওটা তোমার আব্বু?'

'আমার আব্বু তো,'— অবাক হয়ে বলল ফজলু, 'আমি চিনুম না? হাঁটা-চলা, শরীরের গড়ন, সবই তো চেনা। তাছাড়া আব্বু তো প্রায় রাতেই বাড়ি থিকা বাইরয়। পেচ্ছাবের সমস্যা রইছে তো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে'— বলল শুভ্র, 'এখন বলো, তারপর কী হলো?'

'আব্বু তো চইলা গেল',— বলল ফজলু, 'তারপর তো আমার আর ঘুম আসে না। মজুমদার বাড়ির বড় ঘড়িটায় একটা বাজার ঘণ্টা শুনলাম, দুটো বাজার ঘণ্টা শুনলাম, পরিষ্কার মনে আছে। তারপর কখন যে চোখ দুইটা জুড়াইয়া ঘুম আইল টেরই পাইলাম না। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল চাকরবাকরদের চিৎকার চেঁচামেচি, কান্নাকাটির আওয়াজে। বাঁশবনের ধারে, কচুগাছের জঙ্গলে ওরা আব্বুল লাশ পইড়া থাকতে দেখছে।'

'কচুর জঙ্গল থেকে এখানে লাশ টেনে আনল কে?' প্রশ্ন শুভ্রর।

'আজ্ঞে, আমরা।'— বলল ফজলু।

'জানো না, অপঘাতে মৃত্যুর লাশ অকুস্থল থেকে সরাতে নেই?'— রাগত স্বরে বলল শুভ্র, 'এটুকু বুদ্ধি নেই তোমার?'

'আজ্ঞে, আমার আব্বা গ্রামের মাতব্বর ছিলেন,'— বলল ফজলু, 'তাঁর লাশ জলকাদার মধ্যে ফেইলা রাখি কী কইরা? গ্রামের লোকজন কী বলব?'

অন্যমনস্কভাবে কানের পিছনটা চুলকালো শুভ্র। চাপাতির কোপে খুন হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু এরকম মৃত্যু... হার্ট অ্যাটাক! তা কী করে হয়! পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দুটো লাল সুতো দিয়ে বাঁধা, তার ওপর মুখে শুটকি মাছ গোঁজা, কপালে ছাই... হিন্দুদের তন্ত্রমন্ত্র না কি?

'এ গ্রামে হিন্দু আছে না কি?' প্রশ্ন করল শুভ্র।

'গ্রামে এখন আর নাই'— মাথা নেড়ে বলল ফজলু, 'যে কয়টি ঘর মালাউন একাত্তরের পরেও রইয়া গেছিল, তারা সবাই

একানব্বুইয়ে বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে পলাইয়া গেল। শেষ রইয়া গেছিল মজুমদাররা। বড্ড জেদি। মজুমদার বড়কত্তা বলছিল, প্রাণ গেলেও পৈতৃক ভিটা ছাড়ব না। শেষমেশ তাই হইল, প্রাণই গেল। এক রাতে সব্বাই খুন হইল। তা, সেও তো প্রায় বছর তিরিশেক আগের কথা। এসব আমার আম্মির কাছে শোনা। তাই, গ্রামে মালাউন নাই। তবে গ্রামে বাইরে জলার দিকটায় কয়ঘর কৈবর্ত জেলে এখনও থাকতে পারে। জলা-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে ওরা। চট কইরা দেখা যায় না। কিন্তু, এ প্রশ্ন কেন করেন হুঁজুর?'

'জলা... গ্রামের শ্মশানটা তো ওখানেই, তাই না?' বলল শুভ্র।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর,'— ভিড় থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল একজন।

মুখ তুলে দেখল শুভ্র। চাপ দাড়ি, কপালে মস্ত একটা কাটা দাগ।

'কে তুই?'— প্রশ্ন করল শুভ্র।

'হুজুর, আমি শফিকুল'— বলল লোকটা, 'মাদ্রাসায় রান্নার কাজ করি আমি।'

'কী বলছিলি, বল,'— গলা খাকরে জিজ্ঞাসা করল শুভ্র, 'গ্রামের শ্মশান এখনও আছে? কেউ তো আর নিশ্চয় মড়া পোড়ায় না সেখানে? তোরা এখনও জায়গাটার দখল নিসনি?'

'আজ্ঞে, হুজুর'— ইতস্তত করে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল শফিকুল।

'চুপ করে গেলি কেন?'— ধমক দিয়ে উঠল শুভ্র, 'যা বলার বলে ফেল।'

'বল না, ভয়ের কী আছে?'— পাশ থেকে একজন শফিকুলকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'হুজুর তো আমাদের নিজেদের লোক।'

'হুজুর,'— বলল শফিকুল, 'আপনি যা বলছিলেন, হক কথা। জমিটা পইড়া ছিল, কোনো কাজে লাগছিল না। আমরা ভাবতাছিলাম জমিটার দখল নিয়া আরেকটা মাদ্রাসা তৈরি করুম। কিন্তু মুশকিল হইল, শ্মশানের জমিটা ছিল মজুমদারদের। মরার আগে ওরা ওইটা ইসকনলে দান কইরা দিছিল। যেই না আমরা জমির দখল নিতে গেছি, ঢাকা থিকা একদল বিলাইতি বোষ্টুম আইয়া ঘাঁটি গাড়ল সেইখানে। রাতারাতি বাড়িঘর বানাই দিনরাত সেখানে খোল-কর্তাল পেটা শুরু করল।'

'কৈবর্তদের মধ্যে কেউ তন্ত্রমন্ত্র করে?'— প্রশ্ন করল শুভ্র, 'রাতে শ্মশানে কি কেউ মড়ার ওপর চড়ে ধ্যান করে? তোরা কেউ দেখেছিস?'

'রাতে আমরা শ্মশানের ধারেকাছে যাই না হুজুর'— ভয়ার্ত চোখে বলল শফিকুল।

'কেন? ভূতের ভয়?'— প্রশ্ন করল শুভ্র।

'না, হুজুর',— বলল শফিকুল, 'দোয়া দরুদ জানি কিছু, তাই ভূতের ভয় পাই না। ভয় ওই বোষ্টুমগুলোরে। একে বিলাইতি সাহেব, তার উপর ওদের সঙ্গে নাকি লাইসেন্স করা বন্দুক আছে। রাতের অন্ধকারে চোর ভাইবা যদি গুলি চালাইয়া দেয়! হেইটা বাদ দিলেও, আরও একটা ব্যাপার আছে। ওই জলায় ডুইবা তো অনেকেই মারা গেছে, বোঝলেন কি না। এই তো, দিন সাতেক আগে, আনিস আর সিরাজুল রাতের বেলা ওইদিকে গেছিল। বোধহয় নিরিবিলিতে ন্যশা করনের লাইগ্যা। গ্রামের এই ছাওয়ালগুলারে লইয়া এই হলো মুশকিল। মদ গেলে ইয়ারা, আর ইয়াবা গেলে মদ। কয়জন তো আবার হলুদ পাঞ্জাবি পইরা ন্যালাখ্যাপার মতো পথে পথে ঘুইরা ব্যাড়ায়। জুতাও পরে না, বোঝলেন কি না। তা, হেইখানে আনিস আর সিরাজুল নাকি দেখছিল, একটা মাইয়া মানুষ জলার মধ্য দিয়া হাঁইটা যাইতাছে। মানে বুইঝা দ্যাখেন, সাঁতার কাইটা নয়, জলের ওপর দিয়া পাও ফাইলা হাঁটতাছে। জ্যান হেইটা জল নয়, শক্ত মাটি। ন্যাশা কইরা ভুল দেখছিল, বোঝলেন কি না। হেই দেইখা অরা ভাবল, জলার মইধ্যা দিয়া বোধহয় কোনো পথ আছে। হালায় নাইটা বুদ্ধি আর কারে কয়। সিরাজুল জলায় ডুইবা মরল। আনিস বাঁইচা গেল, কিন্তু ডান পা-টা গেল। কুমিরে কুচ কইরা কাইটা নিছিল। এরপর কে আর ওই দিকে যায় কন? যদি ভুল কইরা জলায় গিয়া পড়ে, তা হইলেই তো ব্যবাক পরাণটা গেল। বোঝলেন কি না। তাই ভয়ে আমরা পারতপক্ষে ওদিকটার কাছেও ঘেঁষি না।'

'মজুমদারদের ঘড়িতে একটার ঘণ্টা শুনলে, দুটোর ঘণ্টার শুনলে,'— ফজলুর দিকে ফিরে বলল শুভ্র, 'তখনও তোমার মনে হলে না, তোমার আব্বুর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

জবাবে কিছু বলল না ফজলু। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

'আসলে কী জানেন জনাব,'— গলা খাঁকারি দিয়ে বলল গ্রামের একজন, 'কাশেম সাহেবের ইদানীং... ওই মানে আর কী... একটা ঝি আছে এই বাড়ির... তার বাড়িতে যাতায়াত... ওতে কোনো দোষ নাই... দাসীর সঙ্গে গমনে কোনো দোষ নাই... বুঝলেন কী না... নারী হইল শস্যক্ষেত্র...'

'লাশ জেলা সদরে পাঠাচ্ছি',— লোকটাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল শুভ্র, 'আগামীকাল লোক পাঠাও সেখানে। পোস্ট মর্টেম হয়ে গেলে লাশ হাতে পাবে। তখন দাফনের কাজ করতে পারবে।'

'না, হুজুর,'— হাতজোড় করে বলল ফজলু, 'আপনি তো জানেন, আমার আব্বু ঈমানী ছিল। সেই মানুষটার লাশ কাটাছেঁড়া হইলে মানুষটার জন্নতের দ্বার যে বন্ধ হইয়া যাইব।'

'ঠিক বলেছ,'— ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল কয়েকজন, 'লাশ দাফন হবে, কাটাছেঁড়া করা চলবে না।'

'কে, কে বলল একথা?'— গলা তুলে হাঁক দিল শুভ্র।

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

‘আমি’,— ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একটা লোক। মেহেন্দি লাগানো লম্বা দাড়ি, চোখে সুর্মা, কপালে মাটির ছোপ। পরনে আরবি আলখাল্লা।

‘কে আপনি?’— প্রশ্ন শুভ্রর।

‘আমি এখানকার মসজিদের ছোট ইমাম’,— বলল সে, ‘কাশেম সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী ছিলেন। নিয়মিত মসজিদে সিধে পাঠাতেন। এরকম একটা লোকের লাশ কাটাছেঁড়া করতে পারেন না আপনি।’

‘এটা অপঘাতে মৃত্যু’, — বলল শুভ্র, ‘কোনো ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না। তার পরেও যদি আপনি সেই লাশ দফন করতে চান, আমি কী করে বাধা দিই? তবে যদি জল ঘোলা হয়, আপনি কিন্তু বিপদে পড়বেন।’

সবাই চুপ।

জিপটা বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর রয়েছে। জমাদারদের লাশ ওঠানোর হুকুম দিয়ে সেই দিকে হাঁটা দিল ইন্সপেক্টর শুভ্র।

পদচিহ্ন

আকাশ কালো করে মেঘের দল জড়ো হয়েছে। তাতে গুমোট ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। কিছুটা এগোনোর পর রাস্তার অবস্থা ভালো হলো। জিপের গতি বাড়ল। মেঠো রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলল গাড়ি।

‘ড্রাইভার’,— গ্রামের সীমানা ছাড়াতেই বলল শুভ্র, ‘সামনে থেকে ডানদিকে ঘোরাও।’

ডানদিকের রাস্তাটা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে মধ্যে। বট, অশ্বত্থ, আমলার বন। মাঝখানি দিয়ে স্বল্প পরিসরের একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে খানিকক্ষণ চলার পর কানে ভেসে এল খোল-কর্তাল-মৃদঙ্গের মৃদু শব্দ। আরও কিছুক্ষণ চলার পর পথ আর জঙ্গল দুটোই একসঙ্গে শেষ হলো মস্ত বড়ো এক জলায়। ঘন শেওলা আর কচুরিপানার জটাজালে জলের উপরিভাগ ঢাকা। সবুজ জলের বুক থেকে অসংখ্য কালো গাছের ডাল তাদের হিজিবিজি হাত বাড়িয়েছে। একরাশ নলখাগড়া জন্মেছে জলার ধারে ধারে। তাদের ফাঁপা কাণ্ড জল ছেড়ে খাড়াই উপরে উঠেছে, বেশ অনেকটা। সবুজ নলখাগড়া, হলুদ নলখাগড়া। তাদের জটিল জঙ্গলের ঘেরাটোপের নীচে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছোট ছোট মাছের বাচ্চা ঘাই মারছে জলে। ব্যাঙাচিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। এককালে এখানে এক মস্ত বড় দীঘি ছিল, নাম ছিল পদ্মসায়র। সে যুগে এই গ্রামের অর্ধেকের বেশি লোক হিন্দু ছিল। এখন সেই হিন্দুরাও নেই, পদ্মসায়রের জায়গায় পড়ে আছে এই ভয়ংকর জলা। আছে ভাঙা পুকুরঘাট, বিগ্রহশূন্য এক ভাঙা দেউল, আর আছে তুলসী গাছের বন। হিন্দুরা কেউ আর নেই এখানে। কিন্তু ওই তো, কে যেন বলল, জলার মধ্যে ক’ঘর ভূমি সন্তান কৈবর্ত এখনও লুকিয়ে আছে। দেখা যায় না তাদের।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হলো এই মাত্র।

জলার ডানদিকে বাঁশবন, বাঁদিকে উঁচু পাঁচিলঘেরা একটা বাড়ি, তার মাথায় গেরুয়া পতাকা উড়ছে। কীর্তনের সুর ভেসে আসছে সেই দিক থেকেই। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল শুভ্র। জুতো-মোজা খুলে প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে জলার মধ্যে নেমে পড়ল। দমকা বাতাসের সঙ্গে একরাশ ধুলো উড়ে এল। ঝড় আসছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। পা টেনে টেনে সাবধানে এগিয়ে চলল শুভ্র। জনশ্রুতি রয়েছে, এই জলার মধ্যে কোথায় নাকি চোরাবালি রয়েছে। ভুল করে সেখানে গিয়ে পড়লে নাকি সোজা জাহান্নামে টেনে নিয়ে যায়। পায়ের নীচে থকথকে কাদা। পচা আঁশটে গন্ধে গা গুলোয়। সরসর শব্দে কী যেন সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল ওর পাশ দিয়ে। চমকে সরে গেল শুভ্র। আর একটু হলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। ঊর্ধ্বমুখী একটা ডাল ধরে সামলে নিল নিজেকে।

জলার ধার ধরে সাবধানে মিনিট পাঁচেক চলার পর শুরু হলো বাঁশবন। এই দিনের বেলাতেও সেই বাঁশবনের মাঝখানে সন্ধ্যের আঁধার। মশা পিনপিন শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। পচা বাঁশপাতার গন্ধ বাতাসে। কিছুক্ষণ পর শেষ হলো বাঁশবন। সেখানে শুরু হয়েছে কচু আর হোগলার ঝাড়। অসংখ্য পায়ের ছাপ, কচুগাছগুলো তছনছ হয়ে গেছে। হতাশায় মাথা নাড়ল শুভ্র। এর মধ্যে কি কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব? অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ওপর হাত বোলালো। ফিরে আসছিল বাঁশবনের দিকে। একটা জিনিস নজরে পড়ে গেল। গ্রামবাসীদের পায়ের ছাপের হিজিবিজির নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে একজোড়া মেয়েলি পায়ের ছাপ।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল শুভ্র। দেখা যাচ্ছে, অন্য পায়ের ছাপগুলো এই ছাপটার উপর পড়েছে। তার মানে এই ছাপটার মালিক গ্রামবাসীদের আগে জঙ্গলে এসেছিল। আরও একটা ব্যাপার। গ্রামের লোকেদের পায়ে সাধারণত রাবারের বা প্লাস্টিকের চটি থাকে। এই পা-জোড়া খালি। তাছাড়া, গ্রামের লোকেদের পায়ের ছাপগুলো কচুবন থেকে গ্রামের দিকে ফিরে গেছে। এই পায়ের ছাপজোড়া গেছে উল্টো দিকে, বাঁশবনের দিকে।

পায়ের ছাপে লাল রং। নিখুঁত পায়ের ছাপ, যেন আঁকা। আলতা পরা পা। আলতা তো হিন্দু মেয়েরা পরতো!

আলতার পদচিহ্ন বাঁশবনের দিকে কিছুটা গিয়ে হারিয়ে গেল। সেখানে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেল শুভ্র। একটা কালো পোড়ামাটির হাঁড়ি। তার ওপর ছ'টা লাল ফোঁটা কাটা। সেই ছটা ফোঁটার মধ্যে তিনটে ফোঁটাকে কে যেন লম্বা আঁচড় দিয়ে ধেবড়ে দিয়েছে।

তিনটে ফুটকি, তিনটি ঢ্যাঁড়া। মানে কী এর? এগুলো কি সিঁদুরের ফোঁটা? সিঁদুর তো হিন্দুর...

চড়বড় করে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল আকাশ থেকে। জোরে পা চালিয়ে জলা পার হলো শুভ্র। অন্ধকার আকাশ। ভিজে গন্ধটা প্রবল হয়ে উঠেছে। জলা পেরোতেই হুড়মুড় করে একরাশ বৃষ্টির ফোঁটা আক্রমণ করল শুভ্রকে। তখনই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল শুভ্রর। ফজলু তো বলল, মজুমদার বাড়ির ঘড়িতে ঘণ্টা শুনেছে সে। কিন্তু মজুমদাররা তো সবাই খুন হয়েছে। ঘড়িতে তাহলে দম দেয় কে?

ঝমঝমিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আশ্রয়ের আশায় শুভ্র দৌড় দিল মন্দিরের দিকে।

মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। সিঁড়িতে গিয়ে বসল শুভ্র। ধূপধুনোর গন্ধটা খুব ভালো লাগছে। যেন অনেক জন্মের পরিচয় এই গন্ধটার সঙ্গে। নিজের অজান্তেই চোখে জল এল শুভ্রর।

'হাই অফিসার',— এক সাহেব বৈষ্ণব এগিয়ে এল ওকে দেখে, 'ইউ আর শিভারিং। ইউ মাস্ট বি কোল্ড। অ্যান্ড ওয়েট টু। আপনি ভিজে গেছেন, পা ভর্তি কাদা। আসুন, ইউজ আওয়ার ওয়াশরুম।'

আশ্রমের বাথরুম থেকে হাত-পা ধুয়ে এল শুভ্র। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সাহেব। নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসল। হাতে ধরিয়ে দিল ধূমায়িত পেয়ালার চা। চুমুক দিয়ে অবাক হলো শুভ্র।

'এটা কীরকম চা?'— বলল শুভ্র, 'একদম অন্যরকম খেতে!'

'এটা হলো তুলসীপাতার চা',— বলল সাহেব, 'ভেরি হেলদি। সর্দি জ্বর হবে না এটা খেলে।'

'তুলসী দিয়ে চা হয়?'— বলল শুভ্র, 'এটা জানতাম না। তা, আপনি খুব ভালো বাংলা বলেন।'

'চৈতন্যচরিতামৃত পড়ার জন্য বাংলা শিখলাম',— বলল সাহেব, 'এখানে এসে কাজে লেগে যাচ্ছে।'

'আপনার নাম?'

'কৃষ্ণদাস অধিকারী'— বলল সাহেব।

'সত্যি?'

'পরম সত্যি',— বলল সাহেব।

'পাসপোর্টে কি এই নামই আছে?'

'না, পাসপোর্টের নাম স্টিভেন স্মিথ',— বলল সাহেব।

আরেকজন সাহেব দু-থালা খিচুড়ি রেখে গেল টেবিলের উপর। ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির গন্ধে খিদে পেয়ে গেল।

'ধন্যবাদ,' — বলে প্লেটটা হাতে তুলে নিল শুভ্র।

'আরে, একী!'— বলল কৃষ্ণদাস, 'আপনার হাত থেকে তো রক্ত পড়ছে।'

'ওঃ!'— খিচুড়ি নামিয়ে রেখে নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বলল শুভ্র, 'মনে হচ্ছে, জলা পার করতে গিয়ে শুলো শিকড়ে কেটে গেছে।'

ফার্স্ট এইড বক্স বার করল কৃষ্ণদাস— 'হাতটা দিন।'

'চিন্তার কিছু নেই',— বলল শুভ্র, 'বাড়িতে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে নেব।'

'তা হয় না',— দৃঢ় স্বরে বলল কৃষ্ণদাস, 'সেপটিক হয়ে যেতে পারে। হাতটা দিন।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল শুভ্র। যত্ন করে ক্ষত পরিষ্কার করতে লাগল কৃষ্ণদাস।

'শুনলাম, আপনার কাছে বন্দুক আছে?' — বলল শুভ্র।

'সবই লাইসেন্সড',— ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল কৃষ্ণদাস, 'বেআইনি কিছু নয়।'

'আপনারা সন্ন্যাসী, সঙ্গে অস্ত্র রাখেন কেন?'

'আমার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ',— ব্যান্ডেজের শেষ ভাগটা টেপ দিয়ে আটকে বলল কৃষ্ণদাস, 'তাঁর হাতে তো চক্র আছে। আমার হাতে থাকবে না? শ্রীকৃষ্ণের মতো আমার অস্ত্রও শিষ্টের পালনের জন্য।'

খিচুড়ির প্লেট হাতে তুলে নিয়ে জানালার দিকে তাকাল শুভ্র। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মন্দিরের আরতির সংগীত মিশে গেছে প্রকৃতির রিমঝিম শব্দের সাথে। ঝিম ধরে যায়। মন ভেসে যায় অতীন্দ্রিয় এক লোকে।

পাপ

পুলিশের লোকজন লাশ নিয়ে চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। কাশেম আলির বাড়িতে এখন বেশ ভিড়। গাঁয়ের কেউকেটা লোক ছিল কাশেম আলি। কিন্তু জনপ্রিয় বোধহয় ছিল না। তাই তার মৃত্যুতে লোকজন যত না শোকাহত, তার চাইতে অনেক বেশি বিস্মিত। কিছুটা ভীতও বটে। চার বউ, একডজন ছেলে-মেয়ে ও ছেলের বউদের নিয়ে জমজমাট সংসার ছিল কাশেমের। তাদের মধ্যে একমাত্র প্রথম পক্ষের বউ মনিরা বেগমকেই কম-বেশি দুঃখিত মনে হচ্ছে। উঠোনে উবু হয়ে বসে ডুকরে কাঁদছিল সে।

‘ওগো, তুমি এ কী করলে গো! পই পই কইরা বলছিলাম, এইসব কুকর্মে না জড়াইতে। তুমি তো আমার কথা কোনো কালেই কানে তোলো না। তুমি বোঝো নাই, দেবীর চোখে তাকাইলে শরীরের সব রক্ত পানি হইয়া যায়। এখন আমি কোথায় যামু? এ কোন অকূল সাগরে আমারে ভাসাইয়া দিয়া চইলা গেলে তুমি?’

জহিরুল মিঞা গায়ের বুড়ো। অনেক চাঁদ দেখেছে সে। মিঞা মাথা নেড়ে বলল, ‘মজুমদার বাড়ির মন্দিরে একটা দেবীমূর্তি ছিল। সবুজ রঙের মূর্তি, তার মুখের দিকে তাকালেই ভয়ে গা শিরশির করত। আমি কাশেমরে বলছিলাম, মজুমদারদের বাড়ি লুঠ করিস না। দেবীমূর্তিরে হাত দিস না। কাশেম তো কোনোকালেই কারও কথা শুনত না। অনেকেই তো সেদিন মজুমদার বাড়ি লুঠে গেছিল। কেউ মন্দিরের দিকে যায়নি, একা কাশেম গেল।’

‘না বুড়ো,’ — বলল আরেকজন, ‘পিছন পিছন আমিও গেছিলাম। যদি দেবীর গয়নাগাঁটি কিছু জুইটে যায়। তা সেই গয়নাগাঁটি যে মজুমদাররা কোথায় লুকাইয়া ফেলল সে আর খুঁইজা পাওয়া গেল না। আজ পর্যন্ত কেউ খুঁইজা পায় নাই। কিন্তু আমি দেখছিলাম। ওরে খোদা, সেই দৃশ্য...’

ভয়ে শিউরে উঠে চুপ করল লোকটা। জহিরুল চেপে ধরল তাকে।

‘কী দেখেছিলি তুই?’

লোকটা কোনো উত্তর দিল না।

‘দ্যাখ ইমতিয়াজ, যা বলার এখনই বইল্যা ফেল। পরে হয়তো আর কিছুই বলার সুযোগ পাবি না।’

‘দোহাই বুড়া’,— ডুকরে কেঁদে উঠল লোকটা, ‘এমন কথা কইও না।’

‘তাহলে বল, কী দেখছিস সেইহানে?’

‘বলছি, বলছি,’— ভয়ে আরেকবার শিউরে উঠল ইমতিয়াজ, ‘কাশেম আর আমি তো মন্দির তন্ন তন্ন কইরা খুঁইজা ফেললাম। দেবীর গয়নাগাঁটি কিছুই খুঁইজা পাইলাম না। কিছু তামার বাসনপত্র পাইলাম, সেগুলো নিলাম। কাশেম হঠাৎ চড়াও হলো দেবীমূর্তির ওপর। শাবল দিয়া এক ঘা মারল মূর্তির ওপর। ভয়ে আমি চোখ বুইজা ফেললাম। কিন্তু তার আগে একবার আমার চোখ পইড়্যা গেছিল দেবীর কপালের ওপর। স্পষ্ট দেখলাম, কপালের সেই তিননম্বর চোখটায় দপ কইর‍্যা আগুন জ্বইল্যা উঠল। লুঠের মাল ফেইল্যা আমি চোঁ-চোঁ দৌড় মারলাম মন্দির থেকে। পরে আমার গনিমতের মাল আমার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিছিল বশির।’

‘খুব বড় গুনাহ্ কইরা ফেলছস’,— মাথা নেড়ে বলল জহিরুল বুড়ো, ‘দেবী জাইগা উঠছেন, তার কোপ পড়েছে এই গ্রামের ওপর। তোরা যারা যারা মজুমদার বাড়ি লুঠ করতে গেছিলি, তোদের সবার এখন বিপদ।’

‘এ কী যা-তা বলছ বুড়ো?’— এগিয়ে এল রহমত আলি, গ্রামের মসজিদের ছোট ইমাম, ‘মূর্তিপূজা হারাম, শির্ক। দেবীর কোপ বলে কিছু হয় না। মূর্তি ভাঙা জায়েজ, ওতে বরং সোয়াব হয়। মিথ্যে গালগল্প ফেঁদে এসব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিও না। তাহলে গুনাহ হবে।’

‘মিথ্যে গালগল্প?’— রেগে উঠল বুড়ো, ‘আমি মিথ্যে গালগল্প ফাঁদছি! তা, তুই তো ইমাম। অনেক জ্ঞান। বলো দেখি, কাশেমকে মারল কীসে? কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, অথচ শরীরের সব রক্ত উধাও। দেবীর কোপ না হলে সেটা কি সম্ভব?’

‘তা... তা... তা..’— মুখে কথা জোগালো না রহমতের।

‘আমি এই বইল্যা দিলাম,’— বলল জহিরুল বুড়ো, ‘লিখে রাখ, দেবী জাইগা উঠছেন। দেবী রক্ত চান। তিনি এখন এক এক কইরা সবার রক্ত খাইবেন। কেউ নিস্তার পাইব না।’

‘বুড়া, তুমি বাজে বকবক কইরা মাথা জাম কইরা দিলা’,— বলল কুদ্দুস, ‘হেইসব কুসংস্কার। দেবীটেবি সব গালগল্প।’

‘শুধু তো আব্বু ছিল না’,— বিড়বিড় করে বলল ফজলু, ‘আরও অনেকেই তো ছিল সেইখানে। মজুমদার বাড়ি লুঠ করতে শুনছি গ্রামসুদ্দু লোক গেছিল।’

‘আমি যাই নাই’,— বলল জহিরুল, ‘বাকি অনেকেই গেছিল, তবে পালের গোদা ছিল ছ’জন।’

‘কারা ছ’জন?’— প্রশ্ন করল ফজলু।

‘কাশেম, এই ইমতিয়াজ, আর মনিরুল। আর এই যে দাঁড়াইয়া আছে কুদ্দুসও তো ছিল। এছাড়াও ছিল বশির আলি আর ইলিয়াস মোল্লা।’

‘বশির আলি, ইলিয়াস মোল্লা?’— বলল রহমত, ‘এরা কারা? এদের নাম তো শুনি নাই।’

‘বশির আর ইলিয়াস ছিল পাক্কা ধুরন্ধর’,— বলল জহিরুল, ‘বশির ছিল বিএনপি-র বড় নেতা। খালেদার সরকার যখন পইড়্যা গেল, ওর ওপর শ’খানেক কেস আইয়্যা পড়ল। পুলিশ এক্কেবারে অতিষ্ঠ কইরা ছাড়ল ওর জীবন। তাই ও বর্ডার পার কইর‍্যা ইন্ডিয়ায় চইল্যা গেল। আর ফিরা আসে নাই। শুনছি বেশ তালেবর হইয়া উঠছে সেখানে। ইন্ডিয়ায় এখন ওর বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি। এপার থেকে কেউ গিয়া দেখা করলেই হইল। আধার কার্ড, রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, এমনকী চাকরি পর্যন্ত জোগাড় কইরা দিব।’

‘আর ইলিয়াস মোল্লা?’— প্রশ্ন ফজলুর।

‘ইলিয়াসের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো একটা যোগাযোগ ছিল’, —বলল জহিরুল, ‘লোকে বলে ও ছিল আই এস আইয়ের লোক। একসময় সেও পলাইয়া গেল। কোথায় গেল কে জানে। হয়তো পাকিস্তানে।’

সবাই চুপ। কিছুক্ষণ পরে বুড়ো আবার বলে উঠল, ‘কী রে

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2241379 - 2240310

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com

সহিদুলের ব্যাটা মনিরুল, মজুমদার বাড়ির বড়কত্তার গলাটা তো তুইই কাটছিলি, তাই না? মরার আগে বড়কত্তা চিল্লাইয়া কী কইছিল, মনে আছে? এ আমার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি। মইরা গেলেও আমি এ ভিটা ছাইড়া যামু না। বলছিল কি না?'

'বলছিল',— শুকনো গলায় বলল ইমতিয়াজ, 'আমি শুনছিলাম সেটা।'

'তোরা কী মনে করছিলি, যে মানুষটা প্রাণ থাকতে ভিটামাটি ছাইড়া যায় নাই, মরার পর সে চইল্যা যাইব? তাই তো মজুমদার বাড়ি আজও অভিশপ্ত। তরা সবাই সে বাড়ি দখল নেবার চেষ্টা করছিস। কেউ পারছিস কি? বাস করতে পারছস সেইহানে?'

'যাই হোক,'— বলল রহমত, 'আজ জুম্মাবার, সবাই নমাজ পড়তে মসজিদে এসো। নমাজের পরে কাশেম সাহেবের জন্য দোয়া করব, যাতে ওর জন্নতের দরজা খুলে যায়। দোয়া করব গ্রামবাসীদের জন্য। যাতে ইবলিসের কোনো ছায়া গ্রামের ওপর না পড়ে।'

'পাপ ছাড়ে না বাপ',— বিড়বিড় করে বলল বুড়ো জহিরুল মিঞা,'কেউ বাঁচব না, দেবীর কোপে সব্বাই মরব।'

'চুপ বুড়া', — ধমক দিল কুদ্দুস।

সবাই এক এক করে দুরুদুরু বুকে নিজের বাড়ির দিকে এগোলো। মনে সবারই ভয়। সত্যিই কি দেবী জেগে উঠেছেন? কী হবে এখন? বুড়ো তখনও গজ্‌গজ্‌ করে চলেছে, 'হিন্দুরা থাকলে তাদের জিগান যাইত, দেবীর কোপ কী কইর‍্যা শান্ত করা যায়। ওরা সেসব জানত। কিন্তু হিন্দুরা তো ছিল তোদের চক্ষুশূল। তাদের সব্বাইরে তাড়াইয়া তবে ছড়লি তরা। এখন সামলা দেবীর কোপ।'

চলে যেতে যেতে রহমত বলল, 'পাগলা বুড়া।'

বুড়ো তখনও বিড়বিড় করে চলেছে, 'হিন্দুদের থিকা স্বাধীনতা চাইছিলি তরা। নে, স্বাধীনতা নে। নিজের আত্মার থিকা স্বাধীনতা মানে যে মৃত্যু, এইটা কি বুঝস তরা? হায়রে কপাল!'

মনে

ঘরে ঢুকে সুইচ অন করল শুভ্র, আলো জ্বলল না।

ও হ্যাঁ, এই অঞ্চলে কয়েকদিন ধরেই পাওয়ার নেই। কী যেন ট্রান্সফর্মারের সমস্যা হয়েছে। টর্চটাও গাড়িতে ফেলে এসেছে। ডানদিকের দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি আছে। হাতড়ে হাতড়ে সেটাকে খুঁজে বার করল শুভ্র। হাত লেগে কুলুঙ্গি থেকে কিছু একটা পড়ে গেল। ঝুমঝুম শব্দ হলো। অভ্যস্ত হাতে কুলুঙ্গি থেকে দেশলাই বের করে লণ্ঠন জ্বালালো। একটু আলোকিত হলো অন্ধকার ঘর। মেঝে থেকে পড়ে যাওয়া জিনিসটা তুলে নিল শুভ্র। একটা ঝুমঝুমি।

লালির ঝুমঝুমি। কুলুঙ্গিতে রেখে দিল সেটা।

কুলুঙ্গির ওপর একটা কিছু আঁকা আছে। বোধহয় সিঁদুর দিয়ে। এককালে লাল ছিল, এখন প্রায় কালো হয়ে গেছে। তবু ফিকে হয়ে মুছে যায়নি। দেখে মনে হয়, একটা মানুষ দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে তিনটে ফুটকি। তার থেকে রং চুঁইয়ে নেমেছে। হিন্দুদের কোনো মাঙ্গলিক চিহ্ন। এটা নিশ্চয়ই হিন্দুদের বাড়ি ছিল। হয়তো পার্টিশনের সময় শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে দখল করেছিল কেউ। শত্রু! যে মানুষগুলোকে পাকিস্তান শত্রু আখ্যা দিয়ে তাদের শেষ সম্বল কেড়ে নিয়েছিল, তারা কি সত্যিই শত্রু ছিল? আজ স্বাধীন দেশে বসে আমরা সেই বঞ্চিত মানুষগুলোর সম্পত্তিই অনায়াসে ভোগ করে চলেছি।

গ্যাস জ্বালিয়ে প্রেসার কুকারে ভাত বসাল শুভ্র। সাথে আলু। ঘি আছে। আলুভাতে খাওয়া যাবে। ইউনিফর্ম ছেড়ে গামছা পরে নিল। বাড়ির পেছনে কুয়োতলা। সেখানে গিয়ে হুড়মুড় করে বালতির পর বালতি জল ঢেলে নিল গায়ে। ঘরে ফিরে গা মুছতে মুছতে হঠাৎ একটা গন্ধ পেল শুভ্র। বহুকাল পরে এই গন্ধটা পেল আবার। বেবি পাউডারের গন্ধ।

লালি মা আমার, তুই এসেছিস?

না, লালি কী করে আসবে এখানে? লালিকে তো দাফন করা হয়ে গেছে। সেই কত বছর আগে।

নদীর ধার ধরে পাগলের মতো হাঁটছিল শুভ্র। মনে হচ্ছে পথ যেন ফুরোচ্ছেই না। বারবার চোখ ছাপসা হয়ে যাচ্ছে। পথ দেখতে পাচ্ছে না। মাত্র তিনদিনের জ্বর সব শেষ করে দিল।

লালি, আমার একমাত্র সন্তান। মা-মরা মেয়ে। সংসারের সঙ্গে আমার একমাত্র বাঁধন। আজ সে ছিঁড়ে গেল।

অনেক দূরে এসে পড়েছিল শুভ্র। জঙ্গলে দিকে। ধুনীর কড়া গন্ধে সংবিৎ ফিরল। দেখল, ঘন এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে আছে একজন সাধু। পরনে লাল কাপড়, কপালে লাল তিলক। সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, ধ্যানস্থ।

'আমার এতবড়ো সর্বনাশ কেন হলো, বলতে পারো ঠাকুর?'— সাধকের সামনে একরাশ কাদার ওপর থেবড়ে বসে পড়ল শুভ্র।

মৃদু হেসে চোখ খুলল সাধক, টকটকে লাল চোখ, সিঁদুরের মতো।

'তোর মেয়ে তোর কাছে আছে,'— স্নিগ্ধ স্বরে বলল সাধক, 'সে কোথাও যায়নি। দেহটাকে কবর দিয়ে এসেছিস, কিন্তু দেহটাই তো সব নয়। দেহ তো মাটি, সে মাটি মাটিতেই ফিরে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেকার মূল তত্ত্ব আত্মা, সে তো অবিনশ্বর। যদি তোর ভালোবাসা খাঁটি হয়, তাহলে সে আবার তোর কাছে

ফিরে আসবে।'

'কিন্তু ঠাকুর,'— বলল শুভ্র, 'আমরা যে জন্মান্তর মানি না।'

'জন্মান্তর মানিস না,'— বলল সাধক, 'স্মৃতি তো মানবি? তোর মেয়ে তোর স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। চোখ বুজে তার কথা ভাবলেই সময়ের পথে পিছু হেঁটে তার কাছে পৌঁছে যাবি।'

'আর যদি কোনোদিন তার স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসে,'— দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল শুভ্র।

'তাহলে তো সব ল্যাঠাই চুকে গেল',— হো হো করে হেসে উঠল সাধক, 'যত যন্ত্রণা তো স্মৃতি নিয়েই। ভুলে গেলেই সব শেষ। তাই তো আমি মাকে সর্বক্ষণ বলি, মা, আমি কিচ্ছু করতে চাই না, কিচ্ছু ভাবতে চাই না। আমায় তুই বদ্ধ উন্মাদ বানিয়ে দে।'

লালি, মা আমার। আজ আমিও পাগল হতে চাই। কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করি— আমায় পাগল বানিয়ে দাও।

প্রেসার কুকারের সিটির শব্দে হুঁশ ফিরল শুভ্রর। আলুভাতের তীব্র গন্ধে ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেবি পাউডারের মৃদু সুগন্ধটা পালিয়ে গেল।

লাল সুতো। লাল পায়ের ছাপ। লাল ফোঁটা দেওয়ালের গায়ে। লাল ফোঁটা কালো হাঁড়ির গায়ে। মা দুর্গার শাড়ির রং লাল। হিন্দু মেয়েরা আলতা পরে, সিঁদুর পরে, হাতে পলা পরে, সেগুলোও লাল।

হিন্দুরা কি সবাই চলে গেছে! সত্যিই? ওদের কেউ কি আর নেই এদেশে?

গরম ভাতে ঘি ঢালতেই দাদির কথা মনে পড়ে গেল। শুভ্র তখন অনেক ছোট। গুলতি নিয়ে আম পেড়ে বেড়াতো গ্রীষ্মের ছুটিতে। দুপুর হলেই দাদি ডাক দিতেন, 'কোথায় আমার রাজকুমার লালকমল নীলকমল?' পাকড়ে ধরে নিয়ে যেতেন কুয়োতলায়। ঠাণ্ডা জলে চান করে গা মুছে নকশি কাঁথার আসনে এসে বসত শুভ্র। দাদি ভাত মেখে ছোট ছোট দলা করে কাঁসার থালায় সাজিয়ে রাখতেন। বলতেন, 'কাকের ডিম, বকের ডিম।' একটা করে মুখে ঢুকিয়ে দিতেন আর বলতেন, 'হালুম বুড়ো, হালুম করে।'

মৃত্যুশয্যায় দাদি ওকে একটা সিঁদুরমাখা রুপোর থালা দিয়েছিলেন। বংশপরম্পরায় সেই থালা নাকি পরিবারের বড়ো ছেলের কাছে আসে। শুভ্র দেখেছে, সেই থালায় অদ্ভুত এক হরফে লেখা আছে, 'ওঁ হ্লীম্ এং শ্রীম্ শ্রীমাতঙ্গেশ্বরী নমঃ। ইতিহাসে এককালে আগ্রহ ছিল শুভ্রর। ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছিল, হরফটাকে বলে 'সিদ্ধম্' হরফ। বাংলা হরফের আদিম রূপ। এই একই সিদ্ধম হরফ নাকি প্রচলিত আছে তিব্বতে, জাপানে, ফিলিপিন্সে। আরও কোথায় কোথায় কে জানে! গর্ব হয়েছিল। আমার ভাষা রয়েছে গহীন হিমালয়ের গুহায়, পূর্ব সমুদ্রের বালুতটে।

মাতঙ্গেশ্বরী। মাতঙ্গ ঈশ্বরী। আচ্ছা, ওই গ্রামটার নাম তো মাতঙ্গী। কে এই দেবী মাতঙ্গী? তিনি কি আমার পরিবারের উপাস্য দেবী ছিলেন? যখন আমরা হিন্দু ছিলাম?

হিন্দুরা কি সবাই চলে গেছে? কই, না তো। শরীরহীন প্রেতের মতোই হিন্দুরা রয়ে গেছে এদেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, গ্রাম-পরগনার নামে, আমার মতো এদেশের প্রতিটি মানুষের আত্মায়। রয়ে গেছে ভাঙা পুকুরের ঘাটে, ওই অভিশপ্ত জলায়। রয়ে গেছে লালকমল নীলকমলে, বট-অশ্বত্থের জঙ্গলে, বাতাসে ভেসে আসা তুলসীর ঝাঁঝালো গন্ধে। রয়ে গেছে বাংলা ভাষায়, বাংলা হরফে। হিন্দুরা এখনও এখানে আছে। হ্যাঁ, চলে গিয়েও ওরাই তো শুধু আছে। আমাদের সবার মধ্যে।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

দোসর

গতকাল সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত বেশ বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজ সকাল হতেই সব মেঘ কেটে গেল। তার সঙ্গে ফিরে এলো চিটচটে গরম।

গুমোট রাত। বেশ খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার পর সিলিং থেকে ঝুলন্ত নিথর নিশ্চল পাখাটার উদ্দেশে একটা গালি দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল কুদ্দুস। আলনা থেকে গামছা তুলে কাঁধে দিল। আবলুস কাঠের আলনা। এই বাড়ির অনেক আসবাবপত্রের মতোই এটাও মজুমদার বাড়ি থেকে তুলে আনা।

'কই যাও?'— ঘুমজড়ানো গলায় প্রশ্ন করল রাবেয়া।

'গা চটচট করতাসে। যাই, একটু জল ঢাইলা আসি।'

এই বলে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল কুদ্দুস। দাওয়ার ওপর রাখা লণ্ঠনটার আলো একটু উস্‌কে দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্দেশে আরও কয়েকটা গালাগাল ছুঁড়ে দিল কুদ্দুস। উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে বাথরুম। সেখানে বালতি করে জল রাখা থাকে। কিন্তু প্লাস্টিকের বালতির জল, তাতে চান করে কি আর সেই মজা আছে? উঠোন থেকে নেমে বাড়ির খিড়কির দরজার দিকে হাঁটা দিল কুদ্দুস। একবার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। মনে হলো, সবে কাশেমের এরকম অপঘাতে মৃত্যু হলো। এখন রাতবিরেতে ঘরের বাইরে না বেরোনাটাই বোধহয় ভালো। জোর করে সেই ভয়টাকে মন থেকে সরিয়ে দিল কুদ্দুস। যত্তসব কুসংস্কার। ধাক্কা মেরে খিড়কির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

খিড়কির দরজার ওপারে কুয়োতলা। তারপর ঘন কলাবন। সেখানে পৌঁছানোমাত্র একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল কুদ্দুস। আঁশটে গন্ধ, বাসি খাবারদাবারের গন্ধ। শেওলার গন্ধ। গা-টা ছমছম করে উঠল। হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে হলো, দৌড়ে পালিয়ে যায় বাড়ির ভেতরে। ছিঃ! ওইসব দেবদেবীর গল্প শোনার জন্যই অহেতুক ভয় মনে চেপে বসেছে। ছোটো ইমামের সঙ্গে কথা বলে জহিরুল বুড়োর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ওর বকবক বন্ধ হয়।

দড়ি টেনে কুয়ো থেকে বালতি ভরে জল তুলে আনল কুদ্দুস। হুড়হুড় করে ঢেলে দিল মাথার ওপর। আ..হা..হা..! কী আরাম! শরীরটা জুড়িয়ে গেল। লম্বা একটা শ্বাস নিল বুক ভরে। ঠিক তখনই কাঁধের ওপর ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় হাড় মজ্জা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সেটাই ওর শেষ দেখা। দেখল, মজুমদারবাড়ির সেই দেবীমূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। সেই শেওলা-সবুজ গাত্রবর্ণ, গা-ভর্তি সেই গহনা। চোখে সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কপালের মধ্যেকার তিননম্বর চোখটায় আগুন জ্বলছে।

'দেবী! দেবী! দেবী!'— চিৎকার করে উঠল কুদ্দুস। তার সাথেই চোখে আঁধার ঘনিয়ে এলো।

রিপোর্ট

কাজ সেরে ঘরে ফিরল শুভ্র। তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমেছে। আলসেমি লাগছে বড্ড। রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না, কোনো কাজই করতে ইচ্ছে করছে না। একটা চেয়ার টেনে বারান্দায় বসল শুভ্র।

মেঘ কেটে গেছে। বিরাট একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে। সামনে দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত জ্যোৎস্নার আলোয় সাদা হয়ে আছে। ভিজে হাওয়া বইছে। সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেক শান্তি, অনেক মমতা। একটা গানের সুর ভেসে আসছে বাতাসে। সামনে খালের জলে চাঁদের গুঁড়ো ভাসছে, তাদের বারেবারে এলোমেলো করে দিতে কয়েকটা হাঁস ঘুরছে জলে। সিলুয়েটে ওদের অবয়ব যেন কালো জলপরির।

ঘুমিয়ে পড়েছিল শুভ্র। স্বপ্নে দেখেছিল, মরুভূমিতে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, হাজার বছর পর। হাজার বছর চলবে এই বৃষ্টি। একটা আফ্রোদিতি সুগন্ধ। একটা নরম শরীর। একজোড়া নরম হাত। সারা শরীরে টাপুর-টুপুর সরস স্নেহ।

'স্যার'!

ঘুম ভেঙে দেখল শুভ্র, আর্দালি এসেছে।

'স্যার, এটা আপনার।'

'কী?'

'বলেছিলেন,'— বলল আর্দালি, 'এটা হইয়া গেলে আপনারে আইনা দিতে। যত রাতই হোক না কেন।'

'ভালো করেছিস',— বলল শুভ্র,। আর্দালির হাত থেকে খামটা নিয়ে, 'একটু চা বানা তো। আদা দিয়ে। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

ঘর থেকে একটু কুপি এনে জ্বালিয়ে বসল শুভ্র। খামটার বন্ধ মুখ ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা বের করে আনল। কাশেম আলির পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। বারকয়েক পড়ল রিপোর্টটা। যতই পড়ল, মনে হলো মাথাটা যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শরীরে কোনো বিষ পাওয়া যায়নি। কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই শরীরে। ঘাড়ে, হাতে কোমরে কিছু লাল দাগ আছে, সেগুলো সম্ভবত মশার কামড় থেকে হয়েছে। মৃত্যুর কারণ— পি এইচ এন, ডাক্তাররা যাকে হোমিওলিসিস বলেন। অর্থাৎ শরীরে লোহিত রক্তকণিকার হার অস্বাভাবিক কমে যাওয়া। যার ফলে শরীরে অক্সিজেন পৌঁছায় না।

কাশেম আলির মুখ ফ্যাকাসে আর হাত-পা নীল হয়ে যাওয়ার কারণটা বোঝা গেল। রক্তশূন্যতা। তবে কি এটা অপঘাতের মৃত্যু নয়? স্বাভাবিক মৃত্যু? কিন্তু, তাহলে ওগুলো কে করল? ওই লালসুতো দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলদুটো একসঙ্গে বাঁধা! কপালে ছাই লেপা? মুখে পোড়া শুটকি? তাছাড়া অসুখেই যদি মৃত্যু হবে, তবে মাঝরাতে কচুবনে গিয়ে মরল কেন কাশেম?

'স্যার, এই যে আপনার চা।'— বলল আর্দালি, 'মনে তো হয় রাতে কিছু খান নাই, কিছু বানাই?'

'কালো জিরে দিয়ে পাতলা আলুর ঝোল বানাতে পারবি? কাঁচা মরিচ দিয়ে। বেশি ঝাল হয় না যেন। সাথে দুটো রুটি।'

'জী'— বলল আর্দালি।

চায়ে চুমুক দিল শুভ্র। আকাশে অগুনতি তারা। কিম্বার্লির হিরের দ্যুতি নিয়ে মিটমিট করছে। অপার্থিব সেই সুর বাতাসে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'টা রাতচরা উড়ে গেল চাঁদকে আড়াল করে। দূরে কোথায় যেন একটি একাকী নিশি জাগা পাখির সুদীর্ঘ আর্ত চিৎকার শোনা গেল। প্রান্তরের নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে সেই ডাক দিগন্ত থেকে দিগন্তে মাথা কুটে মরল, অনেকক্ষণ।

আর্দালি খাবার বেড়ে দিয়ে গেল।

'তুই খাবি না?'— বলল শুভ্র।

'না স্যার',— বলল আর্দালি, 'অনেক রাত হলো, বাড়ির লোকে চিন্তা করতাছে। আমি যাই।'

খাওয়া শেষ করতে করতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। সংক্ষিপ্ত কথা হলো। ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ভ্রূদুটো

অস্বাভাবিক কুঁচকে গেল শুভ্রর।

মাতঙ্গী গ্রামে আরেকটা অস্বাভাবিক মৃত্যু! সেই একইরকম।

তদন্ত

দুদিন আগেই এই গ্রামে এসেছিল শুভ্র। গ্রামের সব লোক জড়ো হয়েছিল কাশেম আলির বাড়িতে, উপচে পড়েছিল ভিড়। আর আজ? গ্রামের একটা লোকও আসেনি এখানে। সেদিন ছিল দিনের বেলা, আর আজ এখন রাত্রি। সেইজন্যই কি?

পুরো গ্রামে জুড়েই যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে।

কলাগাছের জঙ্গলে ঘেরা জায়গাটা। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই। সেইখানেই পড়ে কুদ্দুস জাহাঙ্গিরের মৃতদেহ। পকেট থেকে মোবাইল বার করে আলোটা জ্বালালো শুভ্র। কুদ্দুসের মৃতদেহের সঙ্গে কাশেমের মৃতদেহের মিলটা কারোর চোখ এড়াতে পারে না। সেই পাংশু মুখবর্ণ, নীলচে হাত-পা। পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো একসঙ্গে জোড়া করে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। কপালে ভস্মের আবরণ। ঈষৎ বিস্ফারিত মুখে পোড়া শুটকি মাছ গোঁজা।

আরেকটা হোমিওলিসিসের কেস! আনমনে মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ দিল শুভ্র। কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে কি হোমিওলিসিস হতে পারে? ছোয়াঁচে রোগ? কিন্তু এইসব তন্ত্রমন্ত্রের উপাচার? লাল সুতো, ছাই, পোড়া শুটকি! ছোঁয়াচে রোগের সাথে এগুলোর কী সম্পর্ক? ইন্টারনেট চেক করে দেখতে পারলে ভালো হতো। দূর ছাই! এখানে তো নেটওয়ার্কও নেই। জোরে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল শুভ্র। কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

'আমার গাড়িতে বড়ো একটা ফ্ল্যাশলাইট আছে',— সঙ্গী কন্সটেবলদের উদ্দেশে বলল শুভ্র, 'নিয়ে এসো তো, জায়গাটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে, যদি কিছু সূত্র পাওয়া যায়। এতল্লাটে তো ইলেকট্রিসিটি নেই কয়েকদিন ধরে। মরতে কেন যে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পোস্টিং পেলাম!'

কলাবন থেকে পায়ে চলা পথ চলে গেছে কুদ্দুসের বাড়ির খিড়কির দরজা অবদি। সেখানেই কুয়োতলা, শানবাঁধানো মেঝে। পাশে পড়ে আছে টিনের বালতি, হাতলে দড়ি বাঁধা। গামছাটা অবহেলায় পড়ে আছে অন্যধারে। সেখানে থম্ মেরে বসে আছে কুদ্দুসের বউ রাবেয়া। তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল শুভ্র—

'এত রাতে কুঁয়োতলায় কেন এসেছিল কুদ্দুস?'

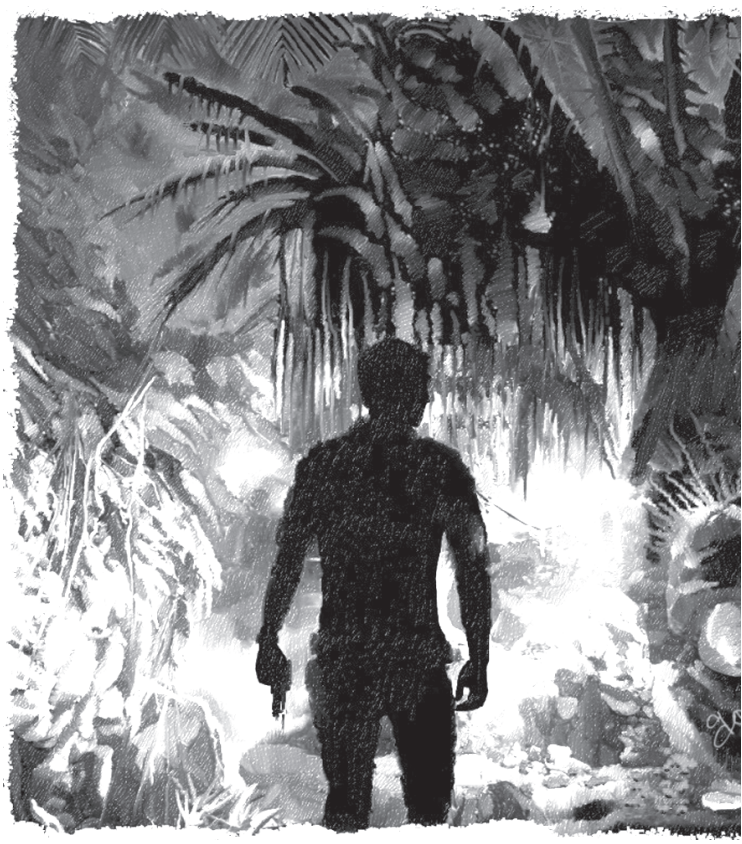

'বলল, গা চটচট করতাছে', — রাবেয়া বলল, 'এট্টু জল ঢাইলা আসি।'

'রাত তখন কটা?'— প্রশ্ন শুভ্রর।

'জানি না।'— বলল রাবেয়া।

'তারপর কী হলো?'

'ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।'

'ঘুম ভাঙলো কী করে?'

'ওনার চিৎকারে।'

'চিৎকার?'— শুভ্র প্রশ্ন করল, 'কী বলে চিৎকার করল?'

'বলল, দেবী!!!'— বলতে গিয়ে তীব্র আতঙ্কে রাবেয়ার মুখটা কালো হয়ে গেল।

'দেবী বলেছিল?'— অবাক শুভ্র প্রশ্ন করল, 'তুমি ঠিক শুনেছ?'

'জী, ঠিক শুনেছি।'— বলল রাবেয়া।

'ঠিক আছে',— বলল শুভ্র, 'চিৎকার শুনে তোমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর? ঘুম ভাঙার পর কী হলো?'

'ঘুম ভাইঙ্গা, শোবার ঘর থিকা বাইরইয়া দেখি,'— বলল রাবেয়া, 'খিড়কির দরজাটা হাট কইরা খোলা, বুকটা কেমন কইরা উঠল। দৌড় দিয়া গেলাম কুয়াতলায়। গিয়া দেখি...'— গলা আটকে গেল রাবেয়ার।

'কী দেখলে সেখানে?'— অধৈর্য হয়ে উঠল শুভ্র।

'এই তো দেখলাম। বালতি পইড়া আছে, গামছা পইড়া আছে, কিন্তু মানুষটা নাই।'

'তারপর?'

'তারপর চিল্লাইয়া লোক জড়ো করলাম। কয়েক ঘণ্টা লাগল। কলাবনের মধ্যে ঢুইকা দেখি, মানুষটা মইরা কাঠ হইয়া আছে।'

'অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে সেখানে?'

'একটা গন্ধ পাইছিলাম জনাব। আঁইঠা গন্ধ। আর কি জানেন,'— ভয়ে আবার গলা শুকিয়ে গেল রাবেয়ার।

'কী, বলো।'

'মইরা কাঠ হইয়া পইড়াছিল মানুষটা। কিন্তু ওর দৃষ্টিটা ছিল মজুমদার বাড়ির দিকে।'

'সেখানে আশপাশে আর কাউকে দেখেছিলে তুমি?'— প্রশ্ন করল শুভ্র।

চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলল রাবেয়া, 'আমরা পাপী। দেবী আমাদের দেখা দিলে সেটাই হবে আমাদের শেষ দেখা।'

থম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইল শুভ্র। কী প্রশ্ন করবে, কাকে প্রশ্ন করবে? কিছুই মাথায় এলো না।

কন্সটেবল ততক্ষণে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছে। সেটা জ্বালিয়ে কুয়োতলার এদিক-ওদিক আলোটা বুলিয়ে নিল শুভ্র। প্রথমেই যেটা নজর পড়ল সেটা হলো, আলতা রঙের পায়ের ছাপ। নিখুঁত পায়ের ছাপ। যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে কুয়োর ঠিক পাশে। সেখান থেকে চলে গেছে কলাবনের দিকে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে কলাবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল শুভ্র।

কুন্দুসের দেহ যেখানে পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা পেরিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে কলাবনের গহনে। ঘন বন, দুটো গাছের মধ্যে জায়গায় জায়গায় এক হাতেরও ব্যবধান নেই। পচা পাতার স্তূপে পা ডুবে যায়। জেদ ধরে এগিয়ে চলল শুভ্র। কলাবন যেখানে শেষ হলো, পায়ের ছাপও সেখানেই এসে মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওপারে প্রকাণ্ড একটা মাঠ। শেষরাতের মলিন চাঁদের আলোয় ঘোলাটে সাদা হয়ে আছে। কলাবন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা কালো পোড়ামাটির হাঁড়ি পড়ে আছে। হাঁড়ির ওপর ছ'টা লাল ফোঁটা কাটা। তার মধ্যে চারটে ফোঁটাকে কে যেন লম্বা আঁচড় দিয়ে ধেবড়ে দিয়েছে।

আগে ছিল তিনটে ফুটকি, তিনটি ঢ্যাঁড়া। এখন চারটে ফুটকি, দুটি ঢ্যাঁড়া। এটা কি কোনো কাউন্টডাউন? কীসের কাউন্টডাউন? মানে কী এর?

মাঠের ওপারে একটা দোতলা পাকা বাড়ি। জরাজীর্ণ, জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বট-অশ্বত্থ গজিয়ে গেছে গায়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোথাও একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে। পোড়ো মজুমদার বাড়িতে কে থাকে?

কলাবন পেরিয়ে কুন্দুসের বাড়িতে ফিরে এলো শুভ্র। রাবেয়া বিবি তখনও বসেছিল দাওয়ায়।

'কলাবনের ওপারে ওটা কার বাড়ি?'— আঙুল দেখিয়ে বলল শুভ্র, 'পাকা দোতলা বাড়ি। কার বাড়ি ওটা?'

মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে কালো হয়ে গেল রাবেয়ার মুখ।

'ওইটাই তো মজুমদার বাড়ি',— আঁচলে মুখ ঢেকে অস্পষ্ট স্বরে বলল রাবেয়া।

জীবাশ্ম

ভাঙা পাঁচিল। সিংহদরজার মাথায় মুখভাঙ্গা দুটো সিংহ। জংধরা লোহার গেটটা ভেঙে পড়ে আছে একপাশে। বাগানটা আগাছা ভর্তি। সেই থই থই আগাছার মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা তুলসীমঞ্চ। তুলসীর মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো নাকে। অনেক চেনা, অনেক মায়া, অনেক ভালোবাসা সেই গন্ধটায়। বিস্মৃত জন্মের ভালোবাসার গন্ধ। ধীর সতর্ক পদক্ষেপে বাগান পেরিয়ে বাড়িটার সামনে পৌঁছল শুভ্র।

With Best Compliments from-

ANIL AHUJA

Ahujas Web Pvt. Ltd.

6/47, W. E. A, Karol Bag

New Delhi- 110005

With Best Compliments from :-

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX SX | NSDL

R K Global

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar

Ghaziabad

Uttar Pradesh

Pin - 201001

সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুরাকালের বিলুপ্ত কোনো প্রাণীর জীবাশ্মর মতো বিশাল এক বাড়ি। উঠোন, নহবতখানা, নাটমন্দির, ধুলোয় ঢাকা লম্বা করিডর। মাকড়সার জালে ছেয়ে আছে। সাপের খোলস পড়ে আছে যত্রতত্র। করিডরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শুভ্র। পা যেন কেউ চেপে ধরেছে। সামনের ঘরটা যেন একটা ভিন্ন সময়ে আটকে আছে। একটা ভিন্ন জগৎ, যে জগতের স্মৃতিগুলো অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। সেই সময়টা এখনও বেঁচে আছে ওই বাড়িটাতে। ভয় করছে। মনে হলো শুভ্রর, একবার ওই বাড়িটাতে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না। চিরকালের মতো অতীতে হারিয়ে যাবে। কিন্তু একটা অমোঘ আকর্ষণ, একটা সম্মোহন বাড়িটার দিকে টানছে ওকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে জ্বালিয়ে মাকড়সার জাল সরাতে সরাতে করিডর ধরে এগোলো শুভ্র। দোতলার বারান্দার অবস্থাও একইরকম। ভর্তি মাকড়সার জাল। মেঝেতে একরাশ ধুলো। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে বেশিরভাগ জায়গায়। একটা জায়গায় বারান্দার রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়েছে। শুভ্র দেখল, বারান্দার শেষপ্রান্তের ঘরটা থেকে ক্ষীণ একটা আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সেইদিকে। চৌকাঠে পৌঁছে দেখল, ঘরটার ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ কি থাকে এখানে? শখ করে কে থাকে এই ভাঙা বাড়িতে?

অনেক ইতস্তত করে শেষে চৌকাঠ পেরিয়ে পা বাড়াল। ঘরটায় ঢুকে চমকে গেল। ধূপের গন্ধ ভুরভুর করছে ঘরে। ঝকঝকে পরিষ্কার ঘর। যেন এই মাত্র কেউ সাফ করে গেছে। ঘরে একটা খাট, আলমারি, টেবিলে খানকতেক বই, পাশে রাখা দুটো চেয়ার, একটা আলনায় কিছু জামাকাপড়। ঘরের কোণে একটা লম্বা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক, টিকটিক শব্দ করে মাথা দুলিয়ে চলেছে। একটু দূরে চকচকে লাল সিমেন্টের মেঝের ওপর সাদা আসন পাতা। দেখে মনে হয়, যেন কোনো সাধক এইমাত্র পুজো সেরে আসন ছেড়ে উঠেছেন।

গলা খাঁকারির শব্দে সংবিৎ ফিরল শুভ্রর। চমকে মুখ তুলে দেখল, ঘরের শেষ প্রান্তে একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সাদা ধবধবে জামা আর পাজামা। হাতে ওয়াকিং স্টিক। লম্বা সাদা চুল কাঁধ গড়িয়ে নেমেছে। লম্বা সাদা দাড়িতে ঢাকা মুখ, সেই দাড়ি নেমেছে বুক পর্যন্ত। গোঁফদাড়ির ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বল করছে একজোড়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ। আপনিই মাথা ঝুঁকে এলো শুভ্রর।

'গুড মর্নিং', — বলল সেই লোকটি, 'আমার নাম আঞ্জুমান আজিজি সাগর।'

গম্ভীর গলার স্বর, একটু চেরা-চেরা। গলার স্বরে যেন সম্মোহন রয়েছে।

'গুড মর্নিং,'— নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল শুভ্র।

'আপনার পরিচয় তো আপনার পোশাকই দিচ্ছে', — বলল লোকটি, 'নাম দেখছি ইরফান মণ্ডল। তো বলুন ইরফান সাহেব, এখানে কী উদ্দেশে এসেছেন? আচ্ছা, তার আগে বরং এখানে এই চেয়ারে বসুন। বসে বসে কথা বলা যাবে। আমার আবার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কোমরে ব্যথা হয়।'

দুটো চেয়ার টেনে বসল দুজনে। শুভ্র বলল,

'মাফ করবেন, আপনাকে দেখে ভবঘুরে বলে মনে হয় না। তাহলে এই পোড়ো বাড়িতে কী করছেন?'

'একটা এনজিও-র কাজে এসেছি আমি দেশে',— বলল সাগর, 'জন্ম বাংলাদেশে হলেও বর্তমানে আমি স্টেটসের নাগরিক। এই অঞ্চলে সোলার শেয়ার, মানে সৌরশক্তিভিত্তিক সোলার পাওয়ার গ্রিড নিয়ে কাজ করতে এসেছি। বিশাল সুযোগ আছে এই ক্ষেত্রে। কাজের নামে কাজ হবে, জন্মভূমিকে কিছু ফিরিয়েও দেওয়া হবে।'

'কিন্তু এই পোড়ো বাড়িতে কেন থাকছেন?'— প্রশ্ন শুভ্রর, 'স্টেটস থেকে এসেছেন, কোনো ভালো হোটেলে থাকলে ভালো হতো নাকি?'

'বলছি',— বলল সাগর, 'কিন্তু তার আগে চলুন, বাইরে একটু ঘুরে আসি। সূর্যোদয় হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। গ্রামবাঙ্গলার সূর্যোদয় আমি একদিনও মিস করতে চাই না।'

'ঠিক আছে,'— বলল শুভ্র, 'কিন্তু তার আগে আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখালে ভালো হয়।'

'আইডেনটিটি চেক করবেন?'— বলল বৃদ্ধ।

'আপনার আপত্তি না থাকলে।'

'না, না, আপত্তি কীসের?'

ড্রয়ার থেকে পাসপোর্টটা বের করে দেখাল বৃদ্ধ।

পাতা উল্টে ভালো করে দেখে ফেরত দিল শুভ্র।

'এবার চলুন,'— বলল বৃদ্ধ, 'সূর্যোদয় দেখে আসা যাক।'

অতিথি

সামনের মাঠ আর তার ওপারের জঙ্গলটা কালো কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে। ভাঙা পাঁচিল আর আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নতুন একটা দিন।

ঘন নীল আকাশ এখন এক মায়াময় কমলা রংয়ে মাখামাখি। পরতের পর পরত মেঘ আকাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। তাদের গায়ে ধীরে ধীর লাগছে সোনার রঙের আভা।

সামনের মাঠের মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো সরু একটা পথ চলে গেছে জঙ্গলের ভেতর। চলতে চলতে হঠাৎ বাঁদিকে মোড় ঘুরেছে, কালচে সবুজ ঝোপের পেছনে অদৃশ্য হয়েছে। অনেক উঁচু উঁচু গাছ ওখানে। থোকা থোকা বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে ওইসব গাছে। সে গাছের গায়ে চাঁপা কুড়ির আলো, নীচে শিশিরের আর্দ্রতা। সবকিছুই কেমন যেন অবাস্তব লাগছে। পরাবাস্তব আর বাস্তবের ভেদ মুছে যাচ্ছে। জীবন শব্দটাই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে অর্থহীন। স্বপ্ন শুধু মায়া।

'মা, মা',— ফিসফিসিয়ে বলে উঠল সাগর, 'তুমি কোথায় লুকিয়ে আছো মা? বলো মা। যদি জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিয়েও তোমাকে ফিরিয়ে আনতে হয়, আমি তাই করব।'

ভেজা গলার স্বরে অনেক লুকোনো যন্ত্রণা। শুভ্র দেখল, বৃদ্ধ থরথর করে কাঁপছে।

'আপনি একটু বসুন এখানে,'— পাথরের ভাঙা বেদীর দিকে তাকিয়ে বলল শুভ্র।

বেদীর উপর বসল দু'জনে। দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা কুঁড়েঘরের মাথা। তাদের মাথাতেও লেগেছে সোনার আঁচ। অনেক রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে পথের দু'ধারে।

'আমার কাহিনি জানতে চেয়েছিলেন তো?'— বলল সাগর, 'বলি শুনুন, আমার আব্বা আর এই মজুমদার বাড়ির মেজ ছেলে ছিলেন সহপাঠী। কলেজের সেই বন্ধুত্ব আজীবন অম্লান ছিল। ছুটিছাটায় অনেক এসেছি এই বাড়িতে। আব্বার ছিল বদলির চাকরি। তাই কোনো জায়গার সাথেই শিকড় গজায়নি। এই বাড়ির সাথে কিন্তু একটা টান রয়ে গেছে আমার। কত এসেছি, কত খেলেছি এই বাগানে। কত ভালোবাসা পেয়েছি। আব্বার এন্তেকালের পর আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এই বাড়ির সঙ্গে। তাই যখন এই প্রজেক্টটা নিয়ে দেশে এলাম ভাবলাম এই বাড়িতেই এসে উঠব। এসে দেখি, কেউ নেই। সেই মানুষগুলোর কী হয়েছে কেউ বলতে পারল না। একবার ভাবলাম, ঢাকায় ফিরে যাই। তারপর শুনলাম, এই গ্রামের কাশেম সাহেব এখন এই বাড়ির মালিক। বাড়িতে থাকে না সে, কিন্তু তার বড় ছেলে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য মাঝে মাঝে বাড়িটা ভাড়া দেয়। কী মনে হলো, কাশেম সাহেবের সেই ছেলের কাছ থেকে একটা ঘর আর কিছু আসবাবপত্র একমাসের জন্য ভাড়া নিলাম। এই হলো আমার কাহিনি। এবার আপনার কথা বলুন। সরকারি কাজ ফেলে এই পোড়োবাড়ির সৌন্দর্য দেখতে আসেননি নিশ্চয়?'

'কতকটা তাই',— লজ্জা পেয়ে বলল শুভ্র, 'আসলে গতকাল রাতে এই গ্রামে একটা খুন হয়েছে। ভিকটিম মরার সময় নাকি এই বাড়িটার দিকে ইশারা করেছিল।'

'আপনার মনে হয়',— বলল সাগর, 'খুনি এই বাড়িতে লুকিয়ে আছে?'

'হতে পারে,'— বলল শুভ্র।

'বিশাল বাড়ি,'— বলল সাগর, 'এর আনাচে-কানাচে কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, আমার জানা সম্ভব নয়। আমার এই শারীরিক অবস্থায় আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবে, সেটাও কষ্টকর।'

'না, না। সে কী কথা!'— বলল শুভ্র, 'আমিই সব ঘুরে দেখে নিচ্ছি। তবে একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে জানতে পারলে ভালো হতো।'

'কী বলুন।'

'এই বাড়িতে একটা মন্দির আছে শুনেছি। মন্দিরে এককালে বিগ্রহ ছিল, এখন শুনেছি নেই।'

'দেবী মাতঙ্গীর বিগ্রহ',— বলল সাগর, 'সেই দেবীর নামেই তো এই গ্রামের নাম। মন্দিরটা দেখতে যাবেন? দেখিয়ে আনতে পারি। ওই জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। এই বাড়ির পিছন দিকে। একটা পুকুরঘাট আছে, তার পাড়ে। অনেক জবাফুলের গাছ আছে সেখানে। পুকুরে পদ্মফুল আস শাপলা ফুটে থাকে অনেক। আর এখন তো ঝোপেঝাড়ে শুধু কাশফুলের মেলা। চলুন, ওই জায়গাটা অন্তত আপনাকে দেখিয়ে আনি।'

'চলুন',— বলল শুভ্র, 'শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে আর ইরফান সাহেব বলে ডাকবেন না। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বড্ড অস্বস্তি হয়। আমার ডাকনাম শুভ্র, আমাকে শুভ্র বলে ডাকতে পারেন।'

'নিশ্চয়',— বলল বৃদ্ধ, 'শুভ্র, সুন্দর নাম।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন,'— বলল শুভ্র, 'সেই মন্দির তো

With Best Compliments from :-

A Well Wisher

আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমি শুনেছি, গ্রামের কিছু লোক মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর করেছিল। সেই বিগ্রহের ভাঙা টুকরোগুলো কি মন্দিরের ভিতরেই আছে?'

'কই, না তো।'— বলল সাগর, 'বিগ্রহের কোনো টুকরো তো মন্দিরের ভিতরে নেই।'

'একটা টুকরোও নেই?'— অবাক হলো শুভ্র।

'না, একটা টুকরোও নেই,'— বলল সাগর, 'আপনি তো যাচ্ছেন সেখানে, নিজের চোখেই দেখে নেবেন।'

পাথরের মূর্তি। শাবলের আঘাতে তাকে তো আর ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে মূর্তির টুকরোগুলো কোথায় গেল? তবে কি গ্রামবাসীরা যা বলছে, সেটা সত্যি? দেবী...

ঠিক এই সময় শুভ্রর ফোনটা বেজে উঠল।

'স্যার, ফুল্লরা গ্রামে একটা খুন হয়ে গেছে',— বলল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

'কী ধরনের খুন?'— প্রশ্ন করল শুভ্র, 'এই অঞ্চলে হঠাৎ করে খুনজখম বেড়ে গেল?

'একটা বউ, বঁটি দিয়ে হাজবেন্ডের মাথা কেটে দিয়েছে। এক কোপে পুরো ধড় থেকে আলাদা। আসলে, রোজ রাতে বাড়ি ফিরে বউকে মারধর করত লোকটা। বউটা আর সহ্য করতে পারেনি। লোকে বলছে, সে কী দৃশ্য! এলো চুল, হাতে বঁটি, চোখ লাল, রক্তমাখা শরীর, যেন সাক্ষাৎ মা কালী...'

'ঠিক আছে,'— বলল শুভ্র, 'আমি এক্ষুনি আসছি।'

অলৌকিক

প্রাচীন এক বটগাছের নিচে গ্রামের চায়ের দোকান। আগে এটা ছিল হারাধন মণ্ডলের। এখন চালায় জয়নাল।

গুমোট গরম। একটুও বাতাস বইছে না। মাদ্রাসার রাতের রান্না সেরে রোজকার মতো এখানেই এসেছিল শফিকুল। রাতে এই চায়ের দোকানে দেশি মদের আড্ডা বসে। সাথে তাস খেলা হয়। শফিকুল, জয়নাল ছাড়াও আরও জনা পাঁচ-সাতেক গ্রামবাসী এই আড্ডায় নিয়মিত সদস্য। আনিস, জুয়েল, জুনেদা, রবিউল। আরও ক'জন। আজ কারোরই তাস খেলার মুড নেই।

'বোঝলা কিনা', চায়ের গেলাসে স্বচ্ছ পয়লা পানি ঢেলে বলছিল শফিকুল, 'হেইসব দেবী-টেবী কিছু নয়। কাশেমের অনেক শত্রু আছিল। কত লোকের জমি কাইড়া সম্পত্তি বাড়াইয়া বড়লোক হইছিল কাশেম। তাদের কেউ রাইতের ব্যালায় আইসা মাইরা দিছে ওরে।'

'আর কুদ্দুস?', বলল রবিউল, 'তারে ক্যান মারল?'

'কাশেমের সব পাপেই কুদ্দুস ছিল সাঙাৎ', গেলাসে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল শফিকুল, 'যে কাশেমেরে মারছে, সেই ওই একই কারণের লগে কদ্দুসরেও মারছে।'

'কিন্তু হেডা মারল কি কইরা?', ডিমসেদ্ধর একটা টুকরো নুন মাখিয়ে মুখে পুরে বলল জয়নাল, 'না রে, লক্ষণ আমি ভালো দেখি না। লাল সুতা, ছাই-হেই সব হইল হিন্দুদের তন্ত্রমন্ত্রের জিনিস। হারাধন আমারে বলছিল, মাতঙ্গী দেবী নাকি সাথে কইরা ভূতপ্রেত লইয়া ঘুইরা বেড়ায়। এখন ভাইবা দেখ, তুই দেবী না মানতে পারস, কিন্তু ভূত তো মানবি? জিন? আইজ এইখানে যদি...'

ঝরঝর শব্দ করে একরাশ পাতা ঝরে পড়ল গাছ থেকে। চড়াক চড়াক শব্দ হলো চায়ের দোকানের টিনের চালে। চমকে উঠল সবাই।

'কি হইল?' কাঁপা গলায় বলল জুনেদ।

'হেইটা কিছু না', বলল জুয়েল, 'পক্ষী হইব। দে, লবণটা একটু বাড়াইয়া দে। জয়নাল, একদিন হাঁসের ডিম দিয়া...'

হুড়মুড় করে একটা বড়ো গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। চাল থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। দোকানের সামনেই। পড়িমরি করে উঠে সবাই বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

'কে? কে?' ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করল শফিকুল।

যেন উত্তর দিতেই, আরও একরাশ পাতা ঝরে পড়ল শেওয়া ধরা বটগাছের মাথা থেকে।

'বান্দর... বান্দর...', সাহস দিতে বলল জুয়েল, 'তরা হইলি ডোউরা ব্যাটা, বান্দর গাছে চইড়া লাফাইতাসে, সেই দেইখা ডরাস।'

'বান্দর?', বলল শফিকুল, 'হইব বা। কিন্তু এই রাইতের ব্যালায় বান্দরের দল গাছে চইড়া নাচন কোদন করে ক্যান?'

ঠিক এই সময় ফিসফিস করে বলল আনিস, 'হেইটা কি, কও তো?'

পেছন ফিরে দেখল সবাই, দোকানের ঠিক সামনে পথের মাঝে একটা চারাগাছ। একটু আগেও তো ওটা ছিল না ওখানে। কোত্থেকে এল?

সবাইকে চমকে দিয়ে চোখের সামনেই একটু একটু করে বড়ো হতে লাগল চারাগাছটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে দাঁড়াল ঝাঁকড়া একটা বেলগাছ। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল মদের আসরের সবাই। দোয়া দরূদ যা যার মনে ছিল, সব একসঙ্গে আওড়াতে শুরু করল। বেলগাছ ধীরে ধীরে গলে হাওয়ায় মিশে গেল। অনেক কুয়াশা জড়ো হয়েছে গাছতলায়। সেই কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অস্বাভাবিক লম্বা এক নারীর অবয়ব। কালচে শেওলা গায়ের রঙ। হাতে ঢাল তরোয়াল।

শরীর থেকে অপার্থিব আলোর বিকীরণ হচ্ছে। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই মূর্তিকে।

'দেবী!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল জয়নাল। ঠাস করে শব্দ হলো। জয়নাল দেখল, জুনেদ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। পরমুহূর্তেই হাহাহাহা আর্তনাদের সঙ্গে একরাশ কালচে সবুজ পাখি কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সোজা উঠে গেল আকাশে। জয়নাল দেখল, অপার্থিব সেই মূর্তি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বাতাসে তীব্র ঘৃণার গন্ধ। প্রতিহিংসার গন্ধ।

প্রাণের ভয়ে দৌড় দিল জয়নাল। দৌড়োতে দৌড়োতেই হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। জ্ঞান হারাল।

সেদিন মদের আসরের কে যে কোথায় পালাল, আর কে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পড়ে রইল, শুধুমাত্র পরদিন সকালেই জানা গেল সেটা। তার সঙ্গে গ্রামময় খবর রটে গেল, রাতবিরেতে বাড়ির বাইরে বেরোনো আর নিরাপদ নয়।

সমীরণ

ঢাকার বারিধারা এলাকার এই ফ্ল্যাটটা কুড়িতলার। শহরের গোলমাল মশা-মাছি কিছুই এখানে পৌঁছায় না। তাই ঘুমটা ভালোই হয়। অক্টোবর মাস, শহরে গরম থাকলেও এই উঁচুতে ঠাণ্ডা বাতাস বয়। হালকা একটা কাঁথা জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিল সমীরণ। শেষরাতে ঘুমটা বেশ জমিয়ে ধরেছিল। সুরেলা আওয়াজে সেই ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। জানালার কাঁচে চড়বড় চড়বড় শব্দ হচ্ছে। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ।

ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বিছানার মধ্যে বসে থাকল সমীরণ। আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে? ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলো সে। মোবাইল ফোনটা বাজছে। এত রাতে কে ফোন করেছে? অ্যামবাসি অফিস থেকে কেউ? এত রাতে কী এমন দরকার পড়ল? বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল, শব্দ সেটা থেকে আসছে না।

ফোনটা তাহলে বাজছে কোথায়?

আওয়াজটা বেডসাইড টেবিলের নিচের ড্রয়ার থেকে আসছে।

বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে দিল ড্রয়ারের নবে, ক্লিক শব্দ করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক খুলে গেল। ড্রয়ারটা নিঃশব্দে ঠেলে বেরিয়ে এলো আলতো করে। ভেতরে এনক্রিপ্টেড ব্ল্যাকবেরিটা তখনও তারস্বরে গান গেয়ে চলেছে। এত রাতে এতে কে ফোন করল?

স্ক্রিনে চোখ পড়ল সমীরণের। সেখানে লেখা ধ-র-র!

ঘুমটা চটে গেল সেই মুহূর্তেই।

'হ্যালো, সমীরণ দে স্পিকিং,'— গলাটা কেমন যেন ফ্যাকাশে শোনালো।

'আমি বলছি',— উত্তর ভেসে অপর প্রান্ত থেকে।

'বলুন,'— উত্তর দিল সমীরণ।

মাথাটা হঠাৎ করেই বড্ড দপদপ করছে।

'আমাদের একজন রোগ এজেন্ট বর্ডার ক্রশ করে ওদিকে কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে, খুজে বের করার জন্য।'

'একটু খুলে বললে ভালো হয়',— বলল সমীরণ।

'এজেন্টের নাম এম-সেভেন। দুবাইতে একটা কাজে গিয়েছিল। দেশে ফিরেছে গত সপ্তাহে। কিন্তু ফিরে এসে অফিসে আর রিপোর্ট করেনি। দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেছে।'

'সে এদিকে এসেছে?'— বলল সমীরণ, 'এমনটা কী করে জানতে পারলেন?'

'এম-সেভেনের তিনটে অলটারনেটিভ আইডেনটিটি আছে। তারই একটা ব্যবহার করে ও দিল্লি থেকে প্লেন ধরেছিল কলকাতার। সেখান থেকে গিয়েছিল মালদা জেলায়। ওখান থেকেই বর্ডার ক্রশ করেছে।'

'বুঝতে পারলাম না,'— মাথা নেড়ে বলল সমীরণ, 'বর্ডার ক্রশ করেছে সেটা জানতে পারলেন কী করে?'

'কারণ, ওর ব্যবহার করা একটা জিনিসে ট্র্যাকার লাগানো ছিল। সেটা বর্ডারের ওপারে ভাটিয়া বিলে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।'

'হয়তো কোনো গোপন অপারেশন আছে',— বলল সমীরণ, 'আপনাদের তো এক হাত কাজ করলে অন্য হাত জানতে পারে না।'

'ব্যাপারটা এতো সহজ নয়।'

'আপনি কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন,'— দৃঢ়স্বরে বলল সমীরণ, 'সবকিছু খুলে না বললে, আমি আমার নেটওয়ার্ককে রিস্ক করব কী করে?'

'হুঁ', — বলল অন্যদিকের লোকটা, 'শুনুন, কথাটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। এমনকী আপনার নেটওয়ার্কের লোকেরাও নয়।'

'ঠিক আছে,'— বলল সমীরণ, 'তাই হবে। এবার বলুন।'

'এম-সেভেন যে সময় দুবাইতে ছিল, সেই সময় ওখানে একটা খুন হয়েছে। খুনের পদ্ধতি অভিনব। ও ছাড়া আর কারোর পক্ষে ওভাবে খুন করা সম্ভব নয়।'

'কেন?'— বলল সমীরণ, 'সে সময় দুবাইতে আপনাদের আর কোনো এজেন্ট ছিল না?'

‘ছিল.. কিন্তু...’— ইতস্তত করল ফোনের উল্টোদিকের লোকটা, ‘... কিন্তু ওর মতো আর কেউ ছিল না। মানে... ও আমাদের এজেন্ট, কিন্তু ঠিক আমাদের এজেন্ট নয়।’

তার মানে টি এস ডি! টেকনিক্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। গলা শুকিয়ে এলো সমীরণের। হে ভগবান, একী ঝামেলা এসে পড়ল ঘাড়ে!

‘টি-এস-ডি তাহলে সত্যিই একজিস্ট করে?’— বলল সমীরণ, ‘ব্যাপারটা নেহাত গুজব নয়?’

কোনো উত্তর এলো না অন্য প্রান্ত থেকে।

‘বুঝলাম’,— বলল সমীরণ, ‘আর কিছু বলবেন?’

‘যেদিন এম-সেভেন বর্ডার ক্রশ করেছে, সেই রাতে মালদায় একটা হাই প্রোফাইল খুন হয়েছে। একজন স্থানীয় পলিটিক্যাল নেতা। একই খুনের পদ্ধতি।’

‘তার মানে...’ হঠাৎ করেই খুব শীত করতে লাগল সমীরণের।

‘এম-সেভেন এমনি এমনি বর্ডার ক্রশ করেনি,’—বলল অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসা স্বর, ‘প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর মানুষ সে নয়। সে যখন তোমাদের ওদিকে গিয়েছে, তখন কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে। তোমার অন্য ব্ল্যাকবেরিতে ওর কিছু ডিটেলস্ পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখে নিয়ে ডিলিট করে দিও। আর একটা কথা...’

‘বলুন।’

‘ওকে শুধুই ট্র্যাক করবে, আর খুঁজে পেলে আমাকে রিপোর্ট করবে। কোনোভাবেই ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়। এম-সেভেন ইন অ্যান অ্যাসেট টু দ্য কান্ট্রি।’

‘জয় হিন্দ!’

‘জয় হিন্দ!’

ফোন ছেড়ে দিল সমীরণ। কাঁথাটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে। স্ক্রিনের ওপর ‘ধ-র-র’ লেখাটা কিছুক্ষণ ভেসে তারপর মিলিয়ে গেল।

ধ-র-র— ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

জানালার দিকে চোখ পড়ল সমীরণের। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, মুষলধারে।

কারখানা

হাইওয়ে ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে দশ মিনিট হাঁটার পর শুরু হলো জায়গাটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে শুধু ভাঙাচোরা বাড়ি আর অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছপালা। পুরো এলাকার মধ্যেই কেমন যেন একটা অযত্নের ছাপ, একটা পরিত্যক্ত ভাব। নোংরা, অন্ধকার, আগাছা আর জঞ্জালে ভরা। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি। পাকানো গোঁফ, লম্বা কাঁচাপাকা চুল।

প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর রাস্তার ধারে একটা বাড়ি দেখতে পেল ভদ্রলোক। বাড়ির চাল ভেঙে পড়েছে, সামনে অজস্র ঝোপঝাড় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরি করেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবাড়ি কোনো শরীরধারী মানুষের প্রবেশ ঘটেনি বহুকাল যাবৎ। কিন্তু আশ্চর্য, ওই ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র থোকা থোকা জবা আর স্থলপদ্ম। রাস্তাটা মাতোয়ারা হয়ে আছে সেই গন্ধে। নেশা ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে।

জনমানব নেই কোনোখানে।

রাস্তাটা এক জায়গায় ভাঙা, খানাখন্দে ভরা। সেই ভাঙা জায়গায় আগাছাগুলো বেড়ে হয়ে গেছে জঞ্জাল। আগাছার জাল ভেদ করে, গর্তগুলোর পাশ কাটিয়ে অনেক কষ্টে এগোলো ভদ্রলোক। কিছুদূর গিয়ে আবার ভাঙাচোরা রাস্তা সরু হয়েছে। সেই রাস্তার মাঝখানে ডানদিকে নজরে পড়ল একটা খোলা মাঠ। তেলকালি মাখা, ঘাস নেই, ন্যাড়া। অনেক ভাঙাচোরা গাড়ি ছড়িয়ে আছে আশপাশে। কোনো গাড়ির দরজা নেই, তো কোনো গাড়ির চাকা নেই। কয়েকটা গাড়ির তো শুধু অর্ধেকই পড়ে আছে। টুকরো লোহা, টুকরো রাবার পড়ে আছে এদিক ওদিক। এ যেন গাড়ির ভাগাড়। গাড়ির মৃতদেহ সব ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

এটাই কি সেই জায়গা?

সামনেই পড়ে রয়েছে উইন্ডস্ক্রিন ভাঙা একটা জাপানি গাড়ি, বোধহয় নিসান সানি। অনেক ধুলো জমে আছে সারা শরীরে। এমনকী সিটের ওপরও অনেক ধুলো। লালচে ইঁট রঙের বডির ওপর জঙের দাগগুলো যেন কুষ্ঠের ঘা।

কড়মড় করে আওয়াজ হলো পায়ের নীচ থেকে। তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোক, কাঁচের টুকরো, পায়ের নীচে পড়ে আরও অসংখ্য টুকরোতে ভেঙে গেল। সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ভদ্রলোকের প্রতিবিম্ব। ভাঙার পরমুহূর্তেই এক থেকে অসংখ্য হলো প্রতিবিম্ব। প্রতিটি টুকরোয় একটা প্রতিবিম্ব। ঠিক তখনই অনুভব করল, আশপাশে আর কেউ আছে।

মাঠের ওপারে টিনের শেড। চুপিসারে সেখানে ঢুকে পড়ল ভদ্রলোক। সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল পেছনে। টিনের চালের ফাঁক দিয়ে যে আলো আসছে, তাতে ঘরের ভিতরটা দেখতে অসুবিধা হলো না ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ চোখদুটোর। ঘরের মেঝে, দেওয়াল সব টিনের। সাদা সিমেন্টের মেঝে, ভাঙাচোরা। হরেক রকমের যন্ত্রপাতি রয়েছে ঘরে। লেদ মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন। রেডিয়ো সারাইয়ের সল্ডারিং আয়রন, নানা সাইজের। দেওয়ার ধরে সারি সারি তাক। তাতে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানান রঙের শিশিবোতল। টুকরো টুকরো যন্ত্রপাতি। দেখে মনে হলো, খুঁজরে এখানে আস্ত একটা রকেটও পাওয়া যেতে পারে।

'এখানে কী করতিছেন জনাব?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোক দেখল, 'ঘরের এক কোণে টুলের ওপর তেলকালি মাখা একটা বুড়ো বসে আছে। পরনে মলিন লুঙ্গি, জামা।

'নাম কী তোমার?'— প্রশ্ন করল ভদ্রলোক।

'জী, ওসমান', — লোকটা বলল।

'হুঁ,'— বলল ভদ্রলোক।

'জনাব',— আবার বলল লোকটা, 'কী কাম, কন।'

'আমি একজন লোকের খোঁজে এসেছি।'— বলল ভদ্রলোক।

'সেডা ক্যাডা?'— প্রশ্ন ওসমানের।

'লোকটার নাম সতীশচন্দ্র বসু।'— বলল ভদ্রলোক, 'চেনেন নিশ্চয়?'

'ওই নামে এখানে কেউ নাই।'— গম্ভীর মুখে বলল ওসমান, 'আপনি এখান থিকা যান, জনাব।'

'অনেক দূর থেকে আসছি আমি',— বলল ভদ্রলোক।

'কই থিকা?'— ওসমানের স্বরে সন্দেহ।

'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ',— ভদ্রলোকের স্বরে অপার্থিব দৃঢ়তা, 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া।'

'ঠিকানা কী আপনার?'— টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওসমান, মুহূর্তে ওর ভাষা ও স্বর দুটোই পাল্টে গেল।

'১৩-এ, ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলকাতা', — বলল ভদ্রলোক।

'বেরিয়ে যান এখান থেকে',— আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো ওসমান, আঙ্গুল উঁচিয়ে দরজার দিকে দেখাল, 'বিশ্বাসঘাতক ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আর।'

কথাটার উত্তর দিতেই যেন বড় বড় পা ফেলে ভদ্রলোক এগিয়ে গেল ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে। সেখানে মেঝের উপর নোংরা একটা চটের টুকরো পড়ে ছিল। এক টানে সেটা সরিয়ে দিল ভদ্রলোক। দেখা গেল, নীচে মেঝের ওপর ছোট্ট একটা চৌকো জায়গা একটু উঁচু। অনেকটা বেদীর মতো। তার মাথার কাছে তামা দিয়ে এখটা চাঁদ-তারা আঁকা রয়েছে।

'খবরদার!'— রিভলবার তুলল ওসমান।

ব্লপ— একটা শব্দ হলো। হাত চেপে বসে পড়ল ওসমান। অবাক দৃষ্টিতে দেখল লোকটার ধরা রয়েছে ছোট্ট একটা বন্দুক।

কে এই ভদ্রলোক? চোখের নিমেষে বন্দুক বার করে বাঁ হাতে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে হাত থেকে রিভলবারটা ফেলে দিল। লোকটার ডানহাতে এখনও ছড়িটা ধরা রয়েছে। কী নিশানা লোকটার! বন্দুকের গুলিটা লাগল রিভলবারে, অথচ হাতটা ঝনঝন করছে। বন্দুক থেকে এত ভারী বুলেট বেরোলো কী করে?

ভদ্রলোকের বন্দুকটা ভালো করে দেখল ওসমান।

'হাতের তালুর মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়, অথচ ভারী রাইফেলের গুলি ছোঁড়ে। অসাধারণ বন্দুক! সাইলেন্সারও

রয়েছে। ওটা মনে হচ্ছে পয়েন্ট টু-টু এল আর এস বেরেটা মডেল টুয়েন্টি, তাই না? ইজরায়েলি মেড। কে আপনি? মোসাদ, না কি সি আই এ?'— বলল ওসমান।

উত্তর দিল না ভদ্রলোক। ছড়ি দিয়ে বেদীর চাঁদ-তারার নীচে সিমেন্টের ওপর ঘঁষে ঘঁষে একটা ওঁ এঁকে দিল। রঙের স্তর উঠে গিয়ে তার নীচ থেকে তামা দিয়ে আঁকা একটা ও-কার বেরিয়ে এল। বোঝা গেল ও-কারটা আগে থেকেই ছিল। শুধু সিমেন্টের মতো রং দিয়ে ঢাকা ছিল। যাতে সিমেন্টের মেঝের মধ্যে দেখা না যায়। 'ও' এবং চাঁদ-তারা মিলে হয়ে গেল 'ওঁ'। যেমনটা বাঙালি হিন্দুর ঘরে থাকে।

ছড়ি ফেলে হাঁটু গেড়ে বসল ভদ্রলোক। ও-কারটার ওপর হাত বোলাতেই বুঝতে পারল ওটা আসলে ধাতুর তৈরি একটা আংটা। সেই আংটা ধরে টান মারতেই ঘড়ঘড় শব্দ করে মেঝের একটা অংশ খুলে গেল। উঁকি মেরে দেখল ভদ্রলোক, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। ছড়ি হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সেই পাতালঘরে নেমে গেল ভদ্রলোক। পেছনে ওসমান।

'ইন্ডিয়ার সাথে কোনো সম্পর্কই যখন রাখতে চান না, তাহলে এটা এখনও রেখে দিয়েছেন কেন?'— পাতালঘরের পূর্ব দেওয়ালের দিকে ছড়ি উঁচিয়ে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল ভদ্রলোক।

দেওয়ালে তেলরংয়ে আঁকা একটি ছবি। পালিশ করা কাঠে বাঁধানো ফ্রেম। দেখেই বোঝা যায়, অনেক পুরনো ছবি। অখণ্ড ভারতের মানচিত্র। তার ওপর লেখা— জননী জন্মভূমিশ্চ, স্বর্গাদপী গরিয়সী। নীচে লেখা, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। ছবির নীচে সিঁদুর লেপা কষ্টিপাথরের বেদী। তার ওপর পঞ্চধাতুর কালীমূর্তি। বিগ্রহের পায়ের কাছে এককপি ভগবদ্‌গীতা। তার ওপর রাখা আছে এক অঞ্জলি জবাফুল।

দেওয়ালের ছবিটার দিকে আঙুল তুলে ভদ্রলোক বলল, 'এটা তো অনুশীলন সমিতির প্রতীক। এটা এখনও রেখে দিয়েছেন কেন?'

'কে আপনি?'— ওসমান বলল, 'সেটা কিন্তু এখনও বললেন না।'

জবাব দিতে নিজের গলা থেকে রুদ্রাক্ষমালা খুলে উঁচু করে তুলে ধরল ভদ্রলোক। মালার নীচে একটা তামার লকেট ঝুলছে। তাতে খোদাই করা বজ্রচিহ্ন। সাথে লেখা বন্দে মাতরম্।

'এটা কোথায় পেলেন আপনি?' — ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল ওসমান।

'ফৈজাবাদের এক সন্ন্যাসী', — বলল ভদ্রলোক, 'এটা দিয়েছিলেন আমার গুরুকে। বলেছিলেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী না কী ওটা তাকে দিয়েছেন। বলেছিলেন, যদি কখনো আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার পড়ে, এটা যেন ব্যবহার করা হয়।'

'আপনার ওই গুরুর নাম কী?'— দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ওসমান।

ঘরের এক কোণে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার রাখা ছিল। সেটা টেনে বসে পড়ল ভদ্রলোক।

'রামেশ্বর নাথ কাও,'— বলল ভদ্রলোক, 'নিবাস বারাণসী, চেনেন বোধহয়!'

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল ওসমান। কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, 'সেই একাত্তরের পর আজকে মনে পড়ল আমাদের!'

'আপনার নাম তো ওসমান নয়',— বলল ভদ্রলোক, 'তাই তো? আসল নামটা কী?'

'ক্ষিতি', — বলল ওসমান।

সংগঠন

'যখন পার্টিশান হয়েছিল, কেউই ভাবেনি সেটা চিরস্থায়ী হবে। ওরা ভেবেছিল, যুদ্ধে জিতে আমাদের আবার দাস বানাবে। আর আমরা ভেবেছিলাম, ওরা ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। সমস্যা এতদূর গড়াবে, সেটা কেউ আন্দাজ করেনি। আমি এসেছি সেই সমস্যারই একটা স্থায়ী নিষ্পত্তির সূত্রপাত করতে। সেই একাত্তরের মতো আবার আপনাদের সাহায্য চাই।' — বলল ভদ্রলোক।

'ইন্ডিয়াকে বিশ্বাস করে আবার ঠকব বলছেন?'— দুঃখের স্বরে বলল ক্ষিতি, 'ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়? আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে লড়াই করলাম, আমাদেরই তো ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছে ইন্ডিয়া। পূর্ববঙ্গ ছিল আমাদের প্রাণকেন্দ্র, সেটাকেই দেশের বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছে আপনাদের নেতারা। আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি এখানে।'

'মানছি',— বলল ভদ্রলোক, 'ভারত আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি। কিন্তু আপনারা তো জানেন, রাজশক্তি সবসময় দেশহিতে কাজ করে না। কিন্তু তার জন্য তো আপনারা ভারতবর্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না। পারেন কি? আপনারা এক মহান পরম্পরার উত্তরসূরী। আপনাদের সংগঠনের জন্যই ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন দেশ। আপনাদের দোষত্রুটির কথা বলব, এ আমার ধৃষ্টতা। তাই যে কথাগুলো এখন বলতে যাচ্ছি, তার জন্য প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিলাম।

যে কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধই আক্রমণ আর আত্মরক্ষার একটা মিশ্রণ।

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station
Only 1 km. from Connaught Place
Homely Atmosphare
Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road
Ram Nagar,
New Delhi - 110055
Phones : 23622767, 23623398, 23618232
STD : 23530775, 23533398,23618232
Cont : 9811044543
E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in
Fax : 91-11-23636380

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

আমি যখন আমার পা-দুটো তুললাম প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারার জন্য, তখনই আমাকে ঠিক করতে হবে, মারব কী মারব না। যদি মারি, সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি অরক্ষিত। যদি আমার লাথিটা শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে না পারে, তবে শত্রু আমার আক্রমণের সুযোগ নিয়ে আমাকেই মেরে পাট করে দেবে। আপনারা এককালে মেরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পস্তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন, বিশ্বজোড়া অজেয় এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। আমি তা নিয়ে অসীম গর্বিত। কিন্তু আপনারা খেয়াল করেননি, ইংরেজ কীভাবে গোটা বাঙ্গলাকে শাস্তি দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে গেল। কখনো মনে হয়নি, কেন? কারণ, ব্রহ্মদেশ ও অবশিষ্ট ভারতের ঠিক মাঝখানে রয়েছে বাঙ্গলা। ব্রহ্মদেশকে আলাদা না করলে বাঙ্গলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলো, যে দিল্লিকে ইংরেজরা নিজেরাই 'সিটি অফ গ্রেভইয়ার্ড' বলতো। এই কারণে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দেওয়ালের দিকে গেল ভদ্রলোক। ধুলোময় একটা কাঁচের আলমারি ভর্তি অনেক বই সেখানে।

রমেশ চন্দ্র মজুমদারের— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস',— বলল ভদ্রলোক, 'সবকটা খণ্ডই আছে দেখছি আপনাদের কাছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, হিন্দির সাথে ভোজপুরি বা রাজস্থানী ভাষার যতটা মিল, বাংলার সাথে অসমিয়া, মৈথিলী বা ওড়িয়া ভাষার মিল তার থেকে অনেক কম। এটা মানবেন তো? তবু ভোজপুরি বা রাজস্থানী ভাষা হিন্দি ভাষার পরিসরে স্থান পেয়েছে। না জানি কার উন্নাসিকতার ফল, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। হলে বাংলা আজ এই উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত ভাষা হতো। সেটা হলে সবচেয়ে বড়ো যে সুবিধা হতো, সেটা হলো, স্বাধীনতার চেতনার যে উন্মেষ বাঙ্গলায় হয়েছিল, সেটা সহজেই সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। সেটা করা যায়নি। তার ফল ভুগছে আজকের ভারতের শিশুরা। তারা ভাবে, স্বাধীনতা লড়াই করে নয়, ভিক্ষা করে এসেছে। জন্ম থেকেই তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারা গান গায় 'দে দী হমে আজাদি বিনা খড়্গ বিনা ঢাল'। একটা বিরাট মিথ্যে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে আমাদের বুকের ওপর। সে পাথর ভাঙতে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণপাত করতে হচ্ছে আজও।'

ভদ্রলোক অনুভব করল, ঘরের মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। তাকিয়ে দেখল, যেন কোনো জাদুমন্ত্রে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে জনা পঁচিশেক লোক। পরনে তেলকালি মাখা জামাকাপড় হলেও, মুখ তাদের কোনো এক স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত। হাতে ছড়ি কয়েকবার মাটিতে ঢুকে নিয়ে বলল ভদ্রলোক—

'খেয়াল করেননি, আমাদের শত্রু দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তলে তলে হাত মিলিয়েছে? বাঙ্গলা থেকে আসাম, ওড়িশা আলাদা হয়ে গেল। যার ফল হলো, বাঙ্গলা হয়ে দাঁড়াল হিন্দু সংখ্যালঘু রাজ্য। এসবই ছিল দুই সাম্রজ্যবাদী শক্তির মিলিত ষড়যন্ত্র। ইংরেজ ঠিক করেছিল, বাংলাকে যখন সামলানো যাচ্ছে না, তখন তাদের জেহাদি শক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। একমাত্র সেইভাবেই বাঙ্গলার স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করা যাবে। এসব ঘটনাগুলো খেয়াল করে আপনারা যদি শুধু এমন কিছু করতেন, যাতে বাঙ্গলার হিন্দু গরিষ্ঠতা বজায় থাকে, তাহলেই কেউ আর পূর্ববঙ্গকে ভারত থেকে আলাদা করতে পারত না। আপনাদের সংগঠন সময়মতো চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হতো। কী, হতো না? তাই বর্তমান পরিস্থিতির দায় এড়িয়ে যেতে পারে না আপনার সংগঠন।'

মাথা নীচু করে রইল ক্ষিতি এবং অন্যরা।

'যা হয়ে গেছে',— চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল ভদ্রলোক, 'হয়ে গেছে। আফসোস করে পুরোনো সুযোগগুলো আর ফিরে আসবে না। কিন্তু যা হয়ে গেছে, সেটাকে চিরস্থায়ী ভেবে বসে থাকলেও চলবে না।'

'কী-বা করতে পারি আমরা?'— বলল ক্ষিতির পেছনে বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন, 'শুধু তো নিজেদের পিঠ বাঁচিয়েই দিন কেটে যায় আমাদের।'

পুজোর বেদীর ওপর রাখা গীতার দিকে দৃষ্টি নির্দেশ করে বলল ভদ্রলোক, 'যারা আত্মরক্ষা করতে চায়, গীতা তাদের জন্য নয়। গীতার বাণী স্বকর্ণে ভগবানের মুখে শোনার পরেও অর্জুন তার ছেলে অভিমন্যুকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু অভিমন্যুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল। যদি গীতায় বিশ্বাস রাখেন, তবে আত্মরক্ষা নয়, প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হোন। আমিও সেই উদ্দেশেই এখানে এসেছি। একটা প্ল্যান রয়েছে আমার।'

'আমরা আপনার সাথে আছি,'— বলল ক্ষিতি ওরফে ওসমান, 'আজও বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা উপজেলায় আমাদের সংগঠন রয়েছে। তারা ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশে আছে। আজ আর আমাদের কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। প্রতিটি উপজেলায় সংগঠন স্বাধীন। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলি। দরকার পড়লে প্রতিটি ইউনিটকেই সক্রিয় করতে পারি আমরা। যেমনটা করা হয়েছিল একাত্তরে।'

'আপাতত এই দেবীগঞ্জ উপজেলার সংগঠনের সহায়তা পেলেই আমার চলবে,'— বলল ভদ্রলোক।

'সেই সংগঠন তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে',— বলল ক্ষিতি, 'শুধু একটা কথা বলুন আমাকে, দুই বাঙ্গলা কি আর কোনোদিনও এক হবে না?

'কেন হবে না? দুই বাঙ্গলা এক হওয়া তো ভবিতব্য। আমরা

দু-পারের লোকেরাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি সেই দিনটার, যেদিন দুই বাঙ্গলা এক হবে। তবে সেটা কীভাবে হবে সেটাই আসল কথা।'— বলল ভদ্রলোক।

'সেটা কীরকম?'— বলল ক্ষিতি।

'পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি কীভাবে এক হলো? দুই জার্মানির মিলনের পথে বাধা ছিল তাদের ভিন্ন মতাদর্শ। পূর্ব জার্মানি কমিউনিজম ত্যাগ করল, তবেই মিলন হলো। এখানেও সেই একই বিষয়। ওরা ভাবছে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ওদের শরিক হব, আমরা ভাবছি ওরা ওদের নাড়ির ডাক শুনতে পেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। কে জিতবে জানি না। তবে ওরা যেটা চাইছে সেটা হলে অখণ্ড বাঙ্গলা নামেই বাঙ্গলা হবে। আদতে সেটা আর একটা আরবস্থান হবে। তাই জিততে আমাদের হবেই। বাঙ্গলার জন্য, বাঙালির ভবিষ্যতের জন্য।

গ্রাম

বিকেলবেলা, খালের ধারে গা-জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নদী বোধহয় এখান থেকে বেশিদূরে নয়। মিষ্টি একটা সুর ভেসে আসছে বাতাসে। পথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া। তারই ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে মাটির পথ। লাল-হলুদ রঙে আলো হয়ে আছে সে পথ। কত বছর পরে এপথে আবার হাঁটছি। এটা কি স্বপ্ন? ভাবছিল সাগর।

মিষ্টি সুরের উৎস দেখা গেল একটু পরেই। একটা লোক বাঁশি বাজাতে বাজাতে পথ ধরে হাঁটছে। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, চেক লুঙ্গি। বাঁশিতে আকুল করা সুর। গাছের ছায়া মাটির ওপর ইকিড়-মিকিড় কেটেছে। তার ওপর দিয়ে সর্‌সর্‌ শব্দ করে চলে যাচ্ছে মেঠো ইঁদুর। জঙ্গলে বোধহয় মহুয়া ফুল ফুটেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে মিষ্টি গন্ধে। দূর থেকে শোনা গেল ডুগডুগির আওয়াজ। গলায় পেঁচানো সাপ, খেত খানাখন্দ পেরিয়ে বেদেনির দল ডগডুগি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে।

উশিরে বন্ধ করি, কামরূপ কামাখ্যা বিষহরি,
মা কালীর দোয়া আর খোদার রহমতে, কালের দোষ চোখের দোষ উইড়া যা।
কামরূপ-কামাখ্যা লাগি মন্তরে জাগি, পাহাইড়া বুড়ির লাগি মন্তরে জাগি,
মা মনসার লাগি মন্তরে জাগি, কালের দোষ, চোখের দোষ উইড়া যা।
বিষ শত্তুর গায়ে যাবি, শনির বাধা বেরাইবি,
কালের দোষ নষ্ট ক্ষেতি উইড়া যা, শত্তুর গায়ে যা নষ্ট খেতি উইড়া যা, পুইড়া যা।
কামরূপ কামাক্ষ্যা লাগি মন্তরে জাগি, পাহাইড়া বুড়ির লাগি মন্তরে জাগি,
জটাধর ত্রিশূলপাণির লাগি মন্তরে জাগি, মা মনসার লাগি মন্তরে জাগি,
কামরূপ কামাক্ষ্যা বিষহরি...

খালের ধারে বসে মাছ ধরছে কয়েকজন। সবুজ জলে রুপোলি আভা। শান্ত জলে অনেক মাছ। ক্রমাগত ঘাই মারছে, বুড়বুড়ি কাটছে। তিরতির কাঁপছে জলতল। অঞ্জলির বাড়ি এখানেই কোথায় যেন ছিল। অঞ্জলি চুড়াইল। লক্ষ্মীপুজো করেছিল বলে এই গ্রামের কিছু লোক ওকে লাথি মেরে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। পেটে বাচ্চা ছিল ওর, পেটেই মারা যায়। মহারাজ প্রতাদিত্যের চুড়াইল মাঝিদের বংশধর ছিল অঞ্জলির শ্বশুরবাড়ি। সেই চুড়াইল মাঝি, যারা বাঙ্গলাকে রক্ষা করেছিল পর্তুগিজ ইনকুইজিশন থেকে। কোথায় গেল অঞ্জলির পরিবার? নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ায়। সেই অভাগা অজাতক শিশুটি সেকি কোনোদিন বিচার পাবে? ওরা তো ফকির। ওয়াজিব-উল-কতল, খুন হওয়াই ওদের উচিত শাস্তি।

দূরে গ্রামের সীমানা দেখা যাচ্ছে। এখানে বাঁশের তৈরি একটা ঘাট আছে। একদল গ্রামের যুবক বেরিয়েছে পথে। এদের আগেও দেখেছে সাগর। খেয়াল করেছে, এরা গ্রামের অন্য দশটা যুবকদের থেকে আলাদা। সবার পরনে একই রকম হলুদ পাঞ্জাবি। গান গাইতে গাইতে চলেছে খালের ধারে ধারে।

'কে ভাই তুমি?'— সামনের ছেলেটিকে প্রশ্ন করল সাগর।

'আমাদের নাম হিমালয়',— গর্বের সঙ্গে বলল ছেলেটি।

'তোমাদের?'— অবাক হলো সাগর, 'তোমাদের সবার নাম হিমালয়?'

'হ্যাঁ', — হেসে বলল ছেলেটি, 'আমরা সবাই হিমু, হিমালয়। ফজল মিঞার ছেলে আমি। আব্বু নাম রেখেছিল জুনেদ। আমি নিজের নাম রেখেছি হিমালয়। কেন, হুমায়ুন আহমেদের হিমু পড়েননি?'

'না, ভাই পড়িনি,'— বলল সাগর, 'তা তোমরা কি এইভাবে আলের ধারে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াও? আর কী করো?'

'হিমু হওয়া কঠিন কাজ। আমরা সেটাই অভ্যেস করি।'

'ইন্টারেস্টিং',— বলল সাগর, 'বলো দেখি, কী অভ্যাস কর তোমরা?'

'আমরা চাকরি-বাকরি করি না। পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে। চটি বা জুতো পরি না, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াই। পকেটবিহীন হলুদ পাঞ্জাবি পরি, যাতে সঙ্গে টাকাপয়সা না রাখতে পারি। বৃষ্টি বাদলায় ছাতা ব্যবহার করি না। রাজনীতি করি না, প্রেম নিষিদ্ধ। কিন্তু কবিতা লিখি, ছবি আঁকি।

কেউ আমাদের মারধর করলে আমরা তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করি।'

'বাব্বা!'— অবাক হয়ে বলল সাগর, 'খুব কঠিন কাজ হিমু হওয়া।'

'আপনি হিমু হবেন? অবশ্য বুড়োরা কি হিমু হতে পারে? চেক করতে হবে',— বলল ছেলেটি।

'না ভাই,'— বলল সাগর, 'তবে তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগল। চালিয়ে যাও।'

খালের ধার আর কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার এলাকা শেষ হয়ে ধানক্ষেতের এলাকা শুরু হয়েছে। রাস্তার একধারে সারবন্দি তালগাছ, নারকেল গাছ। কলাবন, বাঁশবন। অন্যধারে ধানজমি। বাতাসে এখনও জলের গন্ধ। সামনে একজন লোক গুড়ের নাগড়ি কাঁধে দুলকি চালে চলছে। ধানজমির সীমানায় কুড়েঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মাইকের আওয়াজ। গ্রামে মজলিস বসেছে। কোনো এক হুজুর ভাষণ দিচ্ছে।

'আপনারা ভাবতিছেন, এই দ্যাশটা হইল মুসলমানের দ্যাশ। ভুল কথা। এই দ্যাশের সত্তুর শতাংশ মানুষই তো আসলে হিন্দু। কারণ, তারা হারাম প্র্যাকটিস করতিসে। হিন্দুদের মতো বাংলায় নিজেদের নাম রাখতিসে। হিন্দুদের মতো রবীন্দ্র সংগীত গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। ধেই ধেই কইরা নাচে। পয়লা বৈশাখে প্যাঁচার মুখোশ পইরা মিছিল করে। লালন ফকিররে লইয়া মাতামাতি করে। মাইয়ারা কপালে টিপ পরে। এইসব হইল গিয়া হারাম। হেইটা দ্যাখছেন কি? কটা মাইয়া বোরখা পরে? কটা আদমি দাড়ি রাখে?'

মন্দির

সূর্য ঢলে পড়ছে কাশফুল দিয়ে আঁকা দিগন্তের ওপরে, গেরুয়া আবির ছড়িয়ে। শুভ্র বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই বাইরে বেরিয়ে অঞ্জুমান আজিজি সাগর।

'মন্দিরটা দেখতে এসেছেন তো?'— বলল সাগর।

'জী, হ্যাঁ', — হেসে বলল শুভ্র।

'চলুন তাহলে।'

আগাছার জঙ্গল। জায়গায় জায়গায় ভাঙা পাথরের মূর্তি পড়ে আছে। পরিষ্কার হাঁটার পথ পাওয়া দুষ্কর। এটা শরৎকাল, সাপের উৎপাত না থাকারই কথা। তবু সাবধানের মার নেই। হাতের ছড়ি দিয়ে পথের প্রতিটি ঝোপঝাড় নাড়িয়ে তার মধ্যে দিয়ে এগোলো দুজনে।

সাগর ও শুভ্র হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পিছনদিকে পৌঁছাল। সূর্য লুকিয়ে পড়ল বাড়ির আড়ালে। ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল। তার সাথেই বাড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিল লাল ইট দিয়ে গড়া এক মন্দিরচূড়া। সবুজ শেওলাঢাকা দীঘি। পুকুরের সবুজ জলে ছায়া পড়েছে গাছপালার, মন্দিরের। কবোষ্ণ বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে সেই ছায়া। মনে হচ্ছে বাস্তব নয়, স্বপ্নের ছায়া। তারই মাঝে ভেসে আছে অনেক ফোটা-আধফোটা পদ্ম আর শাপলা। সুগন্ধে মন বাউল হয়ে যায়। প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে একদল হাঁস দল বেঁধে গোল গোল করে ঘুরছে। মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে গেঁড়ি-গুগলি খাচ্ছে। একদল মাতোয়ারা গঙ্গাফড়িং উড়ছে জলের ওপরে, পদ্মবনের চারপাশে। ঝিমধরা গুনগুন আওয়াজ বাতাসে। একটা বাঁধানো ঘাট আছে সেখানে। পাড়ে বিরাট এক বটগাছ। বুড়ো মানুষের দাড়ির মতো ঝুরি নেমেছে ওপর থেকে। ঘন চাঁদোয়া আকাশটাকে আড়াল করেছে। অনেক পাখি কিচিরমিচির করছে গাছের মাথায় চড়ে। গাছের শিকড় নেমে এসেছে জল পর্যন্ত, ছায়া ছায়া অন্ধকার তৈরি করেছে জলের ধারে ধারে। অনেক পতঙ্গের বাস ওই ছায়াঘন অন্ধকারে। বাঁধানো পাড় ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। আগাছার জঙ্গল বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ধরেছে পুকুরের পাড়। থোকা থোকা জবাফুল ফুটে আছে জঙ্গল জুড়ে। সরু একটা সুঁতিখাল পুকুরে এসে পড়েছে।

'এই সুঁতিখাল গিয়ে পড়েছে বড়ো খালে',— বলল সাগর, 'সেই খাল যোগ দিয়েছে নদীতে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এককালে এরকম নেটওয়ার্ক ছিল। ভেবে দেখুন, যারা সুবিশাল এই দেশজুড়ে এরকম নদীনালার জাল বানিয়েছিল, তারা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। গর্ব হয় কি না? তারপর ইংরেজরা এল। নিজেদের স্বার্থে দেশজুড়ে খাল বুজিয়ে রেললাইন পাতল। আমাদের নিজস্ব ওয়াটার নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেল, বদ্ধ জলা মশার অবাধ প্রজননক্ষেত্র হলো। ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল।'

'আপনি এতসব জানলেন কী করে?'— বলল শুভ্র।

'আমি বুড়ো মানুষ',— হেসে বলল সাগর, 'এইসব পড়াশুনা নিয়েই তো আছি। তোমার মতো শ্রোতা পেলে বকবক করে আনন্দ পাই। আচ্ছা, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ কি?'

'কী সেটা?'— বলল শুভ্র।

'পদ্ম আর শাপলা। দুটো দেখতে প্রায় একরকম। একটা ভারতের জাতীয় ফুল আর একটা বাংলাদেশের। অদ্ভুত মিল! তাই না?'

পুকুরের ধারে লাল পোড়ামাটির ইটের মন্দির। জল থেকে ধাপে ধাপে ভাঙাচোরা সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দিরের মধ্যে। তার দু'ধারে কাশফুলের বন। প্রাচীন মন্দির। তিন-চারশো বছরের পুরনো তো হবেই। বেশিও হতে পারে। দাঁত বের করে ভাঙা

ইটের দেওয়াল। বট-অশ্বত্থর ঝুরি নেমেছে। মন্দিরের ভেতরে মস্ত বড়ো এক চাতাল। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো, যেন অন্তহীন। শুভ্র স্পষ্ট শুনল, কানের পাশে বিদেশি অস্তিত্বের ফিসফিস স্বর। শিরশির করে উঠল শরীর।

'কি ভয় করছে?'— বলল সাগর।

'না, না। ভয় কীসের?'— সাহস করে বলল শুভ্র।

'চলুন, ভেতরে উঁকি মেরে দেখা যাক,'— বলল সাগর।

কোমরবন্ধ থেকে টর্চ বের করে জ্বালালো শুভ্র। চাতালের শেষপ্রান্তে উঁচু বেদী। সিঁদুর মাখা, রিক্ত। শুভ্রর মনে হলো, দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সমবেত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মন্দিরের দেওয়ালে।

'মনে হয় এই সেদিনের কথা,'— চোখ বুজে স্বগতোক্তির সুরে বলল সাগর, 'এইখানে আজকের এই শূন্য দেবালয় আলো করে থাকতেন দেবী মাতঙ্গীর বিগ্রহ। মা দুর্গার দশ মহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা, দশ হাতের এক হাত হলেন দেবী মাতঙ্গী। তিনি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী। ললাট ফলকে অর্ধচন্দ্র। গলায় কলহার ফুলের মালা, সদা হাস্যময়ী। পরনে রজস্বলা রক্তবস্ত্র, শৈবাল তার আভরণ। ইনি তন্ত্র সরস্বতী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। সর্ববিদ্যার আকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় চণ্ডালিনীর বেশে সমাজের গরিব অন্তজ মানুষদের সাথে মিশে থাকেন।'

'আপনি হিন্দু দেবদেবীর বিষয়ে এতসব জানেন কী করে?'— অবাক হয়ে প্রশ্ন করে শুভ্র।

'এই বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। লেখাপড়া, চর্চা করি।'— বলল সাগর।

'এসব নিয়ে চর্চা করেন?'— বলল শুভ্র, 'পাপের ভয় করে না? শির্ক? বুতপরস্তির গুনাহ্?'

'বন্ধু',— ম্লান হেসে বলল বৃদ্ধ, 'লোকে বলে, উপরওয়ালা এক, তার কোনো শরিক নেই। সেটা মানলাম। কিন্তু সেই এক উপরওয়ালার একটাই নাম আছে, সেটা কে বলেছে?'

'সেটা ঠিক',— বলল শুভ্র, 'কিন্তু...'

'শুনেছি, উপরওয়ালার একশোটা নামের উল্লেখ আছে।'— বলল সাগর, 'সেই নামগুলো তো আরবিতে। এখন আরবিই একমাত্র উপরওয়ালার প্রিয় ভাষা। এটা তো হতে পারে না। সব ভাষাই তাঁর প্রিয়। এই যুক্তিটা মানবেন তো?'

'মানছি',— বলল শুভ্র, 'তবে...'

'ইসলাম যখন আরব ভূখণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে পারস্যে এসেছিল, তখন উপরওয়ালার নামের সেই তালিকায় আরও নাম যোগ হয়েছিল। যেমন, খুদা। এই খুদা বা খোদা শব্দটা বোধহয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম। অথচ জানেন কি, এই শব্দটার সাথে ইসলামের কোনো যোগ নেই? পারস্যের জোরথস্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীরা তাদের উপাস্যকে খোদা বলে ডাকে।'— বলল সাগর।

স্তম্ভিত শুভ্র কোনো উত্তর দিতে পারল না।

'বলুন তো ইরফান সাহেব',— বলল সাগর, 'উপরওয়ালার কি সত্যিই কোনো নাম আছে? না কি দেশে দেশে আমরা মানুষরা নানান নাম দিই, আমাদের খেয়ালখুশি মতো? কালী, দুর্গা, মাতঙ্গী— আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো এই নামগুলো সেই পরম শক্তিকে দিয়েছিলেন। সেই নামগুলো মিথ্যে— একথা বলার ঔদ্ধত্য আমাদের হয় কী করে? পারসিদের কাছে ধার করা খুদা শব্দটা ব্যবহার করতে আপত্তি নেই। শুধু আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া নামগুলো ব্যবহার করলেই অপরাধ? আমার মনে হয়, এগুলো অজ্ঞানতা বই আর কিছু নয়। যদি ভুল কিছু বলে থাকি, নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।'

'আর মূর্তিপূজা? সেটা সম্বন্ধে কী বলবেন?'— বলল শুভ্র।

'রথ বলে আমি দেব,'— বলল সাগর, 'হাসে অন্তর্যামী। এ তো হিন্দু কবিই বলে গেছেন। খ্রিস্টানরা ক্রুশের সামনে মোমবাতি জ্বালায়, সেটা কি ক্রুশপুজো? প্রতীকের আড়ালে যে অন্তর্যামী, যে পরাশক্তি লুকিয়ে আছেন, তারই পুজো করে সবাই। হিন্দুরাও।'

'কিন্তু মানুষের রূপে? সেটা কি ঠিক?'— বলল শুভ্র।

'ঠিক নয় কেন? এই দুই হাত-পা, এক মাথা এর মধ্যে খারাপ কী আছে? অবশ্য আপনি যদি পিঁপড়ে হতেন, তাহলে হয়তো উপরওয়ালা আপনার সাথে কথা বলতে পিঁপড়ের রূপ নিতেন। আমরা মানুষরা ভিডিয়ো গেমসে ইচ্ছে মতো অবতার নিতে পারি, আর তিনি সর্বশক্তিমান হয়ে এটা করতে পারবে না?'— বলল সাগর।

'বিদেশে থেকে আপনার চিন্তাধারা অনেকটাই উদার হয়ে গেছে দেখছি',— বলল শুভ্র, 'এসব কথা কিন্তু গ্রামের লোকেদের বলবেন না। মারধর খেয়ে যাবেন। খুনও হয়ে যেতে পারেন।'

'ওদের দোষ দিই না।'— হেসে বললেন সাগর, 'একটা সময় ছিল, যখন বিদেশি আক্রমণকারীরা বাঙ্গলায় এসে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারত না। কিন্তু তারপর এলো তিতুমির আর তার বাঁশ! কী জানেন, তিনকুল গিয়ে এককুলে ঠেকেছে আমার। এখন যদি এই জন্মভূমির ওপর আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে, উপরওয়ালাকে দোষ দেব না।'

'মাতঙ্গী... মাতঙ্গী... মাতঙ্গী...', — অন্যমনস্ক হয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে বলল শুভ্র, 'গ্রামের নাম মাতঙ্গী। এই মন্দিরের দেবীর নামও মাতঙ্গী। এই নামটা আমি আজকাল বারবার শুনছি। মাতঙ্গেশ্বরী'... কী যেন একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল শুভ্র।

'কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মনে হচ্ছে',— বলল সাগর।

'এই দাগগুলো দেখেছেন কি?'— মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে বলল শুভ্র।

‘পায়ের ছাপ মনে হচ্ছে,’— বলল সাগর।

সত্যিই পায়ের ছাপ। দেখে মনে হচ্ছে কেউ আলতা পরা পায়ে মন্দির থেকে বেরিয়েছে। আবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছে। কচুবনের মধ্যে যেরকম ছাপ ছিল, ঠিক সেইরকম। একই মাপ। বড্ড নিখুঁত ছাপ। চামড়ার ভাঁজের ছাপ নেই। কোনো খুঁত নেই। অবিশ্বাস্য! কোনো মানুষের পায়ের ছাপ এতো নিখুঁত হতে পারে কি?

‘হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল’,— বলল সাগর, ‘মন্দিরের বা বাড়ির বাইরে থেকে ভেতর পর্যন্ত দেবীর পায়ের ছাপ এঁকে রাখত। মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে।’

‘হুঁ, বুঝলাম’,— বলল শুভ্র, ‘আচ্ছা, একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছেন কি? শুটকি মাছের গন্ধ?’

‘কই, না তো!’— অবাক হলো সাগর।

‘হুঁ’,— ভুরু কুচকে বলল শুভ্র।

বাইরে তখন রাত নেমেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

আবার

ভয়ে ডুবে আছে গ্রামটা। সন্ধ্যে হলেই সকলে দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে। শত প্রয়োজনেও রাতবিরেতে কেউ বেরোচ্ছে না বাইরে। কিন্তু ইমতিয়াজ মোল্লার ব্যবসাটাই এমন যে, রাতে না বেরিয়ে উপায় নেই। তিনদিন বাড়িতে বসে থাকার ফল, কয়েক লক্ষ টাকার মাল ইন্ডিয়া বর্ডার ক্রস করার সময় ধরা পড়ে গেল। বাধ্য হয়েই রাতে বেরোতে হলো। তবে একা নয়, সাথে চারজন দেহরক্ষী নিয়ে। এস ইউ ভি গাড়িতে।

গ্রামে ফিরতে মাঝরাত পার হয়ে গেল।

হাইওয়ে থেকে একটা পাকা রাস্তা বেরিয়ে গ্রামের দিকে গেছে। কিছুদূর চলার পর সেই রাস্তা কাঁচা রাস্তা হয়ে গেছে। সেই কাঁচা রাস্তাটার দুধারে ধানক্ষেত ছাড়াও জায়গায় জায়গায় আছে বাঁশবন, কলাবন, বট-অশ্বত্থের বন। এরকমই একটা জায়গায় গিয়ে বোমার মতো শব্দ করে গাড়ির টায়ারটা ফেটে গেল। কেত্‌রে পথে একধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়িটা।

‘শ্লা...’— গালাগাল দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ইমতিয়াজ, ‘বাইর হওনের আগে টায়ারগুলো চেক করতে পারস না?’

ইমতিয়াজকে নামতে দেখে ওর দেহরক্ষীরাও তড়াক করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নেমে পড়ল ড্রাইভারও। ইমতিয়াজের পায়ে লেগে কিছু একটা গড়িয়ে গেল রাস্তায়, ঝনঝন আওয়াজ করে।

‘টর্চটা জ্বালা’,— হুংকার দিল ইমতিয়াজ।

একজন দেহরক্ষী কোমরবন্ধ থেকে টর্চটা বের করে রাস্তার ওপর আলোটা ঝুলিয়ে দিল। তীব্র আলোয় ঝকমকিয়ে উঠল রাস্তার উপর পড়ে থাকা অজস্র ভাঙা কাঁচের বোতল। পর মুহূর্তেই টর্চটা ঠাস করে পড়ে গেল মাটিতে। ইমতিয়াজ দেখল, দেহরক্ষী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

তীব্র একটা বাসি পচা গন্ধে বমি এল ইমতিয়াজের।

টর্চটা তখনও জ্বলছে, গড়িয়ে গড়িয়ে এপাশ-ওপাশ ফিরছে। সেই আলোয় ইমতিয়াজ দেখল, অন্ধকারের গহ্বর থেকে আবির্ভূত হয়েছে এক ছায়ামূর্তি। তার কালচে গায়ের রঙে শেওলা-সবুজ আভা। গা-ভর্তি গহনা। একঢাল কোঁকড়া কালো চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে নেমেছে। ভয়ে শরীর অসাড় হয়ে এলো ইমতিয়াজের। উদ্যত চাপাতি হাতে একজন দেহরক্ষী আক্রমণ করল ছায়ামূর্তিকে। ছায়ামূর্তির হাতের তালুর এক আঘাতে সেই দেহরক্ষীর কণ্ঠার হাড় ভেঙে গেল এক লহমায়। পরমুহূর্তেই সেই ছায়া তৃতীয় দেহরক্ষীর চুলের মুঠি ধরে অবলীলাক্রমে তার মাথা ঠুকে দিল গাড়ির বনেটে। ধাতব একটা শব্দের সাথে সেই দেহরক্ষীর করোটি ভেঙে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো।

চতুর্থ দেহরক্ষী কোমর থেকে বন্দুক বের করে ঘোড়া টিপে দিল। সাঁই শব্দ করে বুলেটটি মিলিয়ে গেল বাতাসে। দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সময় পেল না সে। ছায়ামূর্তির পায়ের একটা অভিঘাত নেমে এলো তার রগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অন্তিম দেহরক্ষী। ঝাপসা চোখে দেখল সে, ঐন্দ্রজালিক সেই ছায়ামূর্তি, ইমতিয়াজের চুলের মুঠি ধরে তাকে ধানক্ষেতের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আলো

আগে বারিধারার এদিকটায় ঢাকাই বাখরখানি পাওয়া যেত না। এখন বেশ কয়েকটা দোকান হয়েছে, যেখানে টাটকা বাখরখানি পাওয়া যায়। একটা দোকান তো এই অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই। ফোন করলেই এসে দিয়ে যাবে। লোভ হচ্ছিল সমীরণের। সংবরণ করল। ওর একটা নিয়ম আছে। যখন কোনো বিশেষ কাজ ও হাতে নেয়, তখন লকডাউনে চলে যায়। কোথাও যায় না, কাউকে ফ্ল্যাটে আসতেও দেয় না। অথচ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় ভালোমন্দ কিছু না খেলে মাথাও খোলে

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

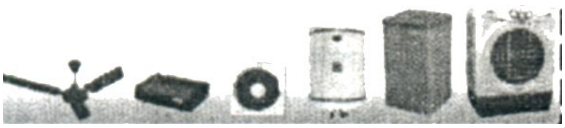

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

না।

এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে বেশ কয়েকটি সরোবর আছে। এই জানালাটি দিয়ে তারই একটা দেখা যায়। অলস দুপুরে সূর্যের আলোছায়া ঝিলিমিলি খেলা করছে সরোবরের জলে। পাখি ডাকছে ডুকুর ডুকুর টুঁই টঁই। চোখে নেশা ধরিয়ে নীল আকাশে লাল ঘুড়ি উড়ছে।

জানালাটা বন্ধ করে দিল সমীরণ।

এই ফ্ল্যাটে একটা কাজের টেবিল আছে সমীরণের। জানালাবিহীন একটা ঘরে। জানালাবিহীন, যাতে উল্টোদিকের বাড়ি থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে দেখা না যায়, ও কী কাজ করছে। বাখরখানির বদলে বিস্কুট। আপাতত তাই সই। নানখাটাই বিস্কুটের কৌটটা নিজের টেবিলে রাখল সমীরণ। তারপর কিচেন থেকে একটা কফি বানিয়ে টেবিলে বসল। অনেক তথ্য হাতে এসে গেছে। এখন সেগুলো জুড়ে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে হবে।

ল্যাপটপে ফাইলগুলোর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সমীরণ। এম-সেভেন সে সময় দুবাইতে ছিল, সেই সময় রাস-এল-খেমায় একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। লোকটার নাম ইলিয়াস মোল্লা। পাকিস্তানের নাগরিক। দুবাইয়ের পাকিস্তানিদের আয়োজিত কোনো একটা সম্মেলনে যোগ দিতে দুবাই গিয়েছিল। মাঝে কয়েকদিন ফুর্তি করতে গিয়েছিল রাস-এল-খেমা। ওখানে একটা গল্ফ কোর্স আছে, সেখানে সারাদিন বল পিটিয়ে তারপর সমুদ্রের ধারে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল। সেখানেই লোকটার মৃতদেহ পাওয়া যায়। শরীর ফ্যাকাসে, কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই দেহে। মৃত্যুর কারণ হিমোলিসিস, অর্থাৎ শরীরে লোহিত রক্তকণিকার চরম অভাব। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে। যদিও লোকটার স্ত্রী বলেছে, লোকটার রক্তাল্পতার সমস্যা ছিল না।

লোকটা পাকিস্তানি, অথচ লোকটা কোন কোন ভাষা জানে, সেই তালিকায় ইংরেজি, উর্দু, আরবি ছাড়াও বাংলা আছে। পাকিস্তানি, অথচ বাংলা জানে! খটকা লাগছে। লোকটা কি তবে বাংলাদেশি? খোঁজ নেওয়া যাক।

সমীরণের একটা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কম্পিউটার প্রোগ্রাম আছে। যেটা পৃথিবীর যত কানেক্টেড সার্ভার আছে, সেখান থেকে বিশেষ কিছু কীওয়ার্ডের সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য খুঁজে বার করতে পারে। ব্যক্তিগত স্টোরেজ, ফায়ারওয়াল বা এনক্রিপশন দ্বারা সুরক্ষিত সার্ভার। এমনকী ডার্ক-নেট সব জায়গা থেকে। প্রোগ্রামটাকে বলে দিল সমীরণ, পাকিস্তানি নাগরিক ইলিয়াস মোল্লার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুঁজে বার করতে। তারপর মন দিল দ্বিতীয় মৃত্যুটার দিকে।

বশির আলি। নিবাস, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ। এলাকার বড়ো রাজনৈতিক নেতা। একডজন পঞ্চায়েতের বশির আলিই ছিল ভাগ্যনিয়ন্তা। আগামী লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পেতে পারত। লোকটার শক্তির উৎস বহু রকমের চোরাচালানের ব্যবসা। কাফ সিরাফ থেকে নুন, গরু থেকে নারী অপহরণ ও পাচার, সবকিছুতেই লোকটার হাত আছে। থাকত একটা দুর্গের মতো বাড়িতে। সবসময় একডজন সশস্ত্র লোক পাহারা দেয় বাড়িটাকে। বাড়ির বাইরে বেরোলেও অন্তত চারজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে বেরোতো। সেদিনও তার সঙ্গে ছিল। বাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, একটা পাগলির সঙ্গে ধাক্কা লাগে লোকটার। উফ্ বলে কাতরোক্তি করেছিল। তারপর দশ-পা হাঁটতে না হাঁটতেই লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাস্তায় মারা যায় বশির আলি। সেই একই
লক্ষ্মণ— রক্তাল্পতা।

'বিপ' করে শব্দ হলো। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইলিয়াস মোল্লার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে। লোকটার পাসপোর্ট বলছে সে পাকিস্তানের করাচি শহরে জন্মেছে। অথচ লোকটা নিজে এক জায়গায় বলেছিল, ওর জন্ম বাংলাদেশে। জেলা জামালপুর, উপজেলা দেবীগঞ্জ, গ্রাম মাতঙ্গী। সেই ভিডিয়ো ক্লিপটা খুঁজে পেয়েছে ওর সফট্ওয়্যার।

মালদার বশির আলি। পাকিস্তানের ইলিয়াস মোল্লার মতোই তারও উৎস কি এই জেলা জামালপুর, উপজেলা দেবীগঞ্জ, গ্রাম মাতঙ্গী? ভাটিয়ার বিল থেকে এই গ্রামটার দূরত্ব কত? একটা সন্দেহ কিছুক্ষণ ধরেই দানা বাঁধছিল মনে। ভাবল, বাজিয়ে নিলে ক্ষতি কী? মোবাইলটা হাতে তুলে নির সমীরণ।

'দোস্ত! কেমন আছিস?'— বলল সমীরণ।

'আরে, ভুলে মেরে দিসনি তো? শুক্রবার কিন্তু নতুন রেস্টুরেন্টটায় যাচ্ছি আমরা। শুনেছি, ওখানে একটা ইলিশ ভাপা বানায়, ফাটাফাটি!'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। ওদের ভর্তাগুলো নাকি ইউনিক। বিশেষ করে শুটকি মাছের ভর্তা। আ ডেলিকেসি!'

'শোন, একটা খবর জোগাড় করতে হবে তোকে। বশির আলি আর ইলিয়াস মোল্লা, এদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক চাই। জেলা জামালপুর, উপজেলা দেবীগঞ্জ, গ্রাম মাতঙ্গী।'

'থ্যাঙ্ক ইউ দোস্ত। এই শুক্রবারের ট্রিট কিন্তু অন মি।'

'আরেকটা ব্যাপার খোঁজ নিবি তো! ওই গ্রামে সম্প্রতি কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে কিনা?'

'আরে না, না। সেরকম কিছু না। একটা স্মাগলিং গ্যাং... তাদের নিয়েই কিছু খোঁজখবর চলছে।'

ফোন রেখে দিয়ে লম্বা শ্বাস নিল সমীরণ। জট খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, লম্বা একটা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা টুকরো আলো দেখা যাচ্ছে। সব পথ গিয়ে মিলেছে ওই গ্রামে। কী আছে ওখানে?

এনক্রিপটেড ফোনটা বাজছে। তুলে দেখল, স্ক্রিনে লেখা ধ-র-র-।

ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

পলায়ন

ইমতিয়াজ মোল্লার বাড়ির সামনে আজ অনেক লোকের জটলা। ঠিক যেমন ক'দিন আগে কুদ্দুসের বাড়ির সামনে ছিল, কাশেমের বাড়ির সামনে ছিল। তফাত একটাই, জটলার মধ্যমণি হিসাবে কোনো মৃতদেহ নেই এখানে।

ইমতিয়াজের দেহ পাওয়া যায়নি। তাই, সে মারা গেছে না কী বেঁচে আছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। ইমতিয়াজের চারজন দেহরক্ষীর মধ্যে একজন মারা গেছে। দুজন হাসপাতালে, তাদের অবস্থা সঙ্গীন। একজনই শুধু এখানে আছে, সাক্ষী দেওয়ার জন্য। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাত-পা নেড়ে গতরাতের রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

'গাও ভর্তি গহনা। সেই একই গহনা, যা আমি মন্দিরে দেখেছি। সে কী কমু সার, হেই দেবী হইল তালগাছের মতো লম্বা, তার চুল যেন কালবৈশাখির ঝড়। সবুজ শেওলায় গড়া শরীর। এক থাপ্পড়ে তিনটে জোয়ান মরদরে মাটিতে ফালাইয়া দিল। আমি গুড়ুম কইরা গুলি চালাইলাম, সে গুলি দেবীর শরীর ভেদ কইরা ধানক্ষেতে চইলা গেল, দেবীর কিছুই হইল না।'

'দেবীর গহনা!'— বলল সফিকুল, 'বুঝলা কীনা, ঠিক চিনছ?'

'চিনুম না?'— হাউমাউ করে উঠল রক্ষী, 'ছোটবেলায় কত দেখছি। গলায়, হাতে, হেই চুলের ঠিক মইধ্যে দিয়া.. তারপর দেবীর গলায় একটা হার আছিল। দেইখ্যা মনে হইত, য্যান একখান টিয়াপাখি ডানা ছাপটাইতাছে। সোনার উপর ফিকা সবুজ পাথর বসাইনো। মাঝখানে ঘন সবুজ পাথর, য্যান পাখির দেহ। তার উপরে একখান জ্বলজ্বলে লাল পাথর, ঠিক য্যান পাখির চক্ষু। সেই হারটাও তো দ্যাখলাম।'

'যখন বলছিলাম,'— বলল জহিরুল মিঞা, 'দেবী জাইগা উঠছেন, তরা কেউ বিশ্বাস করস নাই আমার কথা। এহন হইল তো? দেবীর অভিশাপ নাইমা আইছে গ্রামের উপর। এত পাপ, এত পাপ, সবকিছুর বিচার হইব এহন। গ্রামের মুদি আছিল হারাধন। তরা অনেকেই তো তার কাছ থিকা জোর কইরা ধার-বাকিতে জিনিস খরিদ করছস। পয়সা চাইলে ভয় দেখাইতিস, গ্রামছাড়া করবি। তা শেষমেশ হেইটা করলিও। হারাধন নাকি আমাগো ধম্মের অসম্মান করছে। এই মিথ্যা অপবাদ দিয়া তারে গ্রাম থিকা তাড়াইলি। সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছিল শিমুর দাসের। ওই কুদ্দুর তারেও ভয় দেখাইয়া দ্যাশছাড়া করল। শিমুলের দোকান, বাসাবাড়ি জমিজমা সব মাইত্র এক হাজার টাকায় কিনা নিল ইমান আলি মোল্লা, ওরই প্রতিবেশী। ছিঃ ছি, এইটাই কী প্রতিবেশীর ব্যবহার? এই পাহাড় পরমান গুনাহ কোথাও তো গিয়া জমা হইছে। সেইসবের প্রতিকার কী হইব না? কী মনে করিস তরা?'

মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল শুভ্র। হাতে একটা কালো হাঁড়ি।

'গা ভর্তি গয়না?'— দেহরক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলল শুভ্র, 'সেই একই গয়না? ঠিক দেখেছ? দেবীর গয়না তো খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই না?'

'দেবী তো সব গয়না সাথে কইরা লইয়া গেছিলেন', — ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল এক গ্রামবাসী, 'এখন গয়না পইরাই ফিরে আসছেন। হেইটাই প্রমাণ করে দেবী কোনো গল্প নয়, কোনো মনিষ্যি নয়, দেবী সত্যই।'

'একটা ফুটকি, পাঁচটা ঢ্যাঁড়া', — মাথা চুলকে বলল শুভ্র, 'এর মানে কি পাঁচটা লোক খুন হয়েছে! আর মাত্র একটা লোক বাকি?'

গ্রামবাসী সবাই এর ওর মুখের দিকে তাকাল। সবাই চুপ।

'আপনারা কিছু একটা চেপে যাচ্ছে,'— বলল শুভ্র, 'সব কিছু খুলে না বললে এ রহস্যের সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনের দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়',— ঝাঁঝিয়ে বলল এক গ্রামবাসী, 'আপনার নাকের ডগা দিয়ে তিনখান খুন হয়ে গেল। আপনি এইখানে বইয়া বইয়া শুধু ভ্যারেন্ডা ভাজলেন। রাতের বেলা পথেঘাটে ভূতপ্রেত জিন ঘুইরা বেড়ায়, সবাই তাগো দেখতে পায়, শুধু আপনেই তাগো দেখতে পান না। আপনারে দিয়া কোনো কাম হইব না।'

'আপনি কে?'— শুভ্র তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো লোকটার দিকে। পুলিশের ওপর হম্বিতম্বি করে, কার এত বড়ো সাহস?

'আমার নাম মনিরুল আলম',— বলল লোকটা, 'আর কিছু চানতে চান? দেবী, দেবী, দেবী। শুইনা শুইনা কান অতিষ্ঠ হইয়া গেল। আমার নানার না ঘোড়া চইড়া বোগদাদ থিকা আইসিল। আমরা হইলাম আরব। হালার পো হালা এই মালাউনগুলারে তরোয়াল দিয়া কাটসি আমরা। আমি হেই দেবীরে ডরাই না।'

'অ্যাইডার পেট গরম হইসে',— শ্লেষের স্বরে বলে উঠল বুড়ো জহিরুল, 'এই ঘুড়ার ছাওয়ালডারে একটু পানি দে।'

'শুনেন পুলিশ সাহেব,'— রেগে বলে উঠল মনিরুল, 'দেবী যদি সত্যিই থাইকা থাকে, তার ক্ষমতা নিশ্চয়ই এই গ্রামের মইধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি চলি। ঢাকায় আমার ফ্ল্যাট আছে। এইসব ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত সেইখানেই আমি থাকুম।'

‘কখন যাবেন?’— প্রশ্ন শুভ্রর।

‘আইজ, অ্যাহনি যামু’, — বলল মনিরুল, ‘আমি জানি, আজ রাইতে আমার পালা। রাইতের বেলার আগে ঢাকায় পৌঁছাইতে হইব।’

‘তার মানে?’— অবাক হলো শুভ্র, ‘আজ রাতে আপনার পালা, জানলেন কী করে?’

কোনো উত্তর দিল না মনিরুল।

জহিরুল বুড়ো মুচকি হেসে গুনগুন গান ধরল, ‘এহন ফাইন্দে পইড়্যা বহা কান্দে রে... মাইনকা চিপা কারে কয়, বোঝস নাকি ঘুড়ার পো ঘুড়া।’

‘তখন থেকে বলছি, আপনারা অনেক কিছু চেপে যাচ্ছেন’, — রেগে উঠল শুভ্র, ‘তার ওপর আবার আমাকেই দোষ দিচ্ছেন। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।’

গলা খাকারি দিয়ে বলল সফিকুল, ‘পাঁচটা ঢ্যাড়া, একটা ফুটকি। বোঝলেন কিনা, তার মানে বশির আর ইলিয়াস নিশ্চয় আর বাঁইচা নাই।’

‘বশির, ইলিয়াস’? —অবাক হলো শুভ্র, ‘এরা কারা?’

‘মজুমদার বাড়ি যারা লুঠ করছিল,’— বলল জহিরুল, ‘সেই দলের পালের গোদা আছিল ছয়জন। বশির, ইলিয়াস, কাশেম, ইমতিয়াজ, কুদ্দুস আর মনিরুল। এর মধ্যে বশির আর ইলিয়াস দ্যাশছাড়া। বাকিদের মইধ্যে এই মনিরুলই বাঁইচ্যা। কালো হাঁড়িতে দেবীর ইঙ্গিত খুবই পষ্ট। পাপ ছাড়ে না বাপ। ভালো লোক আছিল মজুমদাররা। গ্রামের আপনজন আছিল, লোকের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াইত। দুর্ভিক্ষের সময় মাসের পর মাস ধইরা গ্রামের লোকেরে খিচুড়ি খাওয়াছে ওরা। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিত, মাইয়ার বিয়ার লইগা টাকা দিত। কত্ত বড়ো কইর‍্যা দুগ্গাপূজা হইত ওদের বাড়িতে। এই শরদকালেই তো। শিউলি গাছে ফুল ফুটত, পাঁচদিন ধইর‍্যা ঢাক বাজত, ভোগ হইত গ্রামশুদ্ধ লোকের লাইগ্যা। আজও তো কাশ ফুল ফোটে, শিউলি গাছ রঙা হইয়া যায়, কিন্তু সেই ঢাক আর বাজে না। সব কেমন ফিকা ফিকা লাগে। বড়ো ভালো মানুষ আছিল ওরা। কী কইর‍্যা যে কী হইয়া গেল। সব শেষ হইয়া গেল। ছোট্ট মাইয়াটা, সাত-আট বছর বয়স, চাচা-চাচা বইলা ডাকতো, বড়ো ভালো, লক্ষ্মীমন্ত মাইয়া। তার তো কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না।’

‘ভালো মানুষ?’— রেগে উঠল মনিরুল, ‘হুঁ, ভালো মানুষ, হালার পো, আমাগো রক্ত খাইয়া বড়লোক হইছিল। আমরা থাকতাম কুড়েঘরে, আর ওরা থাকত পাঁচমহলা বাসায়। আমরা...’

‘তার লইগ্যাই বুঝি বুড়া কত্তার গলার নলি কাইট্যা দিছিলি? ওদের বাসার বউগুলারে ল্যাংটা কইরা এই গ্রামের রাস্তায় মিছিল করছিলি? বাসার ছ্যামড়াগুলার মুণ্ডু কাইট্যা গ্রামের চৌমাথায় পাহাড় বানাইয়াছিলি? আইজ তো তুই বড়লোক হইছস। ঢাকার গুলশানে ফ্ল্যাট হাকাইছস। আমরা আইজও মাটির বাসায় থাকি। বর্ষাকালে ঘরের চালও জুটে না আমাগো। তা হইলে আমার ছাওয়ালটাকে কই, তর বউ আর মাইয়াটারে টাইনা বাসা থিকা বাইর করুক। তর গলার নলি কাইট্যা তর সম্পত্তি দখল করুক। হ্যাডা জায়েজ হইব তো?’

‘মুখ সামলাইয়া কথা ক বুড়া। মাইরা তরে কই হাপিস কইর‍্যা দিমু’,— ঝাঁঝিয়ে উঠল মনিরুল।

‘সাহস তো কম নয় রে’,— রুখে দাঁড়াল বুড়ো জহিরুল,

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

‘আমারে চোখ রাঙ্গাস?’

‘চুপ’,— হুংকার দিল শুভ্র, ‘সব্বাই চুপ, নাহলে সবকটাকে ধরে ফাটকে পুরে দেব।’

‘শোনেন সাহেব,’— বলল মনিরুল, ‘আমারে এখন ছাইড়্যা দেন, আমি যাই। বেলাবেলি আমারে ঢাকায় পৌঁছাইতে হইব।’

‘ঠিক আছে,’— বলল শুভ্র, ‘ঢাকায় আপনার ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা কী, বলুন। সেখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট কাল-পরশু থেকে আমি নিজে সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে থাকব। আপনি যাই মনে করুন না কেন, এ রহস্যের সমাধান না করে আমার শান্তি নেই।’

‘ইমতিয়াজের কী হইব?’— বলল একজন গ্রামবাসী। অর তো কোনো খোঁজ নাই।’

‘দেখছি আমি,’— চুলে মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে মাথায় নাড়া দিল শুভ্র, ‘বড্ড মাথা ধরেছে।’

সাধনা

জলার কালো জলের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে জেগে আছে কয়েকটা পাথর। এই খালের মধ্যে, জলা মধ্যে এরকম অনেক পাথর আছে। জোয়ারের সময় পাথরগুলো দেখা যায় না। জলের তলায় থাকে। ভাঁটার সময় জল সরে গেলে দেখা দেয়। লোকে জানে না, এর মধ্যে অনেক পাথরের বুকে খোদাই করা আছে দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক আখ্যানের বিভিন্ন চরিত্র। যেমন, শ্মশানঘাটের কাছের এই পাথরটার একদিকে খোদাই করা আছে মহিষের আকৃতি, অন্যদিকে সশস্ত্র মহিষাসুর মর্দিনী। অবাক হলো মাতঙ্গী। দেবীর কপালে সিঁদুর লেপা। হিন্দুশূন্য এই গ্রামে কে দেবীর মূর্তিতে সিঁদুর দিতে আসে!

বুকফাটা হাহাকারে রাতচরা পাখির দল থেকে থেকে ডেকে উঠছে। ডাকটা যেন ভেসে আসছে অচিন মাত্রার এক পরাজগৎ থেকে। কালো মেঘেঢাকা আকাশে স্যাঁতস্যাঁতে ঘন আঁধার। গ্যাঙর গ্যাঙর ব্যাঙ ডাকছে। এদিক-ওদিক কিছু ছেঁড়া মাদুর, ভাঙা কলসির টুকরো ছড়িয়ে আছে। বিগত দিনের স্মৃতি। সেই দিনগুলোর, যখন এখানে দাহ সংস্কার হতো।

জলা থেকে উঠে পাড়ের অশ্বত্থ গাছটার দিকে এগিয়ে গেল মাতঙ্গী। গাছের গোড়া মাটি দিয়ে বাঁধানো, গোবর নিকানো। জায়গাটায় হাত দিয়ে অনুভব করল ও। মাটির নীচে ঠিক এই জায়গাটাতেই পোঁতা আছে একটা শেয়ালের খুলি। উল্টোদিকে একটা কুকুরের খুলি। বাঁদিকে সাপের খুলি, ডানদিকে ষাঁড়ের খুলি। মাঝখানে মানুষের খুলি। পঞ্চমুণ্ডির সেই আসনের ওপর লাশটাকে চিৎ করে ফেলল মাতঙ্গী। লাশের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দুটো লালসুতো দিয়ে বেঁধে ফেলল, যাতে শরীরে বন্দি আত্মা পালাতে না পারে। কপালে, বাহুমূলে মাখিয়ে দিল চিতাভস্মের ছাই। কাকের বাসা জড়ো করে রাখা ছিল। তাতে শ্বেতসর্ষে ঢেলে আগুন দিতেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হোমকুণ্ড।

আশপাশে ঝুপসি অন্ধকার। বট, অশ্বত্থ, শ্যাওড়া, পাকুড় গাছের ভিড়। গাছগুলো থেকে কীসব যেন ভুতুড়ে আকৃতি ঝুলছে। ভাঙা গাছের ডাল দড়ি দিয়ে বেঁধে বানানো মানুষের গড়ন, লাল সুতোয় বাঁধা। রক্তের রং লাল। লাল সুতো ধমনীর প্রতীক। জীবনপ্রবাহের প্রতীক।

আগুনের পটপট, বাতাসের সোঁ-সোঁ, ভিজে পাতার টুপটাপ। বিদেহীদের আনাগোনা অন্ধকারে চুপিসারে। ধমনীতে তাদের গা ছমছম অতিন্দ্রীয় অনুরণন। এই জীবন সময় ও শক্তির ভারসাম্যের খেলা। কারও যদি সময় ও শক্তি একসঙ্গে ফুরোয় তার মৃত্যু হয় নিরুদ্বেগ। আর কারোর যদি শক্তি ফুরোয়, কিন্তু সময় তখনও বাকি থাকে? ধুঁকতে ধুঁকতে চলে সে জীবন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। আর যদি উল্টেটা ঘটে? সময় ফুরোয়, শক্তি তখনও থাকে ভরপুর? যেমন এই লোকটার। লাশটার দিকে তাকিয়ে দেখল মাতঙ্গী। ফ্যালফ্যাল করে শূন্যের পানে তাকিয়ে আছে লাশটা। হাঁ-করা মুখে অপার বিস্ময়। চোখের সামনে শিকারকে শিকারি হয়ে যেতে দেখলে যেমন বিস্ময় জাগে, তেমনি। প্রবল এক জিঘাংসার ঢেউ উঠল মাতঙ্গীর মনে। অনেক জীবন নষ্ট করেছিস তুই। আজ শুধু তোর জীবন নয়, মরণ নষ্ট করে দেব আমি। তোর সব শক্তি শুষে নিয়ে বলীয়ান হবো। সেই শক্তি কাজে লাগাব তোর মতো নরপিশাচদের সংহারে। আর তুই? লক্ষ বছর শক্তিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে এই শ্মশানে হাহাকার করে বেড়াবি। বৈতরণী পার হওয়ার শক্তি নেই। যন্ত্রণায় দগ্ধে মরবি প্রতি পলে, মুক্তি হবে না তোর।

জলার দিক থেকে দমকা একটা বাতাস উড়ে এসে হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গ্রামবাসীর দিকে। আঁশটে গন্ধী বাতাস। নিবু নিবু আলোছায়াতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের দুই ভিন্ন মাত্রার হিজিবিজি। ফৈজাবাদের সন্ন্যাসী মন্ত্রটা ওর গুরুকে দিয়েছিলেন, ওর গুরু ওকে। সেই মন্ত্রটা স্মরণ করে লাশের ওপর পদ্মাসনে ধ্যানে বসল মাতঙ্গী।

রাশি রাশি কুয়াশা উড়ে আসছে। ধুনির আগুনে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। গুমরে গুমরে ঘুরে মরছে অসংখ্য ছায়া ছায়া নিরালম্ব অবয়ব। কটু গন্ধে বিদেহী শৈত্য। অখণ্ড মনঃসংযোগের সাথে মাতঙ্গী উচ্চারণ করে চলেছে দুর্বোধ্য সব মন্ত্র। মন্ত্রের কম্পনে থরথর কাঁপছে শ্মশানভূমি। ঝোলার মধ্যে থেকে সিঁদুর মাখানে একটা আয়নার টুকরো বের করে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে

দিল। সেই মুহূর্তেই মস্ত শ্যাওড়া গাছটা নড়ে উঠল। একটা বাদুড় আত্মচিৎকার করে একরাশ পাতা ছড়িয়ে উড়ে পালাল। সেদিকে হুঁশ নেই মাতঙ্গীর। বীজমন্ত্রের এক একটা হুংকারের সাথে মৃতদেহ থেকে গমকে গমকে শক্তি শুষে নিল ও। ছটফট করে উঠছে লাশ, মুখে পোড়া মাছ আর কারণবারি ঢেলে দিতেই শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ছে। খানিকক্ষণের জন্য। আবার এক ধাক্কা। আবার এক গমক শক্তিপুঞ্জ। আবার আর্তনাদ করে জেগে উঠছে লাশ। সারা রাত চলল এই প্রক্রিয়া।

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শেয়ালের দল সমবেত আর্তনাদের সাথে রাত্রির শেষ ঘোষণা করল। ধুনির আগুন নিভিয়ে, গাছের শিকড়ের নিচে ঝোলাটা লুকিয়ে রেখে, ছিবড়ে লাশটাকে কাঁধে তুলে উঠে দাঁড়াল মাতঙ্গী। কচুবনের আশপাশে কোথাও ফেলে আসতে হবে এটাকে।

আতঙ্ক

গ্রামে কেমন যেন একটা আতঙ্কের পরিবেশ ছেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যে হতেই সবাই ঘরের দরজায় খিল এঁটে ভেতরে বসে আছে। শত ডাকলেও কেউ বেরোয় না। ঝনঝন শব্দ হলো পথের পাশের একটা বাড়ি থেকে। একরাশ কাঁসার বাসনকোসন এসে পড়ল খোলা উঠোনে।

'চাই না আমার, হেই সব গনিমতের মাল',— নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল বাড়িটার ভেতর থেকে, 'কাইল সক্কালেই হেইসব অলুক্ষুইনা জিনিস মজুমদারের বাড়ির সামনে ফালাইয়া দিয়া আসবা।'

অল্প অল্প বাতাস বইছে। শুনশান পথঘাট। জনমানব নেই কোনোখানে। মনে হয় এই গ্রামটা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় এক পৃথিবী, বর্তমানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। পথের ধারের একটা ঝাঁকড়া গাছ, পথের সামনেটাকে অনেকটা আড়াল করে রেখেছে। কুমড়োর ফালির মতো বাঁকা লাল পথটা মিলিয়ে গেছে তার আড়ালে। ভারী বুটের শব্দ পেয়ে কুক, কুক, কুক শব্দ করে কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল গাছ থেকে। পথের ধারে ছায়াছায়া ঘোলাটে গাছপালার সারি। ফাঁকে ফাঁকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুতুড়ে সব কুঁড়েঘর। তারই একটা থেকে ডুকরে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। তীক্ষ্ণ শিসের মতো একটা শব্দ শোনা গেল পথের বাঁকে। তার কয়েকমিনিট পরেই চমকে দিয়ে খসখস করে শব্দ করে একটা কালো ছায়া পথের এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে চলে গেল। বোধহয় একটা শেয়াল। সকালটা বেশ গরম ছিল, একটু শীত শীত করছে এখন। ডানদিকের একটা কুড়েঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল। তারপরেই একটা ধমকের স্বর। আলোটা নিভে গেল। ভয়! তীব্র একটা ভয় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে প্রতিটা গ্রামবাসীর বুকের ওপর। বিশেষ করে তাদের, যাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল মজুমদার বাড়ির সর্বনাশে।

বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। ছেঁড়া কাঁথার মতো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। দূরে কোথাও জেনারেটর চলছে। বাতাসে ডিজেলের বিজাতীয় দুর্গন্ধ। কর্কশ ভটভট শব্দটা এই পরিবেশে বড্ড বেমানান। গ্রামের এই দিকটা বেশ ফাঁকা। খালের জলে রাংতার গুঁড়োর মতো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। অল্প বাতাসে থিরথির করে কাঁপছে। জ্যোৎস্নার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে গ্রামের মাথায়, গাছের ওপর, পুকুরের জলে। খাল-বিল-নদী-নালা সবাই যেন সানন্দে চাঁদের গুঁড়ো মেখে অনাবিল আনন্দে গান ধরেছে। শুধু মানুষগুলোই ভয়ে লুকিয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুভ্র।

একরাশ পাতা ঝরে পড়ল সামনের গাছটার থেকে। তার সাথেই গাছের উপর বাঁদরের হুপহাপ ডাক শোনা গেল। সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাল শুভ্র। চাঁদের রঙে ময়লা ছোপ লেগেছে। ঝকঝকে ঘন নীল এখন ঘোলাটে। গাছগুলোকে আলাদা করে আর চেনা যাচ্ছে না। সবাই মিলেমিশে জমাটবাঁধা অন্ধকার হয়ে গেছে। হুড়মুড় শব্দ করে দূরে কোথাও ভারী কোনো জন্তু দৌড়ে পালাল। বাঘ? এই অঞ্চলে এখনও বাঘ আছে? না কী তারা বিলুপ্ত? হিন্দুদের মতো।

আকাশে মেঘের দল সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো এখুন। পথটা চৌমাথা হয়ে চলে গেছে গ্রামের আরও গভীরে। সেদিকে না গিয়ে গ্রামের বাইরের দিকে যাওয়ার পথটা ধরল শুভ্র। ইমতিয়ার অপহৃত হওয়ার পর থেকে পাগল হওয়ার দশা হয়েছে শুভ্রর। সারাদিন সারারাত মাতঙ্গী গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে শুভ্র। কোথায় আছে ইমতিয়াজ? বেঁচে আছে? আশা কম। কিন্তু, তাহলে তো দেহটা পাওয়া যাবে! দেবীর হাতে দুটো খুন হলো, দুটোরই লাশ পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে অন্যথা হলো কেন? অন্য দুটো আক্রমণের সময় শিকার একা ছিল। এক্ষেত্রে ইমতিয়াজের সঙ্গে দেহরক্ষীরা ছিল। তাই কি দেবী দেহ নিয়ে উধাও হয়েছে?

গ্রামের মধ্যে থেকে বাঁশবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল শুভ্র। ভুত ভুতুম্ শব্দ করে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল কাছেই কোনো গাছের মগডাল থেকে। ঠিক তখনই শুভ্র দেখতে পেল, দূর থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে দীর্ঘদেহী ছায়া ছায়া এক নারীমূর্তি বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাঁধ থেকে ওটা কী ঝুলছে? লাশ? ইমতিয়াজের লাশ?

কোমর থেকে সার্ভিস রিভলবার বের করে ছায়ামূর্তির দিকে দৌড়ল শুভ্র। 'খবরদার',— চিৎকার করে গুলি চালাল। গুড়ুম

শব্দে কেঁপে উঠল গ্রাম।

যেন আগে থেকেই বুঝতে পেরে গিয়েছিল ছায়ামূর্তি। পলক ফেলার আগেই ঘাড় থেকে লাশের বোঝা মাথার ওপর তুলে অবলীলাক্রমে শুভ্রর দিকে ছুঁড়ে মারল। হুড়মুড় করে লাশ উড়ে এসে পড়ল শুভ্রর ঘাড়ে। আছাড় খেল শুভ্র, হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর আগেই অন্ধকারে মিলে গেল ছায়ামূর্তি।

নিশ্চয়ই শ্মশানের দিকে গেছে।

জোরে হুইসিল বাজিয়ে দিল শুভ্র। তারপর রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে দৌড়াল। দৌড়তে দৌড়তে আছাড় খেল কয়েকবার। হাত-পা ছড়ে গেল বাঁশের গাঁটের খোঁচায়। শ্মশানে পৌঁছে এক ঝলকের জন্য দেখতে পেল দীর্ঘদেহী নারীর ছায়া জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আবার হুইসিল বাজালো শুভ্র। তারপর দৌড়াল। হাঁচড়-পাঁচড় করে জলা পার হলো। জঙ্গল পেরিয়ে যখন রাস্তায় পৌঁছাল, দেখল রাস্তার ওপর দিখে দৌড়ে যাচ্ছে সেই নারীমূর্তি। পথের ধারে গাড়িতে যে পুলিশকর্মীরা অপেক্ষা করছিল, তারা ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা গেছে নারীমূর্তিকে।

হঠাৎ একটা অপার্থিব হা-হা-হা-হাঃ চিৎকারে কেঁপে উঠল রাতের আকাশ। সবাইকে চমকে দিয়ে অন্ধকারের বুকে আবিভূত হলো একরাশ কুয়াশা। সাধারণ কুয়াশা নয়, যেন জ্যান্ত সে। ঘুরপাক খাচ্ছে, চতুর্দিকে হাত ছড়িয়ে ডাকছে সবাইকে, আয়, আয়, আয়। দৌড়ে আসা কন্সটেবলরা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। কুয়াশার দিকে তাক করে উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়ল শুভ্র। ভেদ করে বেরিয়ে গেল গুলি, কিছুই হলো না।

বুকফাটা আর্তনাদে একদল রাতচরা পাখি ডেকে উঠল কোথাও। বাতাশে আঁশটে গন্ধ। পচা গন্ধ তারকাহীন আকাশজুড়ে। ধানখেতের দিকে কিছু একটা শব্দ হলো। হাঁচড়-পাঁচড় করে দৌড়ে যাওয়ার আওয়াজ। তার ঠিক পরেই কুয়াশা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। শুভ্র দেখল, দূরে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে। শুভ্রর হাত তখনও ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপছে। অন্য হাত দিয়ে কবজি আঁকড়ে ধরে হাত স্টেডি করে তাক করল শুভ্র, আন্দাজে কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল। তারপর ঝাঁপ দিল ধানখেতের মধ্যে। পেছন পেছন কন্সটেবলরা। অন্ধকারে ক্ষেতের মধ্যে প্রায় পনেরো মিনিট লুকোচুরি খেলার পর মেয়েটি আবার রাস্তা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। লুকোচুরি এবার শুরু হলো গ্রামের সরু গলিঘুঁজির মধ্যে। বেশ খানিকক্ষণ এ-গলি ও-গলি করার পর একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল মেয়েটি।

শুভ্র দেখল, বাড়িটা কাশেম আলির।

পুলিশ কন্সটেবলদের দিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলল শুভ্র। তারপর হাঁকডাক করে ডেকে তুলল বাড়ির লোকেদের। এক এক করে বেরিয়ে এলো সবাই। কাশেম আলির বউরা, মেয়েরা, ছেলে ও ছেলের বউরা। সবশেষে বেরোলো কাশেমের চতুর্থ স্ত্রী মনোয়ারা। শুভ্র দেখল, ঈষৎ খোঁড়াচ্ছে মনোয়ারা। বাড়ির লোকেদের উঠোনে দাঁড় করিয়ে পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেল শুভ্র। খুঁজে পেল না। মেয়েটি যেন বেমালুম উধাও হয়ে গেছে।

বাড়ির পেছনে কুমড়োর মাচানের মধ্যে পাওয়া গেল একটা রক্তমাখা কাপড়। কার কাপড়? মেয়েটার? ও যে গুলিগোলা ছুঁড়েছিল, তার একটা কি মেয়েটার গায়ে লেগেছিল? তার মানেটা কী দাঁড়াল? মেয়েটা এখানে এসেছিল? গ্রামে এত জায়গা থাকতে নিজের শিকারের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গেল কেন? আর আশ্রয় যদি নিয়েই থাকবে, পুলিশ পাহারার মাঝখান থেকে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল কী করে?

একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যুক্তি দিয়ে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। এরকম চললে কতদিন আর মাথা ঠিক থাকবে?

কী মনে হলো, কাশেমের বাড়িতে দুজন পুলিশ পাহারা রেখে উল্টোদিকে দৌড়াল শুভ্র। মজুমদার বাড়ির দিকে। মাঠ পেরিয়ে যখন মন্দিরের সামনে পৌঁছল, দূরে গ্রামের দিক থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠল। পূবের আকাশে ঘন কালো ভাবটা আর নেই, সেখানে নীল রঙের ছোঁয়া লেগেছে।

আজও এতপ্লাটে কারেন্ট এলো না। অসহায়ের মতো দূরে গ্রামের দিকে তাকাল শুভ্র। টর্চটা কোথায় পড়ে গেছে, কে জানে! পকেট থেকে মোবাইল বের করে আলো জ্বালালো শুভ্র। মন্দির ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলল শুভ্র। না, ছায়ামূর্তি তাহলে এখানে আসেনি।

চলে আসছিল, হঠাৎ পুকুরের পাড়ের কাছে একটা সাদা জিনিসের দিকে চোখ আটকে গেল। নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। কী ওটা? হাঁটু পর্যন্ত উঁচু কাদায় নেমে পড়ল শুভ্র। নলখাগড়ার জঙ্গলের মধ্যে, পাড় থেকে বেশ অনেকটা দূরে, পাঁকের মধ্যে গাঁথা ছিল জিনিসটা। হাতে তুলে নিল।

একটা ওয়াকিং স্টিক।

বউদিদি

কলকল শব্দ করে নদী থেকে খালে জল ঢুকছে। খড়কুটো, মরা ডালপালা, নানা রঙের পাতা ভেসে যাচ্ছে। মাছের ঝাঁক ঘাই মারছে জলে।

খালপাড় জুড়ে টাঙ্গানো বাঁধাজাল, খেপলা জাল। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। খাল যেখানে আরেকবার বাঁক ঘুরে গ্রাম থেকে দূরে সরে চলে গেছে নদীর পানে, সেখানেই রয়েছে বাঁশের তৈরি ঘাট। অনেক পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে খালের জলে। আগে এখান থেকে সওদাগরি নৌকা ছাড়ত। এখন এই ট্রাকের যুগে সওদাগরি নৌকো বিরল। তাই ঘাট ব্যবহার বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্নানের জন্য। ঘাটের আশপাশে ঝাঁকড়া নিমগাছের ভিড়। সেই গাছের অন্ধকারে আড়াল নিয়ে বসেছিল মনোয়ারা। মৃত কাশেম আলির চতুর্থ বিবি।

'ঘা শুকিয়ে এসেছে',— মনোয়ারার ব্যান্ডেজ বদলে দিতে দিতে বলল মাতঙ্গী, 'বুলেটটা পা ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষে। যদি ঢুকে যেত, কপালে দুঃখ ছিল।'

কোনো উত্তর দিল না মনোয়ারা। অন্যমনস্কভাবে সামনে খালের দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে জলের গন্ধের সাথে নিমের কড়া গন্ধ। নিমগাছগুলোর পায়ে ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অনেক ফুল। জবা ফুলের সাথে বিস্তর মিল রয়েছে ফুলটার। না-ফোটা ফুলের আকার ঘণ্টার মতো। ফুটলে সেই ফুলই প্রজাপতির বিভ্রম তৈরি করে। কত না রঙের। বেগুনি, গোলাপি, হলুদ। কমলা, লাল, সাদা, রানি-রঙা। ওয়াইনের মতো কালচে-লাল রঙেরও রয়েছে বেশ কিছু ঝোপ। অনেকগুলোতে আবার দু-তিন রঙের মিশেল। কমলা পাঁপড়িতে লাল ছিটে, গোলাপি পাঁপড়িতে মেরুন। পাঁপড়ির গোড়ায় গলুদ রং, সেই রং ধীরে ধীরে সাদা ছুঁয়ে লাল হয়েছে পাঁপড়ির আগায়।

'আমারই দোষ',— বলল মাতঙ্গী, 'অসতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমাকে ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই কারোর। ফলে দেখো, প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম সেদিন। মাঝখান থেকে তুমি এসে লোকটাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে না গেলে...'

'চুপ কর',— বলল মনোয়ারা, 'তুই হলি সাক্ষাৎ দেবী! তোকে ধরে ফেলে কার এমন সাধ্য আছে? তাছাড়া, রোজ রাতে আমি গ্রামের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই, কেন জানিস? যদি তোকে সাহায্য করার একটা সুযোগ পাই। যে কাজটা আমি চিরকাল করতে চেয়েছিলাম, আজ সেটা করতে তুই এসেছিস। আমার এ জীবনের আর কোনো অর্থ নেই। শুধু দেখে যেতে চাই, তুই সফল হয়েছিস। সেদিন আমি গলা ফাটিয়ে বলব, আমি মনোয়ারা নই, আমি মজুমদার বাড়ির মেজ বউ মৃন্ময়ী। তারপর ওরা যদি আমাকে খুন করে, করুক।'

'বউদি', — বলল মাতঙ্গী, 'তুমি আমার সাথে পালিয়ে চলো।'

'না।'— বলল মনোয়ারা, 'আমাকে জোর করে বিয়ে করে সেই জোরে মজুমদার বাড়ির দখল নিয়েছিল কাশেম। আমি পালিয়ে গেলে সেই দখল চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। আমি এখানেই থাকব। মজুমদার বাড়ির দখল নেব। তাছাড়া, এ গ্রামে আমার মতো আরও কয়েকটা অভাগী আছে। আমি চলে গেলে তাদের দেখবে কে?'

'ঠিক আছে।'— বলল মাতঙ্গী, 'দেখছি, তোমার সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কী না। যাতে আমি চলে যাওয়ার পর তোমার কোনো অনিষ্ট না হয়।'

'এই নে',— মাতঙ্গীর হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিল মনোয়ারা, 'মনিরুলের ঢাকার ফ্ল্যাটের ঠিকানা। ঢাকার পথঘাট চিনিস তো?'

'সেটা সমস্যা নয়,'— হেসে বলল মাতঙ্গী, 'কিন্তু এটা তুমি জোগাড় করলে কী করে?'

'সেটা না হয় নাই জানলি?'— বলল মনোয়ারা।

'গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটায় পারলে প্রতি সপ্তাহে দম দিও',— কান্নাভেজা গলায় বলল মাতঙ্গী, 'অনেক কষ্ট করে সারিয়েছি ওটাকে। ঠাকুরদার খুব প্রিয় ছিল ওটা, জানো তো। দেখলাম, এখনও ওটায় ঠাকুরদার রক্তের ছিটে লেগে আছে।'

'ভালো থাকিস বোন,'— মাতঙ্গীর হাত চেপে ধরে বলল মনোয়ারা, 'সাবধানে থাকিস। জানি না, কালকের পর আবার কবে তোর সাথে দেখা হবে। এ জন্মে আদৌ হবে কী না।'

'কোথা থেকে সে কী হয়ে গেল, বলো তো বউদিদি।'— বলল মাতঙ্গী, 'সবকিছু ছারখার হয়ে গেল।'

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হচ্ছে। আকাশে রঙের মেলা। নীল থেকে ঘন নীল, তার মাঝে লাল, লালের মধ্যে আবার গোলাপি আর রানি রঙের ছটা। শূন্য জুড়ে যেন কেউ বেপরোয়া হাতে তুলি চালিয়েছে। যে রং সামনে পেয়েছে সেটাই আকাশের গায়ে বুলিয়ে দিয়েছে। সে রঙের হোলি জলেও সাড়া জাগিয়েছে। তিরতির কাঁপছে জল, রঙিন ঢেউ উঠছে।

'এখন তুই আয়',— বলল মনোয়ারা, 'আর দেরি করিস নে।'

'দাঁড়াও,'— চোখ মুছে বলল মাতঙ্গী, 'আগে আশপাশটা দেখে নিই।'

কাঁধের ঝোলাটা মাটিতে নামিয়ে তার মুখ খুলে দিল মাতঙ্গী। মৃদু খুরখুর শব্দ হলো। ছাড়া পাওয়া পাখির মতো ছটফটিয়ে কৃষ্ণবর্ণ একটা অবয়ব সটান আকাশে উঠে গেল।

বাঁ হাতের কবজির দিকে তাকিয়ে বলল মাতঙ্গী, 'ঠিক আছে।'

মনোয়ারা দেখল, মাতঙ্গীর বাঁ হাতের কবজি আবৃত প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া একটা কালো রবারের ব্যান্ডে। দেখে মনে হলো কালো রবার। কিন্তু তার উপরের ভাগ চকচকে, অনেকটা টিভির কালো পর্দার মতো। নানান রঙের কিছু বিন্দু সেই পর্দার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন রঙিন জোনাকি।

'ওটা কী রে?'— আকাশের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করল

মনোয়ারা।

‘ওটাকে বলে ড্রোন,’— বলল মাতঙ্গী, ‘যান্ত্রিক পাখি, ওর চোখে যা ধরা পড়ে, আমি আমার হাতঘড়িতে তার সবই দেখতে পাই।’

‘ঘন সবুজ গায়ের রং’,— অস্ফুট স্বরে বলল মনোয়ারা, ‘যেন টিয়াপাখি। শুনেছি দেবী মাতঙ্গীর সাথে সবসময় টিয়াপাখির ঝাঁক থাকে।’

‘আমি তবে যাই বউদিদি’,— বলল মাতঙ্গী।

‘যাই বলতে নেই,’— বলল মনোয়ারা, ‘বল আসি।’

অন্ধকার নামছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

ঢাকায়

পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যে মনিরুল আলমের ফ্ল্যাট, এগারো তলায়। বারান্দা থেকে হাতির ঝিলটা দেখা যায়। বিল্ডিংয়ের সব সম্ভাব্য প্রবেশপথে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। প্রতিটা জানালা লক করে দরজায় তালা লাগিয়ে ভেতরে বসে আছে মনিরুল। পাশে শুভ্র।

বাইরে বৃষ্টির একঘেঁয়ে চড়বড় চড়বড় আওয়াজে মাথা ঝিমঝিম করছে। ডিমলাইটের আলো-আঁধারিতেও দিব্যি বোঝা যাচ্ছে, মনিরুলের হাত কাঁপছে। ঘরের এক কোণে সোফায় বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর ওপর নজর রাখছিল শুভ্র। বন্ধ ঘরের এসির ঠাণ্ডা বাতাসে বিলিতি সিঙ্গল মল্ট স্কচের গন্ধ। বরফ ঢেলে একটার পর একটা খেয়ে চলেছে মনিরুল। এই নিয়ে কি চারটে হলো? না কী পাঁচটা? আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছে মনিরুল। যার অধিকাংশই গালাগাল ‘হালার পো, মালাউনের বাচ্চা... তর হেই করি আমি... তর’। এরই ফাঁকে মাঝে ঘড়ঘড় নাক ডাকারও শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে সাইড টেবিলের ওপর রাখল শুভ্র। টেবিল থেকে অরেঞ্জ জুসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল। একটা মিহি খুরখুর শব্দ হলো জানালার বাইরে। এত মৃদু যে প্রায় শোনাই যায় না। বিশেষ করে বৃষ্টির চড়বড় চড়বড় শব্দের মাঝে। তখনই মনে হলো, ঘরটা বড্ড চুপচাপ হয়ে গেছে। এসি মেশিনটা কি বন্ধ হয়ে গেছে? ও, মনিরুল বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ পেল শুভ্র।

লোকে বলে আতঙ্কের পরিস্থিতিতে মানুষ হয় পালায়, না হয় আক্রমণ করে। ফাইট অর ফ্লাইট। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অসীম আতঙ্কে মানুষ আরেকটা প্রতিক্রিয়া নেয়। ফ্রিজ। ফাইট, ফ্লাইট অর ফ্রিজ। তীব্র আতঙ্কে শরীর পাথর হয়ে যায়। পাত-পা নড়ে না। এক ঝলকের দৃশ্য শুভ্রর অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিল। পাথর হয়ে গেল ও।

মনিরুলের পেছনের জানালাটা হাট করে খোলা। অনেক ধোঁয়াশা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। যেন কোনো মন্ত্রবলে!

গ্রাম নয়, আধুনিক ঢাকার সর্বাধুনিক এলাকা এটা। প্রহরা

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR

PUNJAB

M: 9815479543

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, **'SBM'** BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

G. B. Auto Industries (Regd.)

Leading Mfr : Exporters & Largest Suppliers of

Rickshaw Hub, B. B. Shells (Bi-cycle Parts) & All Type of Lastings

C-84, Focal Point, Phase-V
Dhandari Kalan
Ludhiana - 141 010
Office : 0161-2671700, 2671600, 2677500
Fax : 0161-2671500,
M : 094172-71500, 098772891700
E-mail : gbskg@yahoo.in
gbautoind@yahoo.co.in
Web : www.gbautoindustries.com

With Best Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010
Tel. 0161-4610141
M.: 9814000141

ঘেরা অ্যাপার্টমেন্টের এগারো তলার তালাবন্ধ ঘরে মনিরুলের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই দেবীমূর্তি। তার একটা হাত মনিরুলের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ করেছে। অন্য হাতটা মনিরুলের কাঁধে। বিস্ফারিত চোখে মনিরুল কিছু একটা বলতে চাইছে। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোচ্ছে না।

সেই অপার্থিব মূর্তি স্থির দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আছে। হাড় হিম হয়ে যায় সেই চোখদুটির দিকে তাকালে।

'শুভ্র',— অপার্থিব স্বরে বলল সেই ছায়ামূর্তি, 'ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ এ পার্সোনাল ডিফিট।'

একটা মুহূর্ত। তারপরই সাইড টেবিল থেকে সার্ভিস রিভলবার তুলে নিল শুভ্র। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টেপার মুহূর্তে একটা উড়ন্ত বস্তু এসে আঘাত হানল ওর হাতে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। খোলা জানালার, ঘন কুয়াশার ওপারে।

রিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়ে জানালার দিকে দৌড়ে গেল শুভ্র। নেই, কেউ নেই। শুধু একটা কার্বন ফাইবারের দড়ি ঝুলছে জানালা থেকে। অনেক নীচে নেমে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। সেই অন্ধকার লক্ষ্য করে বারকতক গুলি ছুঁড়ল। তারপর ওয়াকিটকি তুলে বলল নীচে অপেক্ষারত পুলিশদের।

'বলছেন কী!'— অবাক প্রতিক্রিয়া তাদের, 'একটা মেয়ে ওপরে উঠল, আবার নেমে এল, আর আমরা কিছুই টের পেলাম না? এটা কি সম্ভব!'

'তাহলে এই যে লোকটা মাটিতে পড়ে আছে, এটাকে খুন করল কে?'— ধমকে উঠল শুভ্র, 'ওপরে এক্ষুনি লোক পাঠান, আর কম্পাউন্ডের প্রতিটি কোণা খুঁজে দেখুন। এখানকার ব্যবস্থা...।'

মাটির ওপর পড়ে আছে কালো হাঁড়ির টুকরো। একটু আগে উড়ে এসে যেটা শুভ্রকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়েছে। একবার মনে হলো, টুকরোগুলো জুড়ে দেখি, কী আছে তাতে। তারপর মনে হলো, কী লাভ। ওতে কী আছে, শুভ্র সেটা জানে। ছ'টা ঢ্যাঁড়া। একটাও ফুটকি আর নেই ওটাতে।

ঘরের কোণে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিল শুভ্র।

ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ! খালি।

তখনই খেয়াল করল, একফোঁটা কুয়াশা আর নেই ঘরের মধ্যে। যেমন হঠাৎ করে এসেছিল তারা, তেমনই হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরা

বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

'চালাও',— গাড়িতে উঠে বলল শুভ্র। বলেই হুটার অন করে দিল। গাড়ির ছাদে লাল-নীল বাতি ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল।

'কোথায় যাইবেন সার?'— অ্যাপার্টমেন্টের ড্রাইভওয়ে থেকে গাড়ি বার করতে করতে জিজ্ঞাসা করল ড্রাইভার।

'মাতঙ্গী গ্রাম',— বলল শুভ্র, 'তাড়াতাড়ি চালাও।'

আলো ঝিলমিল রাতের গুলশান। রেস্টুরেন্টগুলোতে উচ্ছল লোকের ভিড়। পথচারীরা হাসি গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। রাস্তা পার হচ্ছে। তারই মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল। মগবাজার ফ্লাইওভারের সামনে এসে গাড়ির গতি কমে গেল। অনেক গাড়ির মেলা। শম্বুকগতিতে কিছুক্ষণ এগোনোর পর থেমে গেল গাড়ি। সামনে বিরাট ট্র্যাফিক জ্যাম। অধৈর্য হয়ে শুভ্র দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামতে গেল, ঠিক তখনই পায়ে কিছু একটা ঠেকল। মন্দিরের ধারের পুকুরে পাওয়া সেই ওয়াকিং স্টিকটা। পায়ে লাগতেই ধাতব একটা শব্দ হলো। কী মনে হলো, গাড়ির দরজা বন্ধ করে, লাঠিটা হাতে তুলে নিল শুভ্র।

ফ্লাইওভার পেরোতে ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সিলেট-ঢাকা হাইওয়েতে পড়ার পর গাড়ির গতি বাড়ল। তারপরেই দুড়ুম শব্দে গাড়ি বিকল হয়ে গেল। ড্রাইভার বনেট খুলতে একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এলো ইঞ্জিন থেকে।

'কী ব্যাপার?'— প্রশ্ন করল শুভ্র।

ড্রাইভার চিমটে দিয়ে একদলা প্লাস্টিক বের করে আনল ইঞ্জিনের মধ্যে থেকে।

'এইটা দেইখা তো গাড়ির পার্টস মনে হইতাসে না সার।'

হাততালি দিয়ে উঠল শুভ্র। বাহবা দেবী! আমাকে আহত না করেও এরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলেন! জবাব নেই আপনার। কিন্তু আমিও হাল ছাড়ছি না।

ড্রাইভার অবাক চোখে শুভ্রর দিকে তাকাল। দ্রুত ফোন করল শুভ্র, 'গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। একটা রিপ্লেসমেন্ট গাড়ি দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

কয়েকটা সূত্র, কয়েকটা দৃশ্য মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ঘুরপাক খাচ্ছিল। আজ হঠাৎ করেই সেগুলোর অর্থ খুঁজে পেল শুভ্র। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। একটা অসম্ভব সন্দেহ দানা বাঁধছে মনের মধ্যে। দেবীমূর্তির অবয়বটা অপার্থিব হলেও চোখদুটো বড্ড পরিচিত। দেবীর গলার স্বর অজানা হলেও বাচনভঙ্গি বড্ড চেনা।

স্বগত

মন্দিরের চাতালে বসে ছিল মাতঙ্গী। বাইরে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মিশে থেকে একদল প্রেতকল্প ছায়ামূর্তি কাজ করে চলেছে, নিঃশব্দে। মজুমদার বাড়িতে আজ অনেক লোকের মেলা।

আকাশ জুড়ে রাশি রাশি তারা ফুটেছে। ছায়াপথ অসীম মমতায় মাথার ওপর এলিয়ে দিয়েছে হীরকখচিত আঁচল। মায়ের স্নেহের আঁচল। মা, তোমার এত স্নেহ নশ্বর এই ধূলিসমান মনুসন্তানের জন্য, আমি তবু না-পাওয়ার কষ্টে কেঁদে মরি। বালির স্রোত নিরন্তর আঙ্গুল গলে বয়ে চলেছে, আমি তবু মুঠোর বালির জন্য শোক করি। এ ব্রহ্মাণ্ডে তো কিছুই ফুরোয় না। স্মৃতি অবিনশ্বর, সেই তো শুধু আপন। মন খারাপ করলে সময়ের সরণি বেয়ে একটু পিছু হেঁটে ফেলে আসা সময়টায় পৌঁছে গেলেই হলো। হেসে খেলে উঠবে এই বাড়ি। আলোয় ঝলমল করবে। সেই আগের মতো।

মাত্র কিছুদিন আগের কথা। দুবাই এয়ারপোর্টে মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল লোকটার সাথে। দাড়ি আরও লম্বা হয়েছে, তাতে সাদা পাক ধরেছে। কিন্তু আর কিছু বদলায়নি। মুখের সেই ক্রূরতা, চোখের সেই জান্তব দৃষ্টি, সেই সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটা। সারারাত চালের হাঁড়িতে লুকিয়ে দেখেছিল সেই লোকটাকে একের পর এক খুন করতে। এই লোকটা, সাথে আরও পাঁচটা লোক। আতঙ্কে গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোয়নি। তাই বেঁচে গিয়েছিল।

বোধহয় এই কাজটার জন্যই নিয়তি বাঁচিয়ে রেখেছিল ওকে।

দুবাই এয়ারপোর্ট থেকেই পিছু ধাওয়া করেছিল লোকটার। হোটেলে লোকটার পাশের ঘরটাই নিয়েছিল। সেখানে সুযোগ আসেনি। বিভিন্ন মজলিস, জমায়েতে গেছে লোকটা। ও গেছে সাথে সাথে। লোকটা রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকেছে। ওও সেখানে খেতে গেছে। লোকটা গল্ফ খেলতে গেছে, ওও গেছে গল্ফ খেলতে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশে। সুযোগ এসে গেল রাস-আল-খেমা সমুদ্রের ধারে।

তখনই ঠিক করে নিয়েছিল, বাকি ক'জনকেও শেষ করতে হবে।

খুন? না, না। এটা খুন নয়। এটা শাস্তি। এটা ন্যায়বিচার। হিন্দু জাতির সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ হলো, আমাদের মনে রাখার ক্ষমতা। হাজার হাজার নয়, লক্ষ বছরের স্মৃতি আমাদের মনে জীবন্ত। যেন গতকালে স্মৃতি। এই মনে রাখার ক্ষমতার জোরেই বলছি, এটা খুন নয়। এটা উপনয়ন। এটা জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন। এটা হলো সত্যিকারের বড়ো হয়ে ওঠা। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

চাণক্য। গান্ধী নয়, অশোক নয়। মহামতী চাণক্যই দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের ভিত রচনা করতে পেরেছিলেন।

আটশো বছর ধরে আরব, তুর্কি, উজবেগ, ইরানিদের অবিরল আক্রমণে রক্তাক্ত হচ্ছিল ভারতখণ্ড। দিনের বেলা নরমুণ্ডের পাহাড় তৈরি হতো। রাত্রি ছিঁড়ে খানখান হতো ধর্ষিতাদের প্রাণান্ত আর্তনাদে। যন্ত্রণা দিয়ে মানুষ খুন ছিল নিত্যদিনের বিনোদন। আনুমানিক ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ ভারতবাসী খুনে হয়েছিল সেই কালখণ্ডে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাই ছিল বৃহত্তম গণহত্যা। এ ঘটনাকে অস্বীকার করার চেষ্টা বৃথা। আক্রমণকারীরা তাদের নৃশংসতার কথা গর্ব করে, ফলাও করে লিখে রেখে গেছে দিনলিপিতে।

কিন্তু সেই দিনগুলো তো আজ অতীত। তাই না? উজবেকিস্তান, ইরান, আরব দুনিয়ার দেশগুলো আজ আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতে বন্ধু।

অথচ দিনগুলো তো আজও বর্তমান।

মালদার কালিয়াচকে দেখা মিলল দ্বিতীয় শিকারের। সবসময় দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে থাকে। এলাকার অঘোষিত নবাব। হায় স্বাধীন ভারত! এই জন্যই কি স্বাধীনতার জন্য এত মানুষ প্রাণ দিল, যাতে এইসব নরপশু নবাবি করতে পারে? ওপার বাঙ্গলাতে এরাই হিন্দুদের মারে, এপার বাঙ্গলাতেও এরাই। আধুনিক যুগের ঘোরি আর মামুদ এরা। যদুনাথ সরকার চেয়েছিলেন, বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ হোক ইজরায়েলের মতো। প্রতিরোধের বঙ্গ। সেটা হয়নি, কিন্তু সুযোগ এখনও ফুরোয়নি।

সুযোগ মিলল বাজারের মধ্যে। ছোট্ট একটা ধাক্কা। যতক্ষণে পুলিশ খবর পেল, ও ততক্ষণে বর্ডারের ওপারে। আর খবর পেয়েই বা কী করবে পুলিশ? মৃত্যু তো রক্তাল্পতার জন্য হয়েছে। কিল খেয়ে কিল হজম। মাইনকা চিপা!

রামজী। মানুষটা ওকে বাঁচিয়েছিলেন। আশ্রয় দিয়েছিলেন। দিশা দিয়েছিলেন। জীবনের মানে চিনতে শিখিয়েছিলেন। ওর গুরু। তিনি বলেছিলেন,

'তোর নিজের রাজশক্তি পিছন থেকে তোকে ছুরি মারবে। অভিমান হবে। মনে হবে, তুই একা। সবাই তোর শত্রু। সেই পরিস্থিতিতে মনে রাখবি, কেউ তোর আপন নয়। তোর এজেন্সি, তোর ঊর্ধ্বতন বস, তোর সরকার, এমনকী তোর দেশবাসী, কেউ নয়। তোর জীবন শুধু রাষ্ট্রের জন্য। ভারত মায়ের জন্য। বাকি সব আনুগত্য, সব সম্পর্ক, সব নীতিবাক্য। সব ন্যায় অন্যায়, সব মিথ্যে।'

ছ'টা ঘোরি নিপাত হলো। মাত্র ছ'টা। আরও অনেক অনেক ঘোরি বাকি।

গ্রহের ফের! আর ভারতীয় উপমহাদেশের অর্ধেক লোক ঘোরি, লোদি, মামুদ, ঔরঙ্গজেবকে মহান মানে। নিজের ছেলের নাম এইসব গণহত্যাকারীদের নামে রাখে। তারা ভেবে দেখে না, এইসব লোকগুলো ওদেরই পূর্বসুরীদের ওপর কী প্রাণান্ত অত্যাচার করেছিল। এরা কি সেই অন্ধকার দিনগুলো নিয়ে গর্বিত? কেন এরকমটা হয়েছে?

রামজী বলতেন, 'এর মূলে রয়েছে দুটি বিষয়। বেদান্ত বলছে, একটা মানুষ নিজেকে কী বলে ভাবে সেটা নির্ভর করে দুটো ব্যাপারের ওপর। স্মৃতি ও আত্মবোধ। সিংহশিশু যদি হায়নার পালে শিশুবয়স থেকে পালিত হয়, সে নিজেকে হায়না বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত সেই সিংহশিশুর সিংহত্বর স্মৃতি ও আত্মবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অবদমিত স্মৃতি, অবদমিত আত্মপরিচয় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

নিজেদের হায়না ভাবা এইসব সিংহশিশুদের মনে আক্রমণকারী বিজেতাদের ভাবমূর্তি বা প্রতিবিম্ব এখনও প্রবল। সেই প্রতিবিম্বকে ভাঙতে হবে, আরও শক্তিশালী এক প্রতিবিম্ব দিয়ে। মাতৃশক্তির প্রতিবিম্ব, যার যোগ এই উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষের নাড়ির সাথে।

এর সাথে, বিদেশি আক্রমণকারীদের ইউডেমোনিক লেজিটিমেসির আশ্বাস ভেঙে দিতে হবে।

একাত্তরের যুদ্ধের সময় ফৈজাবাদের সেই অনামা সন্ন্যাসী বলেছিলেন, বাংলাদেশকে তার ইসলামিক আইডেনটিটিকে এক্সপ্লোর করতে দিতে হবে। স্থায়ী সমাধানের সেটাই পথ। কেন? কেন, সেই এক্সপ্লোরেশন একদিন শেষ হবে। বেশ কিছু উপলব্ধি জন্মাবে সেই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। আর সেখান থেকেই ওদের ইন্টিগ্রেশন শুরু হবে। কিন্তু এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর বিজাতীয় আইডেনটিটির প্রভাব বেড়েই চলেছে বাংলাদেশে। পাকিস্তানি আমলেও এত দাড়ি আর বোরখা দেখা যেত না ঢাকার পথে, আজ যত দেখা যায়। কেন?

এর কারণ, ইউডেমোনিক লেজিটিমেসি।

মানুষ জীবনে সাফল্য চায়। আর সাফল্যের শর্টকাট হলো অন্য কোনো সফল মানুষের নকল করা। অনেকের কাছে আজ মামুদ-ঘোরিরাই সবচেয়ে সফল মানুষ। মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও গৌরগোবিন্দ হলো গোঁয়ার গোবিন্দ, অসাফল্যের প্রতীক। ইউডেমোনিক লেজিটিমেসি। সোসাইটি ক্রিয়েটস হোয়াট ইট রিওয়ার্ডস। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কোনো বিচার হয় না। হিন্দুরা শুধু পালিয়ে বেড়ায়। হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতে সাফল্য আসে, অর্থাগমও হয়। এই সাফল্যের স্মৃতি এক প্রতিশ্রুতির জন্ম দেয়। সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে, হিন্দুদের আক্রমণ করতে। এটাকে ভাঙতে হবে। এদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের ন্যায়বিচার দিতে হবে। যারা ধর্মের নামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে নিজেদের পকেট ভরিয়েছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। শাস্তির সেই ভয় হিন্দুবিরোধী সাফল্যের প্রতিশ্রুতিকে ধ্বংস করে দেবে। তাহলেই সিংহশিশুরা এক এক করে ফিরে আসবে ঘরে।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে উপসাগরীয় আরব দেশগুলি থেকে আসা তেলের টাকা দ্রুত শুকিয়ে আসছে। এটাই সঠিক সময়। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কালো আকাশে নীল আভা। ধূপধুনোর গন্ধ বাতাসে। বোধনের সময় সমাগত।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে পুকুরের জলে নামল মাতঙ্গী। ডুবসাঁতার দিয়ে নিমেষে পৌঁছে গেল অন্য পাড়ে, পুকুর যেখানে অগভীর হয়ে জলায় মিশেছে। সেখানে গিয়ে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেল। ঠিক এইখানে এক জরাজীর্ণ দেবালয় আছে, বহু হাজার বছরের পুরনো। শোনা যায়, সেই যুগে দেবী মাতঙ্গীর অধিষ্ঠান এই মন্দিরেই ছিল। পরে যখন মন্দির জলার গর্ভে চলে যায়, বাড়ির পিছনে নতুন মন্দির বানিয়ে বিগ্রহ সেখানে সরিয়ে নিয়ে যায় মজুমদার পরিবার। এখন এখানে পড়ে আছে শুধু ইটের স্তূপ আর ভারী ভারী থামের গায়ে গজানো বট-অশ্বত্থ-পাকুড় গাছের জঙ্গল। জোরে একটা শ্বাস নিল মাতঙ্গী। হাঁটু গেড়ে বসে মন্দিরের উঠোনের শ্যাওলার আস্তরণ সরিয়ে দেখল, পাথরে খোদাই করা একটা তিরচিহ্ন ঈশান কোণ নির্দেশ করছে। সেইদিকে জলার ঠিক মধ্যিখানে অন্ধকারে মগ্ন মৈনাকের চূড়ার মতো কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। যেতে হবে ওখানেই। কিন্তু পথে পায়ের তলায় পড়বে ক্ষুধার্ত সেই পাঁক। সেখানে পা পড়লেই আঁকড়ে ধরে, টেনে নিয়ে যায় পাঁকের পাতালে। কুমিরও আছে এই জলায়। কিন্তু সেসব বিপদ এখানোর উপায় আছে।

চোখ বুজে মাতঙ্গী দেবীর যন্ত্রের আকার স্মরণ করল ও। চারধারে চার সবুজ ঘাট। ভেতরে ষোলটি লাল পাঁপড়ি। তার ভেতরে আটটি বেগুনি পাঁপড়ি। তার ভেতরে আটটি লাল পাঁপড়ি। শেষমেশ যন্ত্রের মাঝখানে একটি লাল ত্রিভুজ। তার মানে— চার-ষোল-আট-আট-এক।

কিন্তু সেটাই তো সব নয়। মাতঙ্গী মন্ত্র, যেটা ঠাকুমা ছোটবেলায় শিখিয়েছিল, সেটা হলো, শ্যামাঙ্গীং, শশিশেখরাং, ত্রিনয়ণাং, রত্নসিংহসনস্থিতাম্, বেদৈর্বাহুদণ্ডৈঃ অসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম। তমোপ্রধানা শ্যামবর্ণা দেবী অর্ধচন্দ্রধারিণী ও ত্রিনেত্রা। তাঁর হাতে অসি, খেটক পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করে রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। দেবীর হাতে মায়ার বন্ধনরূপী পাশ অর্থাৎ ফাঁস রয়েছে, আবার পাশরূপী মায়াকে ছিন্ন করার জন্য অসিও রয়েছে। দেবীর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ চিত্তবৃত্তির

দমনের প্রতীক। খেটক বা চর্ম, অর্থাৎ ঢাল আঘাত নিবারণকারী, সহনশক্তির প্রতীক।

অসি, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ— দেবীর চার আয়ুধ। এর মধ্যে অসি ও পাশ রয়েছে বাম হাতে, অঙ্কুশ ও খেটক রয়েছে ডান হাতে। তার মানে কী দাঁড়াল? অসি হলো বাম, খেটক হলো ডান, পাশ হলো বাম আর খেটক হলো ডান। তার মানে বাম-ডান-বাম-ডান। চার-ষোল-আট-আট-এক। বাম-ডান-বাম-ডান। দুইয়ে মিলে কী দাঁড়াল? চার বাম, ষোল ডান, আট বাম, আট ডান, এক।

জলার মধ্যে ঈশান কোণ বরাবর চার পা সামনে গেল মাতঙ্গী, তারপর এক পা বাঁ দিকে। এরপর ষোলো পা সামনে, এক পা ডাইনে। আবার আট পা সামনে, এক পা বাঁয়ে। এরপর আট পা সামনে, এক পা ডাইনে। শেষে এক পা সামনে। প্রতি পদক্ষেপেই জলের নীচে পায়ের তলায় শক্ত পাথরের ভরসা পেল।

জলার নীচের পথ এখানেই শেষ।

একটা বড়ো লাফ দিল মাতঙ্গী। কাদা ছিটিয়ে শক্ত মাটিতে অবতরণ করল। চারপাশে অথৈ চোরা পাঁক, কিন্তু ঠিক এই জায়গাটার জলার নীচে লুকোনো ডাঙা আছে। ঠিক সামনে হাতের নাগালের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে জেগে আছে পিরামিডের আকৃতির একটা পাথর। এরকম অনেক পাথর ছড়িয়ে আছে এই জলায়, খাল আর নদীর পাড় জুড়ে। জোয়ারের সময় জলে ডুবে থাকে এই পাথরটা। এখন ভাঁটার টানে জল ধীরে ধীরে পিছোচ্ছে। তাই পাথরটা দেখা যাচ্ছে।

না, এখনও সময় হয়নি। আর একটু। আর বোধহয় পনেরো মিনিট।

হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে। পাথরের ভেতরে একটা গর্ত। কলকল করে জল নেমে যাচ্ছে সেই গর্ত থেকে। গর্তের মধ্যে খোদাই করা কালীমূর্তি দেখা যাচ্ছে। মা কালীর বিগ্রহের গলায় মুণ্ডমালা। পঞ্চাশটা নরমুণ্ড, বর্ণমালার পঞ্চাশটা অক্ষর। প্রতিটি করোটির কপালে খোদাই করা একটা অক্ষর। সিদ্ধম্ হরফে। মনে মনে ছোটবেলায় শেখা আরেকটা মন্ত্র স্মরণ করল মাতঙ্গী।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তোস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনত্যভিধীযতে।
নমস্তোস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ব, চ। তারপর। তারপর কী যেন!
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তোস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

বুদ্ধি। 'ব' অক্ষরের ওপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিল মাতঙ্গী। খুট্ করে শব্দ হলো।

তারপর?

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।

নিদ্রা। 'ন' অক্ষরের ওপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিল মাতঙ্গী। আবার খুট্ করে শব্দ।

বুদ্ধি, নিদ্রা। ব, ন।

এরপর ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি। ক্ষ, ছ, শ।

তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি। ত, ক্ষ, জ, ল, শ।

শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি। শ, ক, ল, ব, স।

দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি। দ, ত, ম, ভ।

শেষ অক্ষরটায় আঙ্গুলের ঠেলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দ করে কালীমূর্তি সমেত পাথরের এক স্তর সরে গেল একপাশে। পাথরের গর্ভে দেখা দিল এক গহ্বর। ব্রাহ্মমুহূর্তের ক্ষীণ আলোয় ঝকমক করে উঠল সেই গহ্বরে সঞ্চিত থরে থরে সাজিয়ে রাখা হীরে, জহরত, মণিমুক্তো। পাঁচশো বছর আগে, সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে সঞ্চিত রয়েছে এইসব ধনরত্ন। দেবীর গয়নাগুলো সেখানে রেখে দিল মাতঙ্গী। এগুলো এখন আর লাগবে না আপাতত। কালীমূর্তির পাথরের স্তরটাতে আলতো ঠেলা দিতেই বিগ্রহ এগিয়ে এসে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল।

জলা পেরিয়ে পুকুর। সাঁতরে পুকুরের অন্য পাড়ে। পুকুর ঘাট থেকে উঠে আসতে আসতে বাকি মন্ত্রটা উচ্চারণ করল মাতঙ্গী, মনে মনে।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভুতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ।।
চিতিরূপেণ যা কৃত্স্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

পূর্বজদের শেখানো মন্ত্র ভুলে গেলে পূর্বজদের গুপ্তধনের চাবিকাঠিও হারিয়ে যায়। এই দেশের লোকেরা সেটা জানে না।

বাধা

গাড়ির দুলুনিতে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। অনেক পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল শুভ্রর। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে দেখল, পূবের আকাশ থেকে বৃষ্টির মেঘ সরে গেছে। সিঁদুরের ছোঁয়া লেগেছে সেখানে। ফুরফুরে বাতাসে অদ্ভুত এক মাদকতাময় সুগন্ধ। ভিজে বুনো ফুলের গন্ধ। ডিমের কুসুমের মতো একটা সূর্য ধীরে ধীরে ধানখেত আর কাশফুলের সীমানা ছেড়ে আকাশে ভেসে উঠছে। যত ওপরে উঠছে, রং বদলাচ্ছে। সঙ্গে বদলাচ্ছে প্রকৃতির আবেশ, আকাশের রং। কালো অন্ধকার

থেকে ঘন নীল, ঘন নীল থেকে কালচে লাল। ধীরে ধীরে সেই লালে লাগল সোনার ছটা, সোনা-সিঁদুরে মাখামাখি আকাশে বান ডাকল গেরুয়া রঙের। চারপাশে ধানখেত জুড়ে থৈ-থৈ তরল সোনা। মাতঙ্গী গ্রাম আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। নদীর ওপরের ব্রিজটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল।

'আবার কী হলো?'— বিরক্ত শুভ্র প্রশ্ন করল।

'দ্যাখেন সার',— হতাশ ভঙ্গিতে বলল ড্রাইভার।

মিছিল বেরিয়েছে। হাইওয়েতে মাথার মেলা। অজানা কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে হাঁটছে অনেক লোক। সুর্মাপরা চোখে তাদের জান্তব প্রতিহিংসা। মুখে উর্দু স্লোগান। মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই। কাফেরদের মুণ্ডু চাই।

হতাশ শুভ্র বসে রইল গাড়িতে।

'সার',— বলল ড্রাইভার, 'বিরাট মিছিল। ঘণ্টাখানেকের আগে ছাড়া পামু না। তার চাইতে বরং এক কাজ করেন।'

'কী কাজ?'— প্রশ্ন করল শুভ্র।

'ওই দ্যাখেন, ওই চায়ের দোকানটায় একটা সাইকেল আছে। ওইটা নিয়া আলের পথ ধইর‍্যা চইলা যান। পনেরো মিনিটের মধ্যে গ্রামে পৌঁছাইয়া যাবেন।'— বলল ড্রাইভার।

কয়েক মিনিট ভাবল শুভ্র। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নামার সময় হাতে তুলে নিল সেই ছড়িটা, যেটা সেদিন মন্দিরে পেয়েছিল। চায়ের দোকানি সসম্ভ্রমে শুভ্রকে সাইকেল দিয়ে দিল, উর্দির মাহাত্ম্য এমনই। ঠিক তখনই শুভ্র খেয়াল করল, দোকানে এক কোণে ছোট্ট একটা টিভি চলছে। তাতে ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। কী মনে হলো, জিজ্ঞেস করল শুভ্র।

'টিভি কি ব্যাটারিতে চলছে?'

'না কত্তা,'— একগাল হেসে বলল দোকানি, 'আজ সক্কালেই কারেন্ট আইল।'

ঝড়ের গতিতে সাইকেল ছোটাল শুভ্র।

পাকা ধানের সোনালি গালিচার মধ্যে দিয়ে মেটে রঙের পথ চলে গেছে নাক বরাবর। তার ফাঁকে ফাঁকে তালগাছের সারি। আলের পথ ধরে এক বাউল হেঁটে আসছে এদিকেই। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, গেরুয়া ধুতি। হাতে একতারা। গান গাইছে।

মনের মানুষ রইল ঘরে, তারে খুঁইজা পাইলাম না।
মাঠে ঘাটে খুঁজি তারে, মনে তো কই খুঁজি না।
মনের মানুষ রইল ঘরে, তারে খুঁইজা পাইলাম না।
মানব জনম হইল বেকার, তারে খুঁইজা পাইলাম না।
সাগর পারে খুঁজি তারে, মনে তো কই খুঁজি না।
মানব জনম হইল বেকার, আলোর পানে তাকাইলাম না।
মিছা কথার ফান্দে পড়ি, আলোর পানে তাকাইলাম না।
আমি ঘরে পিদিম চিনলাম না,
পরের বাপেরে বাপ ঠাউরাইয়া,
নিজের মা-বাপেরে চিনলাম না।
গোলাম হইয়া রইয়া গেলাম, নাড়ির টান চিনলাম না,
নিজের ভালো বুঝলাম না।
মিছা কথার ফান্দে পড়ি, তারে খুঁইজা পাইলাম না।
পাগল, তারে খুঁইজা পাইলাম না।

শুভ্রর মনে হলো, চোখ দুটো জ্বালা করছে।

উৎসব

'ঢাক বাজে, ঢাক বাজে!'— এলোমেলো পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জহিরুল বুড়ো।

'কী ভুলভাল বকো!'— বলল আমিনা বিবি, জহিরুলের বউ, 'পাগল হইলা নাকি?'

'শুনতে পাও না?'— থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল জহিরুল, 'মজুমদার বাড়িতে ঢাক বাজে, আজ যে দেবীর বোধন।'

এই বলে স্খলিত পদক্ষেপে মজুমদার বাড়ির দিকে দৌড়াল বুড়ো। পেছন পেছন দৌড়াল জহিরুলের বউ আর ছেলে। বেরিয়ে দেখে, পথে অনেক মানুষের ভিড়। গ্রামের সীমান্তে ধানখেতের আল জুড়ে গেরুয়া রঙের বান ডেকেছে। সূর্য উঠছে। ঢাকের শব্দের গ্রামের ঘুম ভেঙেছে, গোটা মাতঙ্গী গ্রাম আজ আতঙ্ক ছেড়ে ফেলে দৌড়চ্ছে মজুমদার বাড়ির দিকে।

মজুমদার বাড়ি পৌঁছে অবাক হয়ে গেল শুভ্র।

কোথায় আগাছা? কোথায় মাকড়সার জাল? কোথায় ধুলো? সেদিনের সেই প্রেতপুরী আজ উৎসবে মেতে উঠেছে। শিউলি গাছ ফুলে ফুলে ভরে গেছে। শিশির ভেজা শিউলি ফুল যেন মায়ের জন্যই গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। বাগানে উনুন বানিয়ে বড়ো হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। ঠাকুরদালানে দশভুজা মা দুর্গা, সপরিবারে। সাথে দশ মহাবিদ্যা। কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, ধুমাবতী, ষোড়শী, কমলা, ভুবনেশ্বরী আর দেবী মাতঙ্গী। শেওলা-সবুজ বরণ দেবী মাতঙ্গী। কোঁকড়া কালো চুল পিঠ গড়িয়ে কোমরে নেমেছে। এক হাতে ঢাল, অন্যহাতে তরোয়াল। এক হাতে ফাঁস, অন্য হাতে ডাঙস। আজ বহুযুগ পরে দুর্গাপুজো হচ্ছে মাতঙ্গী গ্রামে। পুজো পাহারা দিচ্ছে ঢাল-তরোয়াল হাতে কৈবর্তরা। বহুদিন বাদে ওরা আজ জলাভূমির নির্বাসন থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদেরই মধ্যে একদল রামকৃষ্ণদেবের গান গাইছে, 'উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার, তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

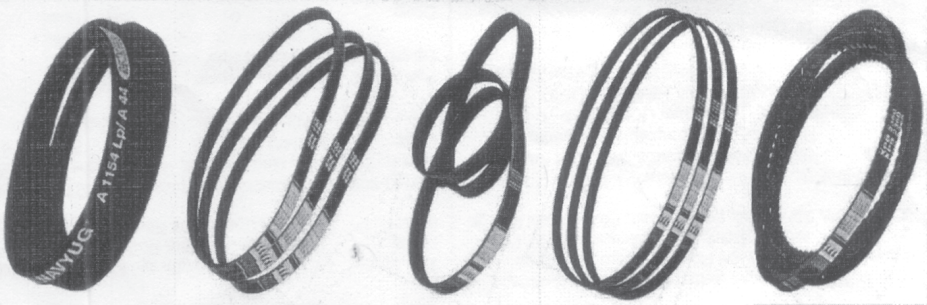

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL
IAF
RECOGNITION ARRANGEMENT

IS : 2494
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications
BSCIC
Private Limited.
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

ধরি...'।

গলার মধ্যে একদলা ব্যথা অনুভব করল শুভ্র। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দৃষ্টি ছাপসা হয়ে যাচ্ছে। ধুনোর ধোঁয়ার জন্য?

মা দুর্গার পায়ের সামনে রাখা আছে কৃষ্ণদাস স্টিভেন সাহেবের অটোমেটিক রাইফেল আর দুটো গ্লক পিস্তল। ফুল ছড়ানো আয়ুধের ওপর। সাহেব চেয়ারে বসে ফলপ্রসাদ খাচ্ছে। বেশ কয়েকজন গাট্টাগোট্টা যুবক গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখ গামছায় ঢাকা। পুজোর ব্যবস্থাপনা করছে কাশেমের বিধবা বউ মনোয়ারা, সাথে এই গ্রামেরই পাঁচ-ছজন মেয়ে। কোমরে তাদের গামছা বাঁধা, তাতে গোঁজা কাস্তে, দা। মা দুর্গার বোধনের মন্ত্র পড়ছেন অশীতিপর বৃদ্ধ আঞ্জুমান আজিজি সাগর। আজ তার পাশে তার চিরসঙ্গী ওয়াকিং স্টিকটা নেই। মা সিংহবাহিনী, তোমার শক্তি, তোমার বীর্য অনন্ত অপার। তুমিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জগৎপালন শক্তি। এই ব্রহ্মাণ্ডের তুমি আদির আদি মহামায়া। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছ, তুমি প্রসন্না হলে শরণাগত মুক্তি সিদ্ধি লাভ করে। শুভ্রর মনে হলো,— ওই সশস্ত্র কৈবর্তরা, স্টিভেন সাহেব, গাছপালার আড়ালে গাট্টাগোট্টা যুবকরা, মনোয়ারা আর তার সঙ্গিনীরা আর ওই বৃদ্ধ অঞ্জুমান আজিজি— এরা সবাই এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। এলোমেলো পায়ে শুভ্র গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধের সামনে।

'এসেছেন?'— বললেন বৃদ্ধ, 'একটু অপেক্ষা করুন। দেবীর বোধন হয়ে যাক। তারপর আপনার সাথে কথা বলব।'

একটা চেয়ার টেনে মণ্ডপে বসে পড়ল শুভ্র। ধূপের গন্ধ, ধুনোর গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, ফলপ্রসাদের গন্ধ। ছিম ধরে বসে রইল শুভ্র। দেহকোষের প্রতিটি কণায়, মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরোন জুড়ে বাজছে অতিন্দ্রীয় এক সংগীত। জেনেটিক মেমোরির স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুভ্রকে। ঢাক বাজছে। হাউ হাউ করে আজ কাঁদছে শুভ্র। জন্মান্তরের স্মৃতি আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরণন্তবীর্যা বিশ্বাস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবি সমস্তশেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-সিদ্ধিহেতুঃ।।

ওঁ হ্লীম্ এং শ্রীম্ শ্রী মাতঙ্গেশ্বরি নমঃ— শুভ্রর পূর্বপুরুষের সেই মন্ত্র। দাদির দেওয়া সিঁদুরমাখা রুপোর থালায় যেটা লেখা ছিল। মন্ত্রটা মাঝেমাঝেই সুর করে বলত ও, তখন ওর কিশোর বয়স। কিছু না ভেবেই। খবরটা উঠল স্কুলের আরবি শিক্ষকের কানে। দিনভর স্কুলের সামনে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। স্কুলের ছেলেরা এসে থুতু দিল, দুয়ো দিল, 'মালাউনের ছাওয়াল'। বদনাম একবার জুটলে পিছু ছাড়ে না। তারপর থেকে গোটা স্কুলজীবনটাই 'মালাউনের ছাওয়াল' নাম বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যত সহপাঠীরা টিটকিরি দিয়েছে, তত মন্ত্রটা মনের মধ্যে চেপে বসেছে।

হাউ হাউ করে কাঁদছে আজ শুভ্র।

দলে দলে গ্রামবাসী আসছে পুজোমণ্ডপে। আছড়ে পড়ছে দেবীর বেদীতে। কেউ কেউ আকাশে দিকে তাকিয়ে উপরওয়ালার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইছে, কেউ মায়ের মুখের দিকে তাগিয়ে আনন্দের অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে।

জাত খুইয়েছি বলে কি মাকে ভুলে যেতে হবে?

যুগ যুগান্তরের সম্মোহন আজ কেটেছে।

কে ও?

শুভ্র ও সাগর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছর মন্দিরের সামনে। ক'দিন আগেই এই জায়গাটা আগাছার জঙ্গলে ঢাকা ছিল। কে বলবে সেটা! আজ নবসাজে সেজে উঠেছে মজুমদার বাড়ি। থরে থরে জবা ফুটেছে আজ এখানে। গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, এত ফুল। পথ জুড়ে ছড়িয়ে আছে জবা ফুল, না জানি কোন সে দেবীর রাঙা পদস্পর্শের আকুল প্রতীক্ষায়। মাথা ঝিমঝিম করে এত রাঙা রঙের মাঝে। চোখে নেশা ধরে যায়। ওদের আসতে দেখে ছাই-রঙা একটা বুনোহাঁস ঠোঁট বাঁকিয়ে তেড়ে এল। বোধহয় মা-হাঁস। পেছনে একরাশ খুদে ছানাপোনা টলতে টলতে চলেছে। মাঝেমাঝে হোঁচট খেলে ডিগবাজি দিয়ে সামাল দিচ্ছে। মা-হাঁস আগলে রেখেছে দুষ্টু বাচ্চাগুলোকে। সম্ভ্রমে তাদের পথ ছেড়ে দিল শুভ্র। বিস্তর শোলগোল করে রাস্তা পার হয়ে তারা ঝাঁপ দিল জলে।

'এটা তো আপনার জিনিস!'— হাতের ছড়িটা দেখিয়ে বলল শুভ্র, 'পুকুরের মধ্যে ফেলে এসেছিলেন। এটা ছাড়া চলে ফিরে বেড়াতে অসুবিধা হচ্ছে না? তাছাড়া, জিনিসটা পুকুরের এত গভীরে গেল কী করে? আপনি কি পুকুরে নেমেছিলেন? আপনার এই অবস্থা নিয়ে? আর একটা ব্যাপার আপনাকে দেখাতে চাই, এই দেখুন।'

ছড়ির বাঘের মাথাটা প্যাঁচ দিয়ে খুলে ফেলল শুভ্র। মাথার পিছনটা দেখাল সাগরকে। সেখানে অদ্ভুত একটা মুখ খোদাই করা। কারো নারীমুখ, বড় বিস্ফারিত চোখ রক্তবর্ণ। কানদুটো অস্বাভাবিক বড়। বিরাট লম্বা জিভ, রক্তবর্ণ।

'এটা তো দেবী যশোরেশ্বরী কালীর মুখ',— বলল শুভ্র, 'তাই না? মহারাজ প্রতাপাদিত্যর উপাস্য দেবী। এই ছড়ি আপনার কাছে কী করে এল?'

'মহারাজ প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন? মনে আছে আপনার?'— হাত বাড়িয়ে ছড়ি আর তার মাথাটা নিয়ে শ্লেষের স্বরে বললেন সাগর সাহেব, 'আপনাদের এই দেশে তো সবাই মোগল-পাঠানদের বংশধর। যশোরের প্রতাপাদিত্যের রক্তের

উত্তরাধিকারী স্বীকার করতে আপনারা লজ্জা পান। মোগল-ঠ্যাঙানো প্রতাপ তো আপনাদের চক্ষুশূল। তার উপাস্য দেবীকে চিনলেন কী করে?'

'আপনি যে সৌরশক্তি নিয়ে কাজ করতে এখানে আসেননি'— বৃদ্ধের শ্লেষ উপেক্ষা করে বলল শুভ্র, 'সেটা বুঝেছি। পাসপোর্টটা কি নকল? কিন্তু খুব নিঁখুতভাবে নকল করা। কারণ, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আঞ্জমান আজিজি নামে সত্যিই একজন আমেরিকান নাগরিক আছে, যার জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। তার আইডেনটিটি কপি করেছেন আপনি? নাকি আপনি সত্যিই আঞ্জুমান আজিজি? জানি না। তবে এটা বুঝেছি, এই গ্রামের মৃত্যুগুলোর সঙ্গে আপনার যোগ আছে। ধরে নিচ্ছি, মজুমদার বাড়ির লোকগুলোর সঙ্গে আপনার একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল, তাই তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছেন আপনি। কিন্তু দেবী মাতঙ্গীর ছদ্মবেশে যে মেয়েটি একের পর এক খুন করছে, তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? মেয়েটির সাথে আপনার বেশ কিছু মিল রয়েছে। চোখের চাউনি, বাচনভঙ্গী। এমনকী আপনাদের দুজনের উচ্চতা, শরীরের গড়নেও মিল। ও কি আপনার মেয়ে? এরকম অস্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা মেয়েটি পেল কোথা থেকে? তাছাড়া, মার্ডার উইপনটা... কী ধরনের মেডিসিন ওটা? খুনগুলো একেবারে স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো দেখাচ্ছে কেন? ওষুধটা কি খুব দ্রুত রক্ত কণিকাগুলো ভেঙে দেয়? তারপর উইদাউট ট্রেস মিশে যায় রক্তের মধ্যে? কে আবিষ্কার করেছে এরকম ভয়ংকর বিষ?'

হঠাৎ করেই গলার স্বর বদলে গেল বৃদ্ধের।

'এখনও বুঝলেন না, মাতঙ্গী কে?'— শুভ্রকে চমকে দিয়ে কুঁজো থেকে সোজা হয়ে উঠলেন সাগর সাহেব। একটানে নিজের মুখ থেকে ছিঁড়ে ফেললেন রবারের মুখোশ, পরচুলা। — 'আমিই মাতঙ্গী'— অপার্থিব স্বরে বলল সেই পরামূর্তি, 'দেবীর নামে, গ্রামের নামে নাম রাখা হয়েছিল আমার। আমি মজুমদার বাড়ির ছোট মেয়ে, মাতঙ্গী মজুমদার।'

বিহ্বল শুভ্র দেখল, যেন বিস্মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে আদ্যাশক্তি স্বরূপা এক নারী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘদেহের বলিষ্ঠ কাঠামোতে ব্ল্যাক প্যান্থারের আদল। পানপাতার গড়নের মুখমণ্ডলীতে বঙ্গনারীর শ্যামল রূপের সাথে মিশে আছে তীব্র এক প্রখরতা। জ্বলন্ত চোখদুটোর দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। অবিন্যস্ত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পিঠের সীমান্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে কোমর জুড়ে। বজ্রের দৃঢ়তা, বাতাসের অদম্যতা, মাটির সংহতি, আগুনের উত্তাপ, জলের শৈত্য— প্রকৃতির সব শক্তি যেন একজোট হয়ে গড়েছে এই মেয়েকে। অসামান্য এই নারীকে দেখে মনে একটাই ভাব জাগে। ভয়াল এক সম্ভ্রম।

'চলি বন্ধু',— মেয়েটি বলল, 'পরে আবার হয়তো কখনো দেখা হবে আপনার সাথে।'

নড়বার সুযোগ দিল না মেয়েটি, তার আগেই ঝাঁপ দিল পুকুরে। সবুজ জলের মধ্যে ছোট্ট একটা আলোড়ন, তারপর সব চুপচাপ। কোথায় গেল? কোমরবন্ধ থেকে সার্ভিস রিভলবার বের করে পুকুরের দিকে তাক করল শুভ্র। ঠিক তখনই আকাশে অনেক উঁচুতে মৃদু খুরখুর শব্দ হলো। ছোট্ট এক টুকরো অন্ধকার বিদ্যুৎচমকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল শুভ্রর উদ্যত হাতের ওপর। ছোঁ মেরে রিভলবার ফেলে দিল জলে, তারপর উড়ে চলে গেল খালের দিকে। আর্তনাদ করে হাত চেপে ধরে হতভম্ব শুভ্র তাকিয়ে রইল পুকুরের দিকে। কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পুকুরের ঘাটে ধপ্ করে বলে পড়ল।

বাতাসে ধুনোর গন্ধ। তুলসীর গন্ধ। সাথে কি বেবি পাউডারের একটা ক্ষীণ গন্ধ মিশে আছে? বেশ কিছুক্ষণ পর, দূরে কোথাও একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল। অনেকটা টুলু পাম্প চালু হওয়ার মতো শব্দ। মজুমদার বাড়ির নাটমন্দিরে তখনও দেবীর বোধনের ঢাক বাজছে।

নিষ্ক্রমণ

দুই পাড়েই ঘন জঙ্গল, সুন্দরবন। জলের মধ্যে প্রায় ডুবে থেকে ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছে কালো রঙের ছোট্ট একটা কাঁচঢাকা নৌকো। একটু আগেই কালীর চর পার হয়েছে। স্টিয়ারিংয়ের আলতো মোচড়ে নৌকো ডানদিকে ঘোরালো সমীরণ। ইন্ডিয়ার সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

'কী ধরনের জলযান এটা?' — নৌকোর ড্যাসবোর্ড প্যানেলের ওপর স্নেহের হাত বোলাতে বোলাতে বলল মাতঙ্গী, 'গত কয়দিন সত্যিই খুব কাজে লেগেছে।'

'শী ইজ সামথিং, ইজন্ট শী?'— প্রচ্ছন্ন গর্বের সুরে বলল সমীরণ, 'কোড নেম— মকর। ইন্ডিয়ান ন্যাভাল ভেসেল। উভচর। স্পেশ্যালাইজড ফর রিভারাইন টেরেইন, সুন্দরবনের মতো নদীনালার এলাকায় কোভার্ট অরারেশন চালানোর জন্যই তৈরি হয়েছে। গ্র্যাফিন আর্মার, ধাতুর বদলে কার্বন ন্যানো ফাইবার দিয়ে তৈরি। রেডারে ধরা পড়ে না। জলের কয়েক ইঞ্চি নীচ দিয়ে যায়। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। হাইড্রো পাওয়ারড, জলের শক্তিতে চলে। বডি কুমিরের চামড়ার মতো দেখতে। কেউ যদি এখন আমাদের দেখে, ভাববে একটা অতিকায় কুমির অবিশ্বাস্য গতিবেগে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে।'

'সুন্দর'— প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল মাতঙ্গী, 'এরকম

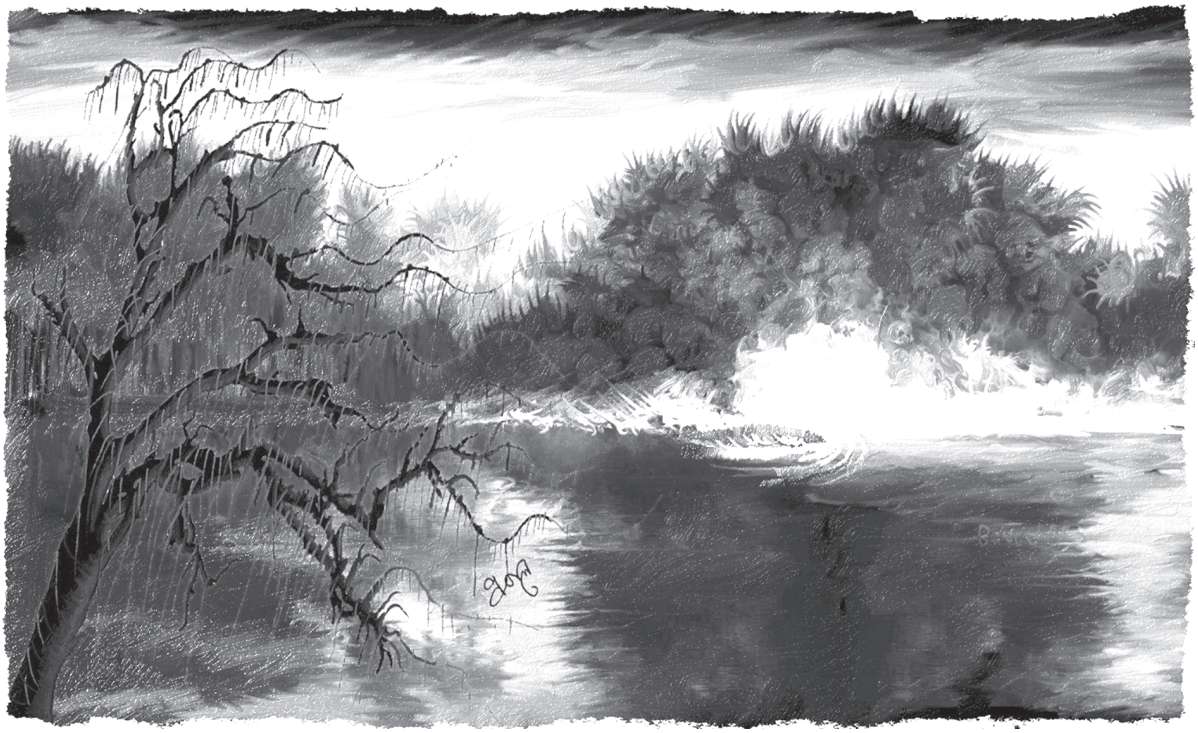

একটা নৌকো পেলে খুব সুবিধা হয় আমার।'

'একটা কথা সত্যি করে বলবেন?'— বলল সমীরণ, 'আপনি কি সত্যি টি এস ডি-র এজেন্ট? তার মানে, টি এস ডি সত্যিই একজিস্ট করে?'

কোনো উত্তর দিল না মাতঙ্গী।

'গ্রামের লোকেদের ভূতের ভয় দেখাতেন কী করে?'— আবার প্রশ্ন করল সমীরণ, 'এই ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারিনি। আপনার এই ড্রোন থেকে কি হলোগ্রাফিক প্রজেকশন করা যায়? সিনেমার প্রজেকশনের মতো, কিন্তু ত্রিমাত্রিক? নাকি আপনি সত্যিই তন্ত্রসিদ্ধ? ভূতপ্রেত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান?'

এই কথারও কোনো উত্তর দিল না মাতঙ্গী।

'ফিরে গিয়ে কী করবেন?'— আবার প্রশ্ন করল সমীরণ, 'রোগ এজেন্ট আপনি? এনকোয়ারি কিন্তু হবে। কী বলবেন সেখানে?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মাতঙ্গী মজুমদার ওরফে এম-সেভেন। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'সেলিব্রেট ওয়েস্ট বেঙ্গল, রিক্লেম ইস্ট বেঙ্গল।'

'অ্যাঁ!'— বলল সমীরণ, 'কিছু বললেন? শুনতে পেলাম না।'

'এনকোয়ারির মুখোমুখি হবো,'— বলল মাতঙ্গী, 'তারপর ভাবছি, রিজাইন করবো। পুরনো চাকরিতে আর ফিরব না।'

'তাহলে কী করবেন?'— জিজ্ঞেস করল সমীরণ।

'ভাবছি, গত কয়েকদিন যা করলাম, সেটাই চালিয়ে যাব। একা আমিই তো অত্যাচারের শিকার নই। এদেশে আরও লক্ষ লক্ষ মাতঙ্গী রয়েছে, তাদের ইতিহাস রয়েছে।'

'চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত?'— বলল সমীরণ।

'এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না,'— বলল মাতঙ্গী, 'এই দেশটা বড়ো সুন্দর। এদেশের মানুষ সরল, অতিথিবৎসল। কিন্তু এদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা নরকের কীটের অধম। অনেক নরপশু আছে এই সুন্দরী দেশটাতে। এতদিন তারা নির্ভয়ে তাদের কাজ করে গেছে। তাদের মনে ভয়ের জন্ম দেওয়া সময় এসেছে। একটা বার্তা পাঠাতে হবে প্রতিটি নরপিশাচকে। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

'আপনি একা কতজন মাতঙ্গীর হয়ে প্রতিশোধ নেবেন?'

'আজ আমি একা। কিন্তু কে বলতে পারে, আগামীকাল কী হবে!'

'তাহলে আপনাকে বলি,'— গম্ভীর স্বরে বলল সমীরণ, 'আমিও ছিন্নমূল পরিবারের। এই দেশটার সাথে আমার নাড়ির টান। যখন এখানে চাকরি নিয়ে এলাম, তখন দেখলাম, হিন্দুর সংখ্যা এই খণ্ডিত মুলুকে চল্লিশ থেকে কমে সাত শতাংশ হয়েছে। মামুদ-ঘোরি মার্কা অত্যাচারের তবু বিরাম নেই। এদেশের পথেঘাটে যখন ঘুরে বেড়াই, অনেককেই দেখতে পাই, যারা আমার মতো পরিবারগুলোর ছিন্নমূল দশার জন্য দায়ী। আমি কি করি জানেন? উদয়াস্ত সেই লোকগুলোর সাথে দেঁতো হাসি হেসে হ্যান্ডশেক করি। তারপর আড়ালে গিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঘষি দুই হাতে। ঘেন্না করে নিজের ওপর। এর

উল্টোদিকে আছে ভারতের অধিকাংশ মানুষ। তারা স্টেটক্রাফট্ বোঝে না। চাণক্যনীতি বোঝে না। তারা শুধু বকবক করতে ওস্তাদ। তাদের সঙ্গও ভালো লাগে না আর। আমি আপনার সাথে আছি। চলুন, কিছু একটা করি। আচার্য যদুনাথ সরকারের স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলি।'

দূর আকাশের কোলে একটা উল্কা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তীরবেগে উড়ে গেল। প্রাণ উজাড় করে জ্বলে উঠল দপ্ করে। তারপর চিরতরে মিলিয়ে গেল সাঁঝের আঁধারে।

পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যা নামছে। ভারতের পতাকা উড়ছে সেখানে।

ওখানেই আছে পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিরোধের বঙ্গ, প্রতিশোধের বঙ্গ।

দেবীশক্তির বোধনের বঙ্গ।

(সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনি, বাস্তবের সাথে মিল একান্তই কাকতলীয়)

With Best Compliments from -

Mr. Vishal Dada

Gen. Secretary,

Jalandhar

Laghu Udyog Bharati

Punjab

M; 9878569111

With Best Compliments from -

IRAVATI INDUSTRIES

11- Bhagwan Mahavir Industrial Complex

ADJ. Industrial Sheds

Focal Point
Jalandhar
(PB.) India

ছদ্মবেশ

পার্থসারথি গুহ

'ম্যাম, মিস্টার মুখার্জির কেস রিপোর্টের ফাইলটা নিয়ে একটিবার আমার রুমে আসুন তো।' ইন্টারকমে নার্সকে নির্দেশ দিয়ে ল্যাপটপে মনোনিবেশ করেছে ডাক্তার সরকার। ভাইরাসটা খুব নাছোড়বান্দা। আর ততোধিক ছোঁয়াচে। তা বলে ডাক্তারবাবুরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া জুড়েই তো কত রিসার্চ চলছে এই রোগকে বাগে আনার।

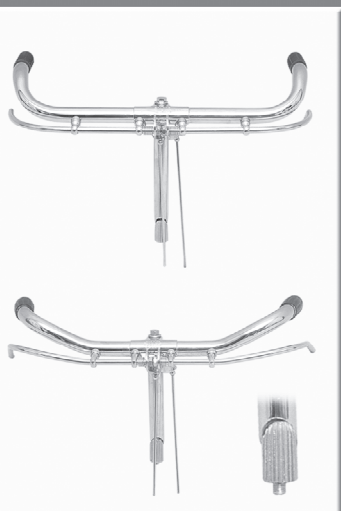

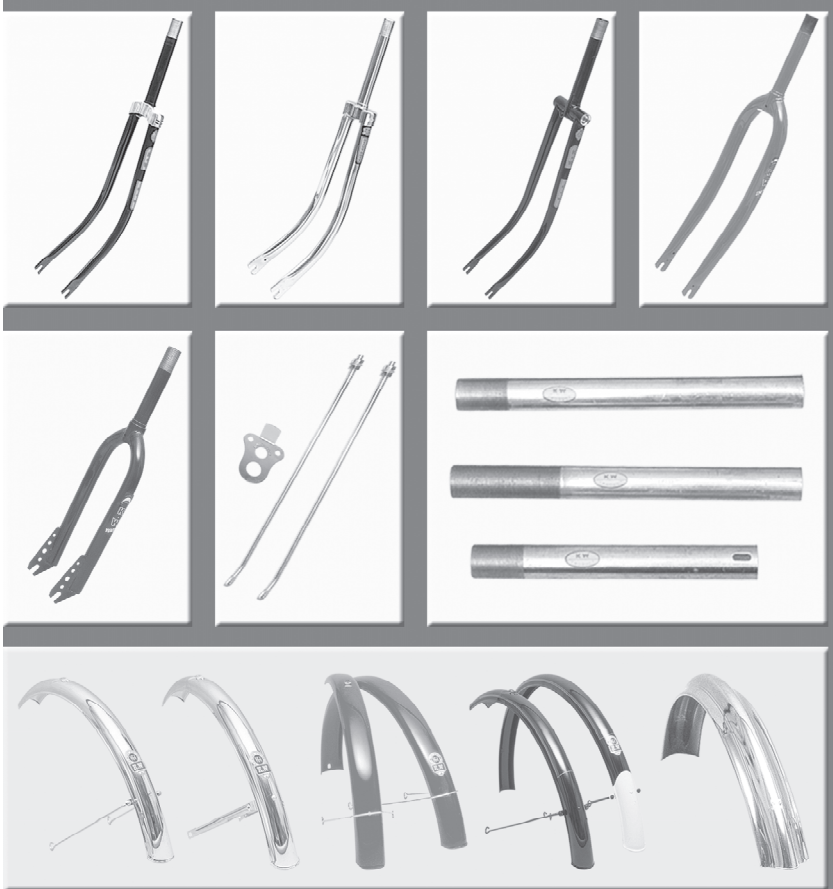

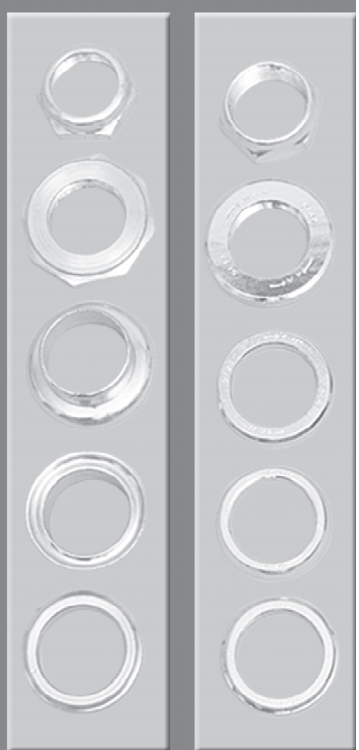

K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

ডা: সৌহার্দ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রৌঢ় মানুষটিকে বাঁচাতে। দু'দিন আগে জ্বর আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে অসীম মুখার্জি নামের এই ভদ্রলোক ভর্তি হয়েছেন এই জেলা হাসপাতালে। সেই শ্বাসকষ্টই আজ প্রবল হয়ে উঠেছে। অসীমবাবুকে হয়তো বিকেলের মধ্যেই ভেন্টিলেশনে দিতে হবে। তারই তোড়জোড় চলছে। সৌহার্দ্যকে যারপরনাই অ্যাসিস্ট করছে তৃণা। নার্স তৃণা মুখার্জি।

সৌহার্দ্যর যে মেধা আর ডিগ্রি, তাতে অনায়াসে জায়গা পেত কলকাতার কোনো বড়ো নার্সিংহোমে। কিংবা বিদেশেও পাড়ি জমাতে পারত। কিন্তু কখনোই তার মনে হয়নি পাশ্চাত্যে সেটল্ করার কথা।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস করার পর এমডি করতে জার্মানিতে গিয়েছিল সৌহার্দ্য। ওদের দেশের নিয়মশৃঙ্খলা, অনুশাসন, সুখসমৃদ্ধি দেখে হাহাকার করত, আহারে, আমাদের দেশটা কবে এমন হবে!

ওর অনেক ব্যাচমেটই ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু সৌহার্দ্য ফিরে এসেছে নিজের দেশে। নিজের রাজ্যে। সর্বোপরি নিজের জেলায়। তাও বছর খানেক হলো প্র্যাকটিস করছে জেলা হাসপাতালে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়েছে তার সুখ্যাতি। সিনিয়র ডাক্তারবাবুরাও কোনো সমস্যায় পড়লে সৌহার্দ্যর সাহায্য নেন। উত্তরবঙ্গের একেবারে শেষপ্রান্তের এই জেলা হাসপাতাল আজ অন্য মাত্রা পেয়েছে সৌহার্দ্যর মতো এরকম এক বিদেশ ফেরত কৃতী চিকিৎসক পেয়ে।

'স্যার, এই মিস্টার মুখার্জির রিপোর্টটা। আমি তাহলে ওনার কাছে যাই একবার।'— তৃণার ডাকে হুঁশ ফিরল সৌহার্দ্যর।

'কিন্তু তার আগে লাঞ্চটা সেরে নিন। এত বেলা হয়ে গেল।'

'সে আমার অভ্যাস আছে। তাছাড়া... তাছাড়া....।'

'তাছাড়া কী মিস মুখার্জি?'— তৃণাকে ইতস্তত করতে দেখে ফের সরব ডাক্তার সৌহার্দ্য।

'আপনিও তো এখনও লাঞ্চ করেননি। তাই বলছিলাম, আপনিও খেয়ে নিন।'— স্মিত হেসে বলল তৃণা। হাসলে ওর গালে খুব সুন্দর একটা টোল পড়ে। আর চোখ দুটোও বড্ড মায়াবি। ডানাকাটা পরি না হলেও অসম্ভব লালিত্যে পরিপূর্ণ। সে ভাইরাস আতঙ্কে মুখা যতই ঢাকা থাক না কেন।

'যাচ্ছি। কিন্তু আপনিও আর দেরি করবেন না। যান, এখুনি লাঞ্চটা সেরে নিন।'— ডাক্তারবাবুর কথায় আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। তার সঙ্গে একটা অসম্ভব অধিকারবোধও যেন জুড়ে আছে।

ডাক্তার না হলে সিনেমার হিরো হতো নির্ঘাত। যেমন লম্বা-চওড়া সুঠাম চেহারা, ততটাই সুন্দর মুখশ্রী। চোখ দুটো যেন নতুন স্বপ্নের দিশা দেখাচ্ছে প্রতিনিয়ত। পাতলা লাল ঠোঁট মনে করায় আমির খানের মতো ক্যাডবেরি নায়ককে। অবশ্য সেই আকর্ষণীয় ঠোঁট ওর ঘরে ঢুকলে তবেই দেখা যায়। করোনা আবহে পিপিই পরিহিত থাকতে হয় সর্বদা। নাকও ততটাই টিকালো। চোখে সরু গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা।

ভাবতে ভালোই লাগল তৃণার। মুখে অবশ্য বলল, 'যাচ্ছি স্যার।'

মারণ ভাইরাসের সঙ্গে প্রবল এই লড়াইয়ের আবহে তৃণা মুখার্জিও একজন ফ্রন্ট লাইনার। সবেমাত্র নার্সিং পাশ করে চাকরিটা পেয়েছে। তৃণার বাড়ি হাওড়ার বালিতে। কোচবিহারে যেতে হবে শুনে ও অবশ্য খুশিই হয়েছিল। আসলে বালির এই বাড়িটা তৃণার মামার বাড়ি। মা চলে যাওয়ার পর এই বাড়ির প্রতি সেই অর্থে কোনো আকর্ষণই ছিল না তার।

কোন ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে মামার বাড়ি চলে আসা। দুই মামা, দুই মামি আর তাঁদের পাঁচ ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও কখনোই তা সাবলীল ছিল না। এই বাড়িতে একমাত্র বড়মামা চেয়েছেন বলেই তৃণা পড়াশুনা করতে পেরেছে। তার জন্য ওর মাকে অবশ্য মামিদের অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে।

তাও মেয়েকে মানুষ করে তোলার জন্য সেসব মুখ বুজে মেনে নিয়েছে দীপশিখা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো পাশে থেকেছেন বড়দা সুকুমার সেন। বারবার আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'বোন, একটু সবুর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

একদিন সেই সেনবাড়ি থেকেই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিল দীপশিখা। চালচুলোহীন টিউশন পড়ানো এক মাস্টারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুতেই মানতে পারেননি ওর বাবা-মা।

বড়দা অবশ্য বলেছিলেন, 'ছেলেটা খারাপ নয়। মেনে নাও না ওদের সম্পর্কটা।'

কিন্তু রাশভারী সুশোভন বড়ো ছেলের কথায় পাত্তা না দিয়ে বলেছেন, 'এরকম একটা দু-পয়সার ছাত্র পড়ানো ছেলে কিনা সেন বংশের জামাই হবে? তোর কোনো আক্কেল নেই রে বাবু?'

ব্যস। ওইদিনই মিটে গিয়েছিল যাবতীয় ওজর আপত্তি। দীপশিখাও বুঝে গিয়েছিল, সেন বাড়িতে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। নতুন জীবনের স্বপ্নে ভরপুর দীপশিখা আর দেরি করেনি। বড়দার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মনের মানুষের সঙ্গে।

ঘর বেঁধেছিল হুগলী জেলার

চন্দননগর শহরে। একটা ছোটখাটো টিউটোরিয়াল হোম খুলেছিল ওরা। বাপ্পাদিত্য মুখার্জি মানে ওর স্বামী অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়াতো। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির পাশাপাশি ইংরেজিও পড়াতো সে। প্রথমদিকে দীপশিখাও বাংলা আর ইতিহাস দেখিয়ে দিত টিউটোরিয়ালের ছাত্র-ছাত্রীদের।

নিজের পড়ানোর চেয়েও বাপ্পার পড়ানো দেখতে ভারী লাগত দীপশিখার। রান্নাবান্না বা অন্য কাজকর্ম চলত পাশের একচিলতে ঘরে। সেখান থেকেই স্বামীর পড়ানোয় কান পাততে দীপশিক্ষা। আহা! বাপ্পাদিত্য কী সুন্দর পড়াতো। কঠিন অঙ্ক জলবৎ তরলং করে দেওয়া তো ওর বাঁ হাতের খেল। শেলি, কিটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতা বোঝানোর ক্ষেত্রেও কী প্রাণবন্ত!

বছর ঘুরতে না ঘুরতে তৃণা এল ওদের সংসারে। মেয়েকে বড্ড ভালোবাসত বাপ্পাদিত্য। সারাদিন টিউশন করার পরেও মেয়েকে সঙ্গ দিত। একটুও ক্লান্ত হতো না। বেশ কাটছিল সেই সময়টা।

তারপর হটাৎ করেই কালো মেঘের ঘনঘটা ঘনিয়ে এল ওদের সুখের সংসারে। কানাঘুষো চলছিলই। কিন্তু সেটা যে এতদূর গড়াবে ভাবতেই পারেনি দীপশিখা।

উচ্চমাধ্যমিক ব্যাচে পড়তে আসতো একটি মেয়ে। নাম যুথিকা বোস। বড়লোকের দেমাকি মেয়ে। তেমনই উগ্র সাজগোজ। দেখতে মোটেই আহামরি নয়। কিন্তু প্রসাধনের প্রলেপে খামতি নেই। যেদিন প্রথম এল ক্লাস করতে, সেদিনই ওর ঢলানিপনা পছন্দ হয়নি দীপশিখার।

'কী অসভ্য মেয়ে রে বাবা! এত মেয়ে তো পড়তে আসে, কই কেউ তো এমন স্যারের কাছ ঘেষে না।'— রাতে মেয়ে ঘুমোনোর পর স্বামীর কাছে আহ্লাদের সুরে অনুযোগ করেছিল দীপশিখা।

'ও এইবার বুঝতে পারলাম, আমার শিখারানির কেন এত গোঁসা হয়েছে। তৃণার চেয়েও ছেলেমানুষ তুমি।'— বলে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল মিস্টার পতিদেব।

কিন্তু দিন দিন সে মেয়ের অসভ্যতা বাড়তে লাগল। একদিন তো ওদের রান্নাঘরে গিয়ে দীপশিখাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে চা করতে উদ্যত হলো যুথিকা। সেদিন আরেকটু হলেই ওকে একটা চড় কষিয়ে দিত দীপশিখা। গজগজ করে বলল, 'একটুও ম্যানার্স জানো না। দুম করে কারো রান্নাঘরে এভাবে ঢুকে পড়া যায় নাকি?'

'আলবাত যায়। আপনি সকালে এমন অখাদ্য চা বানিয়েছেন যে স্যারের পড়ানোর মুডটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রিয় ছাত্রী হিসেবে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি? নিন। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। চ-টা বানাতে দিন জুতসই করে।'

এরপর আর কিছু বলতে পারেনি দীপশিখা। একবার যুথিকার দিকে তাকিয়েছে তো পরক্ষণে পর্দা সরিয়ে স্বামীর দিকে দেখেছে ছলছল চোখে।

দেখে মনেই হয়নি, সেখানে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। একমনে ব্যাচ পড়িয়ে যাচ্ছে বাপ্পাদিত্য।

সেদিন রাতে আর চুপ থাকতে পারেনি দীপশিখা।

'কী গো তুমি! প্রশ্রয় দিয়ে একেবারে মাথায় তুলছ?'

বাপ্পাদিত্যর কোনো তাপউত্তাপ নেই। একমনে একটা বই পড়ে যাচ্ছে। রাগের চোটে বইটা টেনে ফেলে দিয়েছে দীপশিখা। তারপর আবারও গর্জে উঠেছে। 'এই শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি, ওই মেয়েকে আর আশকারা দিও না।'

'কেন? কি হয়েছেটা কী? একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে এত রিঅ্যাক্ট করছ কেন?'— উল্টো রাগ দেখিয়েছে বাপ্পাদিত্য।

যে মানুষটা বিয়ের পর কোনোদিন তার সঙ্গে সামান্য উঁচু স্বরেও কথা বলেনি, তার এই পরিবর্তন দেখে দীপশিখা অবাক!

এরপর যা হয়। যুথিকাকে নিয়ে উত্তরোত্তর ওদের ঝামেলা অশান্তি লেগেই থেকেছে। পাড়ার কানভারী করার কয়েকজন মাসিমা, পিসিমা, বউদি গোছের মহিলারাও পুরোদমে আসরে নেমে পড়ে। তাঁদের মুখ থেকেই দীপশিখা একদিন শুনেছে যুথিকাকে নিয়ে তার কর্তা নাকি হাসিহাসি মুখ করে সিনেমা হলে গিয়েছে।

সেদিন রাতে বরকে আলটিমেটাম দিয়েছে দীপশিখা, 'হয় যুথিকা, নয় আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও।'

বাপ্পাদিত্য অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে। বলেছে, আরে বোঝ না কেন। এইসব উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার পাশাপাশি অন্যভাবে বুস্টআপ করতে হয়। তাছাড়া আমি ওদের কথা দিয়েছিলাম, একটা ট্রিট দেব। সিনেমা দেখাব। তোমায় এসে বলতামই।'

আর এসে বলা! এরপরের ঘটনা দ্রুত এগিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে বছর দেড়েকের তৃণাকে বগলদাবা করে বালির বাড়িতে ফিরে এসেছে দীপশিখা। বড়দা সঙ্গে থাকায় বাবা আর ফেলে দিতে পারেননি। তবে এই প্রত্যাবর্তন যে খুব সুখকর হবে না ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন বউদিরা। মা প্রয়াত হওয়ায় দীপশিখা পাশে হোমফ্রন্ট থেকে দাঁড়াবার কেউ ছিলও না।

বাপ্পাদিত্য একবার এসেছিল বউ-মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেদিন ওর সঙ্গে দেখা করেনি দীপশিখা। নিজের জেদ বজায় রেখেছে। মেয়েকেও দেখতে দেয়নি। বড়দার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে বিদায় নিয়েছে বাপ্পাদিত্য। দীপশিখার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল বাপ্পা আবার সংসার পাতবে। আছে তো ওই বেহায়া মেয়েটা। যুথিকা।

তবে তার জন্য নিদেনপক্ষে যে ডিভোর্সের প্রয়োজন হয় তেমন কোনো চিঠি কিন্তু বাপ্পাদিত্য পাঠায়নি। তবে কী আইনের তোয়াক্কা না করেই... সে যাক গে। যাই করুক। আমার তাতে কী! ভেবে চুপ হয়ে গিয়েছে দীপশিখা। তাও কি সত্যিই ভুলতে পেরেছে? ওই যে বলে না প্রথম প্রেম। মায় আবার বিয়ে করা স্বামী। হোক সে বিয়ে মন্দিরে। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখেই তো একদিন সিঁদুর পরিয়েছিল।

মেয়ে বড়ো হওয়ার পর দীপশিখা সবকিছুই খুলে বলেছিল। এও স্পষ্ট করেছিল, ভবিষ্যতে যেন ও ওর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ না করে। তবে তৃণার খুব দেখতে ইচ্ছে করতো বাবাকে। কিন্তু, মায়ের প্রবল আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি। বাবার একটা ছবি পর্যন্ত রাখেনি মা।

ভিতরে ভিতরে সে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। যেদিন রাতে বাড়িতে এসে শুনল মায়ের ধুম জ্বর, সেদিন তৃণা ছুটে গিয়েছে বড়মামার ঘরে। বড়মামি, দাদারা কথা শোনালেও গ্রাহ্য করেনি। শেষপর্যন্ত পরিচিত এক ডাক্তারবাবুর সাহায্যে মাকে গভীর রাতে ভর্তি করেছে একটি সরকারি হাসপাতালে। বড়মামাও সঙ্গে গিয়েছেন।

কিন্তু, চিকিৎকদের সেভাবে সুযোগ দেয়নি দীপশিখা। টেস্ট রিপোর্ট জানিয়েছে, ওর ক্যানসার। এবং সেটা একদম শেষ স্টেজ। হাসপাতালে মাত্র দিনতিনেক বেঁচে ছিল। শেষসময় এক সহৃদয় নার্সের সৌজন্যে মায়ের কাছে যেতে পেরেছিল তৃণা। মুখে অক্সিজেন, সারা শরীর জুড়ে নানা চ্যানেল তখন মায়ের শেষশয্যা তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু, এই অবস্থাতেও ওর মাথায় হাত দিয়েছে দীপশিখা। অস্ফুট স্বরে বলেছে, ‘পারলে বাবাকে খুঁজে বের করো।’ যে দীপশিখা এতদিন স্বামীর কথা মুখে পর্যন্ত আনতে চাইত না, শেষ মুহূর্তে তার এই পরিবর্তন অবাক করেছে তৃণাকেও। ভেবেছে মানুষ শেষ অবস্থায় হয়তো এমনই করে।

কিন্তু, ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে কীভাবে খুঁজে বের করবে? তিনি এখন কোথায় তাও তো জানে না তৃণা। মাস্টারি করত। মায়ের সঙ্গে সংসার পেতেছিল চন্দননগরে। এর বাইরে আর তো কিছু জানা নেই।

মা চলে যাওয়ার পর দাঁতে দাঁত চেপে নার্সিং ট্রেনিং কমপ্লিট করেছে তৃণা। আর প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে মামাবাড়ির সেই বন্ধ খাঁচা থেকে। তৃণা চলে যাওয়ায় ওরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। একমাত্র বড়মামার মনটা খাঁ-খাঁ করছে আদরের ভাগ্নির জন্য। তাও চলে আসার সময় বড়মামা আশীর্বাদ করে বলেছেন, ‘সুখী হও মা। অনেক বড়ো হও।’

‘ম্যাম, চলুন ফিরবেন না?’ টোটোওয়ালার ডাকে সংবিৎ ফিরল। অল্পবয়সি রাজবংশী ছেলে মৃণাল। কোচবিহার শহরটি যেমন সুন্দর, সাজানো গোছানো, তেমনই মৃণাল ছেলেটিও দারুণ প্রাণবন্ত আর সরল। এই দিদিটাকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিয়েছে মৃণাল।

ঘণ্টাদুয়েকের জন্য ভাড়ার বাসায় ফেরা। একটু স্নান করে ফ্রেশ হয়ে আবার সেকেন্ড শিফ্‌টে ফিরবে তৃণা। করোনাকালে পুরো চিকিৎসা পরিষেবাতেই সেভাবে কোনো ছাড় নেই। তাছাড়া ডক্তারবাবুরাও তো কত পরিশ্রম করছেন। তৃণা বেশিদিন জয়েন না করলেও ওর নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার গুণে নার্সিং বিভাগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ওদের মেট্রন পায়েলদি সেকথা বলেন বারবার।

আরও একটা কথা তো বলতেই হবে। ডাক্তার সৌহার্দ্য সবসময় যেন তার সঙ্গ চায়। এটা নিয়ে দু-একজন নার্স ফুসুরফাসুর করে সেটাও জানে তৃণা। কিন্তু, ডাক্তার সরকার যেন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তৃণাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

‘ম্যাম, একটু চলে আসন তো সারি ওয়ার্ডে’।

‘ওখানে তো সীমাদি আছেন, স্যার।’

‘সো হোয়াট। এই কেসটার ক্ষেত্রে আপনার থাকাটা ডাক্তার হিসাবে বেশি শ্রেয় মনে করছি আমি।’— এর ওপর আর কি কোনো কথা হয়!

এটা ঠিক তৃণার মতো দক্ষ নার্স এই হাসপাতালে নেই। তা বলে সবক্ষেত্রেই ওকে ডাকতে হবে? ভেবে অদ্ভুত রকম একটা ফিলিংস হয়। তার মধ্যে যেমন ভালোবাসা আছে, তেমনই রয়েছে অভিমানও। আজ তো এত ডেকে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু, আসল সময়ে সঙ্গে থাকবেন? ভেবে আবার নিজেকেই তিরস্কারের পালা— ‘কী না কী ভেবে বসে আছি। তাঁর তো বয়েই গিয়েছে।’

সাতপাঁচ ভাবনার মধ্যে মৃণালের টোটো রথ তৃণার বর্তমান আবাসের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু, নিজের রুমে যাওয়ার আগেই দেখা গেল বাড়িওয়ালা কাকু বিজয় রক্ষিত হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন। সঙ্গে পাড়ার আরও ৪-৫ জনকে দেখা যাচ্ছে। পাড়ার এক মুখরা মহিলাও আছে সেই দলে।

With Best Compliments from -

JRM

SHAH INTERNATIONAL

Manufacturer & Exporter of

BICYCLES, SPARE PARTS & LIGHT ENGINEERING GOODS

Village - Bholapur, Near Bonn Bread,
Chandigarh Road, Ludhiana - 141015 (Punjab)
E-mail : impex.shahgroup@gmail.com

‘কী ব্যাপার মেসোমশাই? কিছু হয়েছে?’—স্বাভাবিক কৌতূহলে মুখ খুলেছে তৃণা।

‘হয়নি। তবে হতে কতক্ষণ!’— সরব হয়েছে মুখরা মহিলাটি।

‘বুঝতে পারলাম না মাসিমা। ঠিক কী বলতে চাইছেন? মেসোমশাই কিছু বলুন প্লিজ।’

‘তোমাকে তো আর আমার এখানে রাখতে পারছি না।’— ইতস্তত করতে করতে এবার মোক্ষম কথাটা পেড়েছেন বিজয় রক্ষিত।

‘মানে! আমি কী অন্যায় করলাম? তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো এগারো মাসের চুক্তি। আপনি তো আবার বললেন, তোমার সঙ্গে চুক্তিটা আরও বাড়াতেই হতো।’

‘সে বলেছিলাম। কিন্তু তখন কী আর জানতাম?’

‘আপনি তো প্রথম থেকেই জানতেন আমি পেশায় নার্স। সরকারি হাসপাতালে চাকরি করি।’

‘সেসব তো ঠিক আছে। কিন্তু তখন তো আর জানতাম না এতো গ্যাঁড়াকলের একটা রোগ নিয়ে কারবার তোমার।’— বিজয় রক্ষিত ক্রমশ রূঢ় হচ্ছেন।

‘গ্যাঁড়াকলের রোগ? কী বলছেন মেসোমশাই? আপনার মতো সজ্জন মানুষ এমন কথা বলছেন?’— তখনও বাড়িওয়ালার ওপর থেকে ঠিক বিশ্বাসটা কমেনি তৃণার।

‘তা বাপু, গ্যাঁড়াকল না তো কী? একটা মহামারী এত লোক মারছে। আর সেই রোগ নিয়ে তোমার নাড়াচাড়া’— মুখর হয়েছে মুখরা মাসিমা।

‘আমি তো হাসপাতালের একজন নার্স। আমার মতো বহু নার্স এবং ডাক্তার অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন মানুষকে এই মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে। এতে নাড়াচাড়ার কী হলো মাসিমা? তাছাড়া আমরা তো সবরকম সুরক্ষা নিয়েই কাজ করছি।’

‘সে তোমাদের ওই ছাতার ড্রেস দেখে আমাদের তো কিছু হবে না। আমরা বাপু ছেলেপুলে, নাতি নাতনি নিয়ে এপাড়ায় থাকি। আজ তোমার থেকে যদি সেই সর্বনেশে রোগ এসে ছড়িয়ে পড়ে? তখন কী করব আমরা?’

মুখরা মাসিমার সমর্থনে ঘাড় নাড়তে দেখা গেল সবাইকে। কাকতলীয়ভাবে বিজয় রক্ষিতের মাস্কটাও খুলে পড়েছে থুতনির কাছে।

কোভিড বিধি মেনে চলার ন্যূনতম বালাই অবশ্য এদের কারও মধ্যেই নেই। কেউ কোনোরকমে একটা মাস্ক পরেছে কী পরেনি। কেউ আবার রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকেছে। মুখরা মাসিমার অবস্থা আরও খারাপ। শাড়ির আঁচল দিয়ে কোনোরকমে তাপ্পি দিয়ে দেখেছে। তৃণার সঙ্গে কথা বলার সময় সোশ্যাল ডিসটেন্সিঙেরও দফারফা হয়ে গিয়েছে। সেই তারাই এখন তৃণাকে পাড়াছাড়া করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

কিন্তু, তৃণা কী করে আটকাবে এদের। যদিও ও জানে কেন্দ্র, রাজ্য স্পষ্টভাষায় বলেছে করোনা যোদ্ধাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাও এসব পাড়ার লোকেদের কে বোঝাবে? তারা তো সেই মান্ধাতার খেয়াল আঁকড়ে পড়ে আছে। এখন গোটা পাড়াই খেপে আছে তৃণার ওপর। এত অল্প সময়ের মধ্যে ও যাবেটা কোথায়? বিজয় রক্ষিত তো সাফ ফরমান দিয়েছেন কাল দুপুরের মধ্যে ঘর খালি করতে হবে।

তৃণা ইচ্ছা করলে পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে যেতেই পারে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলতে পারে কী অন্যায় হচ্ছে ওর সঙ্গে। কিন্তু, সে রাস্তায় হাঁটতে মোটেই আগ্রহী নয়। থাকতে হবে তো এই মানুষগুলোর মাঝেই। যেখানে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না, সেখানে থাকার কোনো মানে হয় না।

সেই একটাই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসছে। তৃণা যাবেটা কোথায়? তাও প্রায় রাতারাতি একটা ঠিকানা খুঁজে পাওয়া। সেও আবার এমন একটা অচেনা শহরে। তাছাড়া অন্য পাড়ার লোকেরাও যে এদের সুরে কথা বলবে না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে না কি?

তৃণা তাঁর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘরের দিকে না গিয়ে ততক্ষণে উল্টোপথে হাঁটা লাগিয়েছে। ওকে ঘিরে এতক্ষণের ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করেছে। কিন্তু, মোড়ের মাথায় গিয়ে আরও এক চমক।

মৃণালের টোটায় চেপে এদিকেই আসছে ডাক্তারবাবু। ডাক্তার সৌহার্দ্য সরকার। কিন্তু, ডাক্তারবাবু এদিকে যাচ্ছেটা কোথায়? তাও আবার ওই মৃণালের টোটোয় চেপে! ওর ঝাঁ চকচকে গাড়িটাই-বা কোথায়? ডাক্তারবাবু তো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার মানুষ নন। তাহলে...

ততক্ষণে তৃণা দিদিমণিকে দেখতে পেয়ে গিয়েছে মৃণাল।

‘ও দিদিমণি। ও দিদিমণি!’

‘কী হলো মৃণাল? স্যারকে নিয়ে এদিকে কোথায় যাচ্ছ? স্যার আপনার গাড়ি কোথায়? সৌহার্দ্যের দিকে চোখ স্থির করেছে তৃণা।

‘আরে আমি তো আপনার কাছে এসেছি। মৃণাল বলল, আপনার থাকা নিয়ে সমস্যা করছে এলাকার লোকজন। তাই তো ছুটে এলাম। কিন্তু আপনি এদিকে যাচ্ছেনটা কোথায়?’— জিজ্ঞেস করল সৌহার্দ্য।

এবার তৃণার কাছে বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়েছে। মৃণাল তো এখানকার গণ্ডগোলটা দেখে গিয়েছে। ওই গিয়ে সোজাসুজি হাসপাতালে খবর

দিয়েছে। আর সেকথা শুনে ডাক্তার সৌহার্দ্য সরকার সটান এখানে। কিন্তু, ওর মতো সাধারণ একজন নার্সের জন্য ডাক্তারবাবু এভাবে চলে এসেছে! একাধারে কুণ্ঠা এবং গুরু যুগপৎ অনুভূতি তৃণার মনে।

'আরে এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, না আপনার বাড়িওয়ালার কাছে নিয়ে যাবেন?'— ফের মুখ খুলেছে ডাক্তারবাবু।

'স্যার আমি ওই বাড়িতে আর থাকব না ঠিক করেছি। রাতটা হাসপাতালে থেকে, কাল সকালেই একটা নতুন আস্তানার সন্ধান করব।'— তৃণার গলার স্বরে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট।

'কোচবিহার শহরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা ছাদ পাওয়া কী এতই সহজ? দাঁড়ন, একটু ভাবতে দিন। তার আগে চলুন আপনার যা মালপত্র আছে সেটা অন্তত ওই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা যাক।'

'কিন্তু, এত জিনিসপত্র! কীভাবে বের করা যাবে? তারচেয়ে কাল সকালে না হয় কোনো লোক ঠিক করে...'

'ধুস্! আপনি একা থাকেন। কিই-বা লাগেজ হবে। আমি আর মৃণাল হাত লাগালেই হবে। কী মৃণাল, পারবে না?' — সৌহার্দ্য জিজ্ঞাসা করল।

'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না ডাক্তারবাবু। দিদিমণির এমন কিছু জিনিসপত্র নেই। দুটো বড় ব্যাগ আর একটা সুটকেস। ওই তো দিদিমণিকে যেদিন প্রথম এই ডেরায় নিয়ে আসি সেদিন এই টোটাতেই জায়গা হয়ে গিয়েছিল। দিদিমণির যা একটু বসতে কষ্ট হয়েছিল।'

সত্যিই তো। শহরের এই আস্তানার সন্ধান হাসপাতাল থেকে পেয়ে জয়েনিঙের পরের দিনই এখানে চলে এসেছিল তৃণা। এই মৃণালের টোটো চেপেই। ছেলেটা তারপর থেকেই দিদিমণির ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। আজ ওর বিপদ দেখে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছে। ছেলেটার এলেম আছে।

ততক্ষণে ডাক্তার সৌহার্দ্য তৃণার ভাড়াঘরের দিকে এগোতে শুরু করেছে। টোটোতে চেপে পথ দেখাচ্ছে যথারীতি মৃণাল। অবশ্য শম্বুক গতিতে চলছে ওর রথ। অগত্যা ওদের পিছু নিতে হয়েছে তৃণাকেও। এদিকে ডাক্তার সৌহার্দ্যকে ওভাবে নিজের বাড়ির দিকে আসতে দেখে অবাক হয়েছেন বিজয় রক্ষিত। এই ডাক্তারবাবুরা এখানকার বনেদি মানুষ। সৌহার্দ্যর বাবা ও দাদুও খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। খাতির করে সৌহার্দ্যকে নিজের ঘরে বসাতে চেয়েছেন বিজয়। কিন্তু, সৌহার্দ্য স্পষ্টই উপেক্ষা করেছে ওকে।

তৃণাকে বলেছে, 'যান, যা-যা জিনিসপত্র আছে মৃণালকে দেখিয়ে দিন।'

আর ঘরটা লক করে বেরোনোর সময় তৃণাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ডাক্তারবাবু বলেছে, 'একজন নার্সকে এভাবে হ্যাকল করার জন্য এবং চুক্তিভঙ্গ করার অপরাধে আমি পুলিশেই যেতাম। নেহাত আপনার মধ্যে গান্ধিবাদী ভাবমূর্তি জেগে উঠল। তাই ছেড়ে দিলাম।'— এইভাবেই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নতুন গন্তব্যের দিকে এগিয়েছে তৃণা। তবে সেক্ষেত্রেও যে এতবড় চমক অপেক্ষা করছে ভাবতেও পারেনি।

মৃণালের টোটোয় লাগেজ চাপিয়ে তৃণাকে আরেকটা টোটোয় তুলে নিয়েছে ডাক্তার সরকার। কিন্তু, যে হাসপাতালের দূরত্ব এখান থেকে মাত্র মিনিট দশেকের সে জায়গায় পনেরো মিনিট হলো ওরা চলেছে। মৃণালের টোটো ওদের পিছনেই আসছে।

এখানকার বাসিন্দা না হলেও মোটের ওপর ভাড়া বাড়িটা থেকে হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তাটা এই কদিনে বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন রাজার নামের রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয়। ওরা তো মনে হয় সেদিকে যাচ্ছে না, এদিকে গাছগাছালিও অনেক বেশি।

'স্যার, আমরা যাচ্ছি কোথায়? এটা তো হাসপাতালের পথ নয়।'— উদ্বিগ্ন সুরে বলল তৃণা।

'ভয় নেই। আপনাকে অপহরণ করা হচ্ছে না।'— স্মিত হেসে জবাব দিয়েছে সৌহার্দ্য।

'না, না। তা বলছি না। তবে আমাদের হাসপাতালের পথে তো এতো গাছপালা চোখে পড়ে না।'— লাজুক জবাব তৃণার।

তার মধ্যেই অবশ্য ওরা পৌঁছে গিয়েছে ওদের গন্তব্যে। বনানীপথ পেরিয়ে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। বাড়িটা তিনতলা। কিন্তু, সামনে পিছনে অনেকটা জায়গা। তার মধ্যে সামনের বাগানটা খুবই নয়নাভিরাম। কী সুন্দর সব বাহারি ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে। ব্যস্ত কোচবিহার শহরের মধ্যে এ যেন অন্য এক শহর। এ শহর যেন বহন করছে কোচ নগরীর পুরনো স্থাপত্য। বাড়িটার আদলও অনেকটা রাজবাড়ির মতো। সামনে সিংহদরজাও বিরাজমান। কোচবিহারের বর্তমান রাজার যেন বাস এখানে। ডাক্তারবাবু তৃণাকে এখানে নিয়ে এলোই বা কেন?

'আরে দিদিমণি, এখনও দাঁড়িয়ে কেন? চলুন, চলুন। বুঝতে পারছেন না এটা কার বাড়ি? তাই তো?'— আবারও তৃণার ঘোর কাটিয়েছে মৃণাল।

'হ্যাঁ, মানে...'— ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় তৃণা।

'আরে এটা তো ডাক্তারবাবুর বাড়ি।'— সৌহার্দ্য বাড়ির ভিতরের দিকে এগিয়েছিল। মৃণাল লাগেজ রেখে আসার পর এবার মূর্তিমান হয়েছে।

'স্যার, এটা কেন করতে গেলেন?

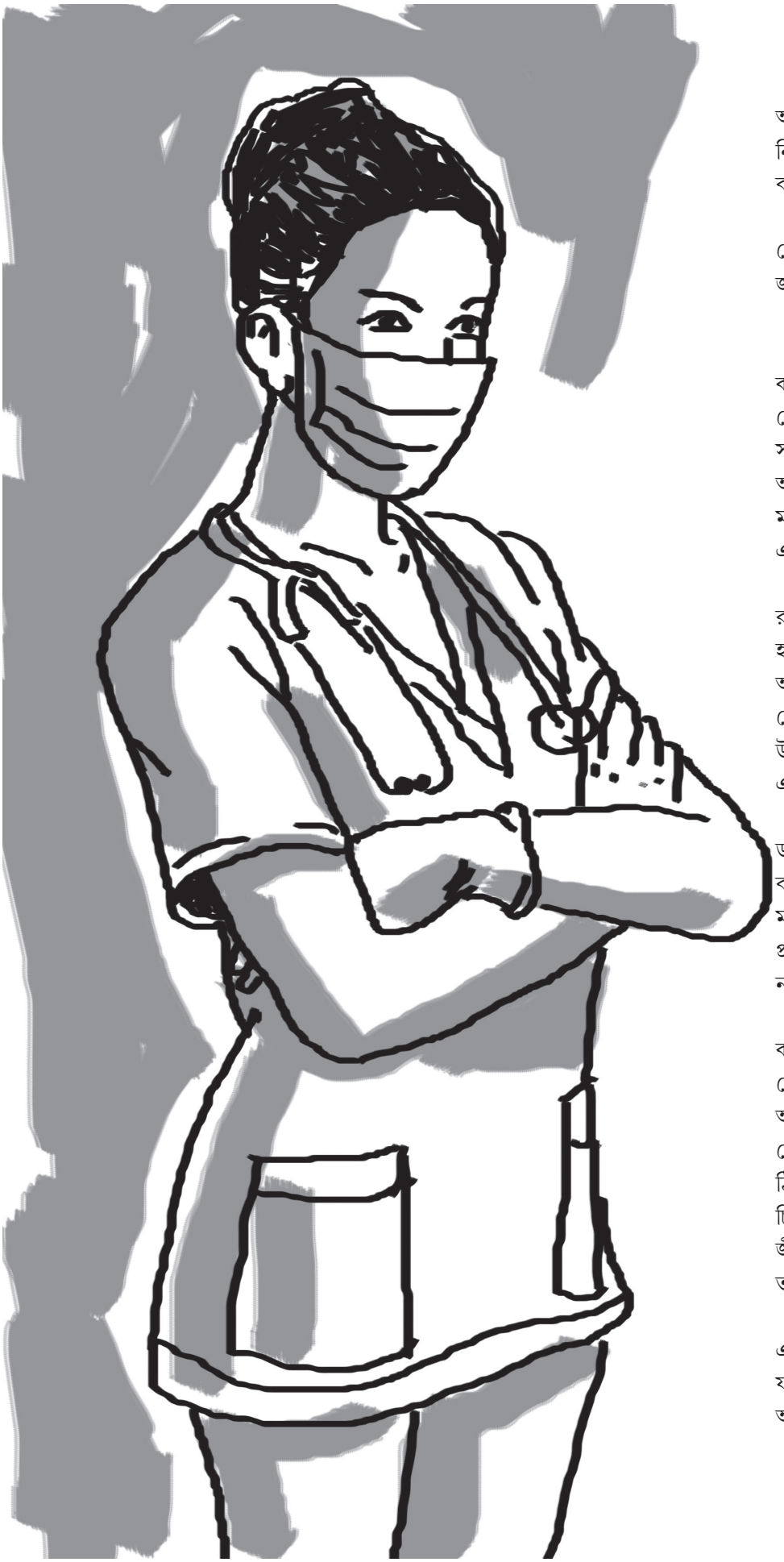

আমি ঠিক কিছু একটা জোগাড় করে নিতাম।' — প্রবল সঙ্কোচের সঙ্গে কথাটা বলল তৃণা।

'আরে থাকুন না দুদিন এই গরিবের গেস্টরুমে। তারপর একটা উপযুক্ত জায়গা পেলে না হয় চলে যাবেন।'

'কিন্তু...'

'আর কোনো কিন্তু নয়। এবার পরন্তু করে চলুন তো নিজের রুমটা দেখে নেবেন।'— এবার কড়া নির্দেশ ডাক্তার সরকারের। যে নির্দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত আপনার ভাব রয়েছে। তৃণার মতো প্রায় অনাথ একটা মেয়ের কপালে এতটা সুখ ছিল।

সৌহার্দ্যর বাড়িতে ঠাঁই পাওয়ার রাতেই ওদের দুজনকে ছুটে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। করোনা আক্রান্ত অসীম মুখার্জির অবস্থা খুব খারাপ। ভেন্টিলেশনে নেওয়ার পরেও কোনো উন্নতি তো হয়ইনি, উপরন্তু তাঁর নাকি এখন তখন অবস্থা।

সেদিন রাতে চোখের পাতা পড়েনি ডাক্তার সৌহার্দ্য ও তৃণার। অসীমবাবুকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা চালিয়েছে ওরা। মাঝরাতের একটা সময়ে মানুষটা তো প্রায় চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু, ওই যে বলে না, রাখে হরি, মারে কে?

ডাক্তারবাবু, নার্স আর হাসপাতাল কর্মীদের প্রবল লড়াইয়ের কাছে হার মেনেছে স্বয়ং যমরাজও। ভোরের দিকে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়। ভেন্টিলেশনের মাত্রা কমিয়ে দিয়েও সব ঠিকঠাক। বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রলোক চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। আর এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে সৌহার্দ্য আর তৃণা তাঁদের সেরাটা দিয়েছে।

সকাল পাঁচটা নাগাদ ওদের মেট্রনদিদি এসে বলেছেন, 'তৃণা তুই এবার বাড়ি যা। বিপদ কেটে গিয়েছে। তাছাড়া আমরা তো আছিই।'

With Best Compliments from -

JATINDRA UDYOG

Specialist in :

HARDENING, TEMPERING, STRESS RELEIVING &

CARBURISING OF ALLOY & MILD STEELS

E-6, FOCAL POINT,

LUDHIANA - 141 010 (PB.) INDIA

OFF : 2670368 2674283

RESI. 0161-2673213

MOBILE : 98140-37868

E-mail : mittaljatinder@yahoo.com

তৃণাও ভেবেছে বাড়ি যাবে। বাড়ি মানে তো স্যারের বাড়ির গেস্টহাউস। গতকালের ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত মনে পড়ে গিয়েছে। পুরোটাই যেন একটা স্বপ্নের মতো। আরও মনে পড়ছে স্যার গতকাল গেস্ট হাউসে তৃণাকে পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। একটু পরেই স্যারের মাতৃদেবী মানে উপাসনা দেবী এসেছিলেন তৃণার সঙ্গে পরিচিত হতে। বোঝাই গিয়েছে ছেলে অন্তপ্রাণ মা ইতিমধ্যেই তৃণার বায়োডাটা জেনে গিয়েছেন। সত্যি, স্যার যেন একটা ছেলেমানুষ। অতবড় ডাক্তার কে বলবে!

যদিও উপাসনাদেবীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলা হয়নি। তার আগেই তো হাসপাতাল থেকে জরুরি তলব এল। কলটা ছিল স্যারেরই। আর যথারীতি সৌহার্দ্যর ল্যাংবোট হলো ও। অল্প আলাপেই উপাসনাকে ভারী ভালো লেগেছে তৃণার। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন ম্যাম ট্যাম বলা যাবে না, আন্টি বলে ডেকেছে তৃণা। মাতৃসমা এই আন্টি এও বুঝিয়ে দিয়েছেন গেস্ট হাউসে থাকলেও প্রয়োজনে যেন তাঁকে ফোন করতে দ্বিধা না করে তৃণা।

তৃণা সবে হাসপাতালের কম্পাউন্ডের বাইরে গিয়েছে, কী যায়নি, ইতিমধ্যে চেনা গাড়িটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আরে, ডাক্তার সৌহার্দ্য কখন যে পিছু পিছু চলে এসেছে বুঝতেই পারেনি।

'এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? আসুন, গাড়িতে উঠুন শিগগির। কাল রাতটা যা গেল। বাড়ি গিয়ে একটু গড়িয়ে নিতে হবে। আর আপনিও রেস্ট নিয়ে নেবেন। প্রয়োজন হলে ওবেলাটা নাই-বা এলেন।'

'কিন্তু স্যার, সিরিয়াস পেশেন্টদের ফেলে এভাবে ডুব দেব? তাছাড়া এরকম একটা সময়ে...'— তৃণার কথায় কুণ্ঠার ছাপ।

'সেরকম সিরিয়াস কিছু হলে আমি ডেকে নেব। এখন গাড়িতে উঠে কৃতার্থ করুন।'— বলেই নজের পাশের গেটটা খুলে দিয়েছে সৌহার্দ্য। গাড়িতে টুকিটাকি দু-একটা কথা।

গেস্টরুমে গিয়ে ফ্রেশ হওয়ামাত্র ব্রেকফাস্ট নিয়ে বাড়ির ঠাকুরের প্রবেশ। ডিম টোস্ট, কলা, আপেল, দুধ। ছোট থেকে এত বড়ো হলেও এমন আদর কোনোদিন পায়নি তৃণা। ওর মা চেষ্টা করেছে মামিদের নজর বাঁচিয়ে ভাল-মন্দ খাওয়াতে। তার জন্য ওদের বিষনজরে পড়ে যারপরনাই অপমানিত হতে হয়েছে মা-মেয়েকে।

জলখাবারটা খাওয়ার পর সত্যি শরীরটা ছেড়ে দিচ্ছিল। আন্টি এলেন ঘরে।

'এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো মা?'

'না, না। এতো আদর আমি জীবনে পাইনি।'— সলজ্জ জবাব তৃণার।

'আরে, সবে তো এলে। এর মধ্যে এতো সার্টিফিকেট দিও না। আর দেখছই তো, এ বাড়িতে বাবু আর আমি ছাড়া জনমনিষ্যি বলতে ওই ঠাকুর, মালি আর গৃহপরিচারক পরিচারিকারা। এই বাড়িতে তোমার মতো একটা মিষ্টি মেয়ে আসায় আমার যে কী ভালো লাগছে তা বলে বোঝাতে পারব না।'

আন্টির কথা মোটেই ফাঁপা ছিল না। নিজের মেয়ের মতো করেই তৃণাকে কাছে টেনে নিয়েছেন তিনি।

আর স্যার? যত দিন গড়িয়েছে দুজনের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছে। সৌহার্দ্য নিজেই বলেছে, 'স্যার ট্যার মার্কা প্রোটোকল হাসপাতালে দেখাও ক্ষতি নেই। বাড়িতে বা অন্যত্র কিন্তু সৌহার্দ্য। এরমধ্যে দুজনেই আপনি থেকে তুমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। হাসপাতালে অবশ্য এখনও সবার সামনে স্যার আর আপনি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণা। সৌহার্দ্যর অবশ্য সেই বালাই নেই।

কোভিড জয় করে অসীম মুখার্জি বাড়ি ফিরেছেন। ওর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ থেকে গিয়েছে দুজনের।

তবে এর মধ্যেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই অসীমবাবুকে কেন্দ্র করে।

হাসপাতাল থেকেই তৃণাকে দেখলেই অসীমবাবু খালি বলতেন, 'তোমার মুখটা বড্ড চেনা গো মা।'

প্রথমদিকে তৃণা ভাবত এটা বুঝি ওনার অসুস্থজনিত বিকার। সেভাবে গ্রাহ্য করেনি ও। কিন্তু, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরেও অসীমবাবু একই কথা বলেছেন। তৃণার মুখের সঙ্গে উনি কারও ভারী মিল খুঁজে পান।

সৌহার্দ্যও অবাক হয়েছে। তৃণাকে বলেছে, 'কী ব্যাপার বলো তো, উনি তোমার সঙ্গে কার এত মিল পান?'

এর উত্তরে কিই-বা বলার আছে। তৃণা ঘাড় নাড়িয়ে বলেছে, 'আমারও মাথায় ঢুকছে না কিছু।'

এই রহস্যের সমাধানটা নিজেই করে দিয়েছেন অসীম। একদিন হঠাৎ করেই তৃণাকে ফোনে জলদি তলব করেছেন। বলেছেন, 'হাসপাতালে যাওয়ার পথে যদি একটু বুড়োর কাছে ঘুরে যাও।'

সৌহার্দ্যও যেত। কিন্তু তৃণাই বলেছে, 'তুমি হাসপাতালে যাও, আমি আসছি।'

'বলুন',— জরুরি তলব যে হঠাৎ, অসীমবাবুর ওপর কপট রাগ দেখিয়েছে তৃণা।

'প্রথম দিন তোমায় দেখার পর থেকেই আমি একটা কথা বলে বলে তোমার মাথা খেয়ে নিয়েছি।'

'আমাকে আপনার খুব চেনা লাগে। তাই না?'— ছেলেমানুষি জেগেছে তৃণার উত্তরে।

‘এতদিন তো চেনা চেনা লাগছিল। আজ হঠাৎ দীপশিখার একটা পুরনো ছবি দেখে পুরো ক্যানভাসটা পরিষ্কার হয়ে উঠল।’— অসীমের কথায় যুদ্ধ জয়ের আভাস ফুটে উঠেছে।

‘দীপশিখা মুখার্জি? মায়ের কথা আপনি জানলেন কী করে?’— ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাচ্ছে তৃণা।

হ্যাঁ, অসীমবাবুর সারনেমও তো মুখার্জি তাহলে কী দীর্ঘদিনের খোঁজে দাঁড়ি পড়তে চলেছে আজ! তাহলে কী উনিই?’

‘না, না। আমি কিন্তু তোমার বাবা নই।’— মুহূর্তের মধ্যে তৃণাকে নিরাশ করেছে অসীম।

‘তাহলে আপনি কে? আমার মায়ের কথা জানলেন কী করে?’— তৃণার উদ্বেগের পারদ উর্ধ্বমুখী।

‘আরে, সবুরে মেওয়া ফলে। কোভিডকে যখন আটকাতে পেরেছি, তখন তোমার দীর্ঘদিনের জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে আজই।’

‘প্লিজ, বলুন আপনি কে? আমার মায়ের কথা জানলেনই-বা কী করে? আমার বাবাই-বা কোথায়?’— তৃণার কণ্ঠে উত্তেজনাকে ছাপিয়ে কান্নার সুর।

‘তোমার বাবা ওই ওপরে।’ বলে আকাশের দিকে আঙুল তুলেছেন অসীম।

‘বাবা নেই!’— তৃণার দুচোখে জলের ধারা নেমেছে।

‘না, নেই। তোমার বাবা আর আমি হলাম ন্যাংটো বয়সের বন্ধু। চেহারাপত্তরেও বেজায় মিল। তাছাড়া আমরা হলাম পাণ্ডুয়ার আদি বাসিন্দা। পাশাপাশি বাড়ি।’

চকিতে অসীম মুখার্জির দিকে তাকিয়েছে তৃণা। ও, বাবাকে তাহলে এরকম দেখতে ছিল! যথেষ্ট হ্যান্ডসাম ছিলেন তো!

ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করেই অসীম ফের শুরু করলেন—

‘তোমার বাবা ছিল আমার চেয়েও সুন্দর। সেকালে অবশ্য আমাকেও সবাই হ্যান্ডসাম বলত। যাক সে অন্য কথা। ওই যে তোমার মায়ের সঙ্গে মন কষাকষি হলো তোমার বাবার, তার মূলে ছিল বড়লোকের বিগড়ে যাওয়া একটি মেয়ে। তোমার মা ঠিকই করেছিল ওইসময় বাপ্পাদিত্যকে ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু, বাপ্পাদিত্যর যে কী মনের অবস্থা হয়েছিল তা যদি জানতে?’

‘কী হয়েছিল বাবার?’— কৌতূহলী তৃণা।

‘বাপ্পাদিত্যর আসলে কোনো দোষ ছিল না। ওই গায়েপড়া মেয়েটা ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তোমার মা চন্দননগরের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর তাকে ফিরিয়ে আনতেও ছুটে গিয়েছিল আমার বন্ধু। দীপশিখা নিজে তো দেখা করেইনি, বড়দার মুখ দিয়ে জানিয়েছিল সে জীবিতকালে বাপ্পার মুখ দেখবে না। এমনকী ও চায় না মেয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আসুক তার বাবা। একদিকে দীপশিখার প্রত্যাখান, অন্যদিকে ওই যুথিকা বলে মেয়েটার উপদ্রবের জ্বালায় শেষমেশ....’

‘শেষমেশ কী হয়েছিল আঙ্কেল?’— এতদিনের অসীমবাবুকে নিমেষে কাছের মানুষ আঙ্কল বানিয়ে ফেলেছে তৃণা।

‘বাপ্পাদিত্য ওই চন্দননগরেই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়েছিল।’

‘না। এটা হতে পারে না। বাবা এভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল!’— সমানে ফোঁপাচ্ছে তৃণা।

‘আর কিই-বা করতে বলো! একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওর প্রিয় দীপশিখার চলে যাওয়া আর ওই শয়তান মেয়েটার অত্যাচার। কাঁহাতক সহ্য করা যায়?’

‘কিন্তু আপনি এত কী করে জানলেন? তাছাড়া বাবার মারা যাওয়ার কোনো খবর তো মা পায়নি। সেটাও কী করে সম্ভব?’

‘দেখো মা, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি। সেটা এমন একটা যুগ যখন ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার কথা মানুষ শোনেইনি। সবেধন নীলমণি ওই খবরের কাগজ। সেই কাগজের ভিতরের পৃষ্ঠায় হয়তো ওই আত্মহত্যার খবরটা বেরিয়েছিল। কারও চোখে পড়া সম্ভব নয়। আর আমি না জানলে তোমার বাবাকে জানবেটা কে? আমি তো বলতে গেলে ওর পরিপূরক।’ আবেগবিহ্বল অসীমের দুচোখেও কান্নার স্রোত নেমেছে।

‘পরিপূরক মানে?’ — তৃণার কৌতূহল বেড়েই চলেছে।

‘আরে বলেছি না, আমরা ছিলাম ন্যাংটা বয়সের জুড়ি। সেই অর্থে পরস্পরের পরিপূরকও বটে।’— সাফাই দিয়েছে অসীম। অবশ্য গলা থেকে স্বর বেরোতেই চাইছে না যেন। থমকে থাকা কান্না আটকে দিচ্ছে সব কথা।

তৃণাও অবাক হয়েছে খানিকটা। বাবার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল? কই, মা তো কোনোদিন কিছু বলেনি। সেদিন নীরবেই বেরিয়ে এসেছে অসীমবাবুর বাড়ি থেকে।

বেরিয়ে দেখেছে সৌহার্দ্যর অজস্র মিসড্ কল। আসলে ওর দেরি দেখে স্বাভাবিক কারণে টেনশন করেছে বোচারা। রিংব্যাক করে সংক্ষেপে এখানকার ইতিবৃত্ত জানিয়েছে। বলতে গিয়ে প্রায়ই কান্নায় বুজে এসেছে কথা। তাও প্রিয় মানুষটাকে যতটা সম্ভব জানিয়েছে।

এরপরের ঘটনা অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে। সেদিন রাতেই সৌহার্দ্যর কাছে এসেছে খবরটা। নিজের রিভলবার মাথায় ঠেকিয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন অসীম মুখার্জি। পাশে মিলেছে

একটি সুইসাইড নোট। তাতে লেখা—

'স্বেচ্ছায় চললাম দীপশিখার কাছে। আমার পরিণতির জন্য কেউ দায়ী নয়। এই জগতে না হলেও ওপারের দুনিয়ায় ও নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে। মরার আগে এটাই শান্তি আমাদের মেয়েটা মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। আর পড়েওছে এক দারুণ মানুষের হাতে। ওদের জীবন আনন্দে ভরপুর হোক। বিদায়!'

পোস্ট মর্টেমের পর অসীমের মুখাগ্নি করেছে তৃণা। সুইসাইড নোট থাকায় কোনো জলঘোলা হয়নি। আর অসীমের বাড়ি থেকে মিলেছে একটি ডায়েরি। যাতে অসীমের বকলমে বাপ্পাদিত্য সাফ বলে গিয়েছেন, 'সেদিনই আমি মরে গিয়েছিলাম, সেদিন দীপশিখা আমাকে প্রত্যাখান করেছিল। ওইদিনই আমার ডাকনাম অর্থাৎ অসীমের জন্ম।'

আরেক পাতায় আন্ডারলাইন করা হয়েছে একটি কথা। 'দীপশিখার স্মৃতিতে ভরা চন্দননগর থেকে চাকরি নিয়ে চলে গেলাম এই কোচবিহারে। বাঁচলাম যুথিকা নামক এক রাক্ষসীর হাত থেকেও।'

আরেকটা লেখাও ডবল আন্ডারলাইন— 'মেয়ের জীবনে আমার পাপী ছায়া পড়তে দেব না কোনোদিনও। কথা দিয়েছি দীপশিখাকে। এর অন্যথা হবে না।'

শেষেরটা লাল কালি দিয়ে লেখা— 'দীপশিখা আমাদের মেয়ে তো তোমার কার্বন কপি হয়েছে গো! চিন্তা করো না, কিছুতেই আমার পরিচয় দেব না। আর আসছি খুব তাড়াতাড়ি।'

এখানেই ইতি টানা হয়েছে ডায়েরিটায়।

গল্পটা দাঁড়ি টানতেই পারত ওই জায়গায়। তবে তার আগে জানাতেই হচ্ছে একটা ভালো খবরের কথাও। কোভিড আবহতেই একটা শুভদিন দেখে সৌহার্দ্য আর তৃণার চারহাত এক করে দিয়েছেন উপাসনা দেবী। অনাড়ম্বরভাবে রেজিস্ট্রি হয়েছে ওদের। গেস্টরুম ছেড়ে সৌহার্দ্যর বেডরুমে পাকাপাকিভাবে ডুকে পড়েছে তৃণা। □

With Best Compliments from -

S. S. FORGINGS

Manufacturer & Exporters of

'SANT' Brand Froged Steel Pipe Fitting & Hand Tools

G.T. Road, By-Pass,
Jalandhar- 144012 (PB.) India
Phone : 0181-2601976, 2601719
E-mail : ssforgings.jal@gmail.com

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

4-A, Kartar Farm,
Behind C-63, Focal Pint Extention
(Gadaipur) Jalandhar- 144 004
(PB.) India
Ph : 0181-2602410
Tele Fax : 2602510,
Mob. : 98154-79543
E-mail : ariesvices@gmail.com

With Best Compliments from -

Kaka Ram Babu Ram Aggarwal

Office : B-XXIII / 2891, Link Road, Near Samrala Chowk, Ludhiana

Ph. : 2604287, 5031390

Fax : 0161-5021390, Mob. : 98158-44800

E-mail : dhruv@krbr.in

With Best Compliments from -

NITIN ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985